যুবপ্রত্যাশা

ঈদসংখ্যা ২০২৬

সন্তান আপনার শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ দেশের

শিশু বিকাশ অ্যাকাডেমী

স্থাপিত - ২০২৩

মোংলাপোতা, খড়কুশমা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১১২৭

রেজিঃ - IV 190202315 - 2023

মনোরম পরিবেশে দুর্দান্ত পরিকাঠামোয়
বালক - বালিকাদের জন্য আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নার্সারী থেকে চতুর্থ শ্রেনি পর্যন্ত
বালক-বালিকা বিভাগে

সকলকে পবিত্র
ঈদ-উল-ফিতরের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সভাপতি - 8967180843, সম্পাদক - 9732999046
কোষাধ্যক্ষ - 9609455926

আপনার সন্তানের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

PEACE ACADEMY (H.S.)

...Spirit of Win

❖ নার্সারী থেকে দ্বাদশ শ্রেণি ❖ বাংলা মাধ্যম ❖ বালক বিভাগ ❖ বালিকা বিভাগ ❖ হিফজুল কুরআন বিভাগ

Peace Village (Dhaknapara), P. O. : Salaidanga, P. S. : Gazole, Dist. : Malda, Pin.No. : 732124

✦ Run by : Rahman Foundation Trust ✦ Regd. Office : Pirojpur (N), English Bazar, Malda

যোগাযোগঃ- ৮৯৬৭১ ২৯৭৭৫ / ৮৩৭২৯ ৫৪০৩৮ Boys & Girls Separate Campus

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে (বিজ্ঞান বিভাগ)

ভর্তি চলিতেছে

উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৪ ফলাফল

প্রথম
আরিফ শেখ
প্রাপ্ত নম্বর-৪৬১
৯২.২০%

দ্বিতীয়
জাহিদ হাসান
প্রাপ্ত নম্বর-৪৫৫
৯১%

তৃতীয়
রামিজ রাজা
প্রাপ্ত নম্বর-৪৫০
৯০%

তৃতীয়
ফিরদাউস পারভেজ
প্রাপ্ত নম্বর-৪৫০
৯০%

পরীক্ষা	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	৭২%-এর উপরে	৭৫%-এর উপরে	৮০%-এর উপরে	৮৫%-এর উপরে	৯০%-এর উপরে
উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৪	৪৬ জন	৪৬ জন	৪৬ জন	৪৪ জন	৩৬ জন	২৩ জন	৪ জন

ডা. এম রহমান
সম্পাদক
পীস অ্যাকাডেমি

ডা. নুরুল মাজিদি
সভাপতি
পীস অ্যাকাডেমি

উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৫ ফলাফল

প্রথম
জারসিস আলি
প্রাপ্ত নম্বর-৪৬৯
৮৭.৮%

দ্বিতীয়
মোস্তফিজুর রহমান
প্রাপ্ত নম্বর-৪৩৮
৮৭.৬%

দ্বিতীয়
নাসিম আক্তার
প্রাপ্ত নম্বর-৪৩৮
৮৭.৬%

তৃতীয়
আজিম কাদরী
প্রাপ্ত নম্বর-৪৩৩
৮৬.৬%

পরীক্ষা	মোট পরীক্ষার্থী	উত্তীর্ণ	৬০%-এর উপরে	৭০%-এর উপরে	৭৫%-এর উপরে	৮০%-এর উপরে	৮৫%-এর উপরে
উচ্চ মাধ্যমিক ২০২৫	৪৭ জন	৪৭ জন	৪৭ জন	৩৯ জন	৩২ জন	১৭ জন	৬ জন

প্রবেশিকা পরীক্ষা ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ২০২৬, সময় ঃ দুপুর ১২টা

আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব

হাফেজে কুরআন গড়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

PEACE ACADEMY (H.S)

হিফজুল কুরআন বিভাগে ভর্তি শুরু

- শুদ্ধ হিফজ, সুন্দর চরিত্র—এই আমাদের অঙ্গীকার"
- হিফজের সাথে আখলাক, আদব ও তাকওয়া গঠন
- দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা
- শিক্ষক-অভিভাবক যোগাযোগ ব্যবস্থা
- ছাত্রদের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা

সিট সীমিত দ্রুত ভর্তি করুন

যোগাযোগ করুন
+91 79086 53643
+91 83729 54038

বালিকাদের জন্য নির্ভরযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শাহীন অ্যাকাডেমী (উঃমাঃ)

আবাসিক ও অনাবাসিক **মিশন**

চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এবং হিফযুল কুর'আন

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান করা হয়

SHAHEEN ACADEMY

ESTD-2021

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে

KEY TO SUCCESS

COMMITMENT INNOVATION
LEADERSHIP COLLABORATION

পরিচালনায়ঃ-

"আইডিয়াল ট্রাস্ট"

Govt. Regd. No.: IV-090100199/2021

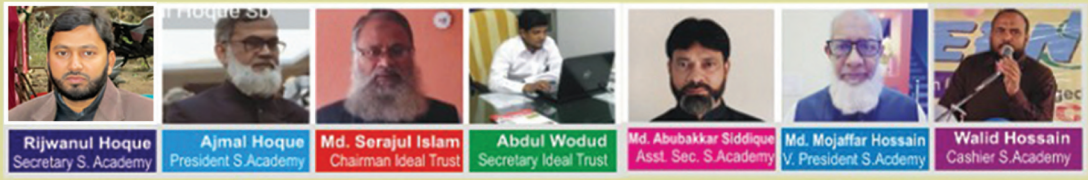

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ-

NEET স্পেশালিস্ট শিক্ষকগণের দ্বারা

কোচিং চলছে

-: স্থান :-

শাহীন নগর, গ্রাম ও পোষ্ট- বুধিয়া,
থানা- ইংলিশ বাজার, জেলা- মালদা (পঃ বঃ), পিন- ৭৩২১২৮

: 9735068610 / 9932491467
: 9734053404 / 9733437031

shaheenmalda.com
principal@shaheenmalda.com

সম্পাদক
সারিফুল আলম

সহ-সম্পাদক
সফিকুল ইসলাম মন্ডল

ম্যানেজার
আব্দুল ফাত্তাহ

সম্পাদনা সহযোগী
মিরাজুল ইসলাম
মীযানুর রহমান
খুররাম আহমাদ
মতিরুল রহমান সেখ
মুস্তাক আহমদ

প্রচ্ছদ
আজম হোসেন খান

যুবপ্রত্যাশা

বর্ষ ২৫, মার্চ ২০২৬ সাল
ফাল্গুন ১৪৩২ সন, রমজান ১৪৪৭ হিজরি
ডি.এল নং- ২২/১৩.৪.২০২৩
RNI No. WBBEN/2023/88137

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২

প্রবন্ধ

এসআইআর: বাংলা ধ্বংসের নীল নকশা - সুমন কল্যাণ মৌলিক ৩

প্রাণ আছে, এখনও আশা আছে - সুমন সেনগুপ্ত ১০

বিখ্যাত কবিদের কাব্য ভাবনায় ঈদ প্রসঙ্গ - তৈমুর খান ১৪

ঈদ: ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পরিবর্তনের গল্প - ওহিদ রেহমান ২৩

যখন গণতান্ত্রিক অধিকার অস্তিত্বের সংকটে - মিরাজুল ইসলাম ২৬

হারানো জাগরণের পুনরীক্ষণ: মুসলিম সভ্যতার বীরত্বগাথা - মহম্মদ কাজাফি ৩৪

কাশ্মীরের সংস্কৃতি: অনিন্দ্য আনন্দের সম্মিলন - সীমান্ত আকরাম ৪৫

আল-খাওয়ারিজমি, অ্যালগরিদম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা - ড. আয়াতুল্লা ফারুক ৫৪

শিয়া-সুন্নি বিভাজন: আকিদার দ্বন্দ্ব নাকি ক্ষমতার রাজনীতি? - মাফিকুল ইসলাম ৫৬

বিশ শতকী সাবেক বাংলার অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক সোহরাওয়ার্দী - জহির-উল-ইসলাম ৬৪

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে প্রয়োজন স্টার্টআপ কালচার - আলি মোস্তাফা ৭৩

এপস্টাইন ফাইলস: নশ্বর দুনিয়ার কুৎসিত রূপ ও আমাদের শিক্ষা - জিমারিনা সারওয়ার ৭৮

বিপ্লবী অধ্যাপক মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর কথা - আমিনুল ইসলাম ৮২

রামপুরের শাহি রান্না ও নবাবি দস্তরখওয়ান - ফারুক আব্দুল্লাহ ৮৬

মিডিয়া ও ইসলামোফোবিয়ার সমাজতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ - এস.আলম ৯৬

উচ্চবিত্তের পৌষমাস, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ এবং 'জলসাঘর'-এর ছবি বিশ্বাস - গোলাম রাশিদ ১০৮

ঈদ স্মৃতিকথা

খুশির দিন স্মৃতিগুলো অমলিন - সানাউল খান ৮৯

স্মৃতির মণিকোঠায় শৈশবের ঈদ - খুররাম মুরাদ ৯১

একজন মহিলার ঈদ-কথন - সামিমা সুলতানা ৯৩

সাক্ষাৎকার:

শিক্ষারত্ন ড. আবুল হোসেন বিশ্বাস ১০৪

ছোটগল্প

দাগ - ইসমাইল দরবেশ ১৯

গোলক ধাঁধা - রক্তিম ইসলাম ৩০

ফেরেশতার ডানা - সেখ আসাদ আলি ৩৯

কোন এক মানুষের তরে - আব্দুল বারী ৫০

পরিনতি - মুসা আলি ৫৯

কবর - শেখ নজরুল ইসলাম ৬৮

স্বীকার - আয়েশা খাতুন ১১১

কবিতা ১১৫-১২০

যুব প্রত্যাশা প্রকাশনের পক্ষে আব্দুল ফাত্তাহ কর্তৃক ১৪, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (দ্বিতল), কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত। ফোন- (০৩৩) ২২৬৪ ৫৯৫২,
ই-মেল: yuba.pratyasha@gmail.com, Website: www.yubapratyasha.in

সম্পাদকীয়

অনিশ্চিত সোপান ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান

সমকাল বড়ই বিচিত্র ও নির্মম। এক মাসব্যাপী আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের সাধনা শেষে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ যখন আকাশে উদিত হয়, তখন তাহা কেবল একটি ধর্মীয় রীতির উদযাপন থাকে না, বরং এক গভীর মানবিক ঐক্যের স্মারক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এবারের ইদ কেবল উৎসবের লৌকিকতায় সীমাবদ্ধ নহে; তাহার ললাটে লেপিয়া রহিয়াছে এক অস্থির সময় ও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। উৎসবের আলোকবৃত্তকে গ্রাস করিতে উদ্যত এক অদ্ভুত প্রশাসনিক ও বৈশ্বিক আবর্ত।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত শক্তি কেবল শৌর্য-বীর্যে ছিল না, ছিল বাগদাদের 'বাইতুল হিকমাহ' হইতে কর্ডোভার গ্রন্থাগারের অতুলনীয় জ্ঞানচর্চায়। যখন পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন এই সভ্যতা বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যায় আলোকবর্তিকা ধরিয়াছিল। কিন্তু সেই মননশীলতার ঐতিহ্যে আজ মরিচা ধরিয়াছে। আজ মুসলিম বিশ্ব কেবল অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর ভাবাবেগের আতিশয্যে বিভ্রান্ত। আধুনিক বিশ্বের জটিল কূটনীতি ও প্রযুক্তির লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকার খেসারত দিতে হইতেছে সর্বত্র। বর্তমানের বিশ্বরাজনীতি যেন এক অন্তহীন কুরুক্ষেত্র। গাজা হইতে তেহরান চতুর্দিকে আজ বারুদের গন্ধ। পশ্চিম এশিয়ার আর্তনাদে যখন আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত, তখন প্রবল রাষ্ট্রশক্তির নীরবতা প্রমাণ করে যে, কৌশলগত ধীশক্তি ও সম্মিলিত প্রজ্ঞা ছাড়া কোনো জাতি টিকিয়া থাকিতে পারে না।

অস্থিরতার আঁচ আজ আমাদের ঘরের আঙিনাতেও দীর্ঘ হইয়াছে। এ রাজ্যে এখন রাজনীতির তপ্ত নিঃশ্বাস। ভোট আসিতেছে, আর তাহার অনুষঙ্গ হিসাবে ফিরিয়া আসিতেছে মেরুকরণের সেই চেনা ছক। নাগরিকত্বের যে আইনি গোলকধাঁধা বা 'এসআইআর'-এর প্রশাসনিক আবর্ত ঘনীভূত হইয়াছে, তাহাতে সবচেয়ে বিপন্ন সাধারণ মানুষের নিশ্চিন্ত যাপন। আজ লক্ষ লক্ষ ভোটারের মাথার ওপর ঝুলিতেছে 'বিবেচনাধীন' তকমা। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে এই মাটির সন্তান, যাঁহাদের শ্রমে ও ঘামে এই বদ্বীপ পুষ্ট, আজ তাঁহাদেরই নথিপত্রের জঠরে প্রমাণ করিতে হইতেছে অস্তিত্বের বৈধতা। উৎসবের মিষ্টতা কি সেই উদ্বেগের তিতকুটে স্বাদকে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে?

রমজান ছিল আত্মবীক্ষণের মাস। কিন্তু কেবল আচারে কি মুক্তি মেলে? হারানো অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে হইলে শিক্ষার আলোকবর্তিকাটিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যখন রাজনীতির কারিগরেরা বিভেদের পাঁচিল তুলিতে ব্যস্ত এবং নাগরিকত্বকে দাবার ঘুঁটি করা হইতেছে, তখন কেবল হাহাকার করিয়া লাভ নাই। আমাদের বর্তমানের ঢাল হউক সচেতন মনুষ্যত্ব ও আধুনিক জ্ঞান। ভোট আসিবে, গদি বদলাইবে - কিন্তু মানুষের পরিচয় যেন কেবল এক একটি শুষ্ক সংখ্যায় পর্যবসিত না হয়। ইদের এই পবিত্র লগ্নে শপথ হউক সংকীর্ণতা নয়, বরং প্রজ্ঞার প্রসারই হউক আমাদের শেষ রক্ষা। নথিপত্রের শুষ্ক প্রমাণের চেয়েও বড় হইয়া উঠুক একে অপরের পাশে দাঁড়াইবার দৃঢ় অঙ্গীকার। চাঁদ উঠুক আকাশে, আর সেই জ্যোৎস্নায় ধুইয়া যাক যাবতীয় ভয় ও অনিশ্চয়তা। উৎসব কেবল লৌকিকতা নহে, এই অস্থির সময়ে উৎসব হউক মানুষের আত্মপরিচয় রক্ষার এক নিভৃত সংকল্প।

এসআইআর: বাংলা ধ্বংসের নীল নকশা

সুমন কল্যাণ মৌলিক

ভোটার তালিকায় সংশোধন যে কোন গণতন্ত্রে একটি স্বাভাবিক বিষয়। ভারতবর্ষ কখনো তার ব্যতিক্রম ছিল না। মৃতদের তালিকা থেকে বিয়োজন, নতুনদের সংযোজন, স্থানান্তরিত মানুষদের এক তালিকা থেকে অন্য তালিকায় নাম ওঠানো এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বুথ লেভেল অফিসাররা বছরের পর বছর ধরে অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করছেন। কিন্তু এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ২৪ জুন (২০২৫) কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বিহারে যে নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন শুরু করেছিল এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে চলমান, তা শুধু বিতর্ক তৈরি করেনি, দেশের একটা বড় অংশের মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করেছে। প্রক্রিয়ার প্রাথমিক অভিঘাত থেকে এটা স্পষ্ট যদি কার্যকর প্রতিরোধ ও আদালতের দায়বদ্ধ হস্তক্ষেপ না হয় তবে এক বিরাট সংখ্যক ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ হয়ে যাবে। আবার সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, এই বাদ হওয়া মানুষদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন গরীব ও প্রান্তিক মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা হল এই বিতর্ক এমন সময়ে হচ্ছে যখন খোদ নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মের নিরপেক্ষতা নিয়ে একাধিক প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেছে এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন, নির্বাচনী কাগজ থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আনুগত্য দেখাচ্ছে। অতি সম্প্রতি রাহুল গান্ধীর বহুল আলোচিত 'Democracy Destroyed' শীর্ষক সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক তথ্য প্রমাণ এসেছে। কিন্তু তথ্যের খাতিরে একথাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে বিগত লোকসভা নির্বাচনের সময় কত ভোট পড়েছে সে সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথিটি (১৭সি) নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে ভোট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ভোটের শতাংশের হার এবং তার দুদিন পরে চূড়ান্ত ভোটের

হারের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে এখনো পর্যন্ত কমিশন যথাযথ জবাব দিতে পারেনি, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে বারানসী কেন্দ্রে যেখানে খোদ নরেন্দ্র মোদি ভোটপ্রার্থী ছিলেন, সেখানে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত একাধিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতে করা একাধিক মামলা তার প্রমাণ।

ভোটার তালিকা সংশোধন বলতে যে কাজগুলো বোঝায় তা হল মৃত ব্যক্তিদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, যে সমস্ত ভোটাররা স্থায়ী ভাবে অন্য জায়গায় চলে গেছেন তাদের নাম বাদ দেওয়া, যাদের আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে তাদের নাম ভোটার তালিকায় সংযোজন করা। কিন্তু এসআইআরের ক্ষেত্রে যাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তাদেরকেও ফর্ম ভর্তি করতে বলা হচ্ছে। এ কথা কারও অজানা নয় যে কোন তালিকায় নাম তুলতে বা রাখতে গেলে অবশ্যই ভোটারদের কিছু নথি জমা দিতে হয়। এই একই কথা ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সব জায়গায় এসআইআরের ক্ষেত্রে মানুষের কাছে যে তিনটি নথি সহজলভ্য অর্থাৎ আধার কার্ড, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র এবং প্যান কার্ডকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের বিরোধিতা ও আদালতের রায় থাকা সত্ত্বেও সমস্ত সরকারি কাজে আধার সংযুক্তি আবশ্যিক করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আজকে সরকারের ক্রমাগত প্রচারের কারণে আধার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসাবে প্রচারিত। সেটিকে বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে খোদ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার আইডেন্টিটি কার্ডেরও কোন মূল্য নেই। গ্রামের দিকে আরো দুটো গুরুত্বপূর্ণ নথি হল রেশন কার্ড এবং মনরেগা কার্ড। এগুলোও বাতিল। পরিবর্তে যে সমস্ত নথি গুলোকে (যে কোন একটা) চাওয়া হয়েছে তা বেশিরভাগ মানুষের কাছে সহজলভ্য নয়। বিহারের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নথিগুলো চাওয়া হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে ১) পেনশন পেমেন্ট অর্ডার, ২) ১৯৮৭ সালের ১ জুলাই এর আগে সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, ব্যাঙ্ক, এলআইসি, পোস্ট অফিস কর্তৃক ইসু করা কোন পরিচয় পত্র ৩) জন্ম সার্টিফিকেট ৪) মাধ্যমিক বা সমতুল কোন সার্টিফিকেট ৫) পাসপোর্ট ৬) স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র ৭) অরণ্য অধিকার সংক্রান্ত শংসাপত্র ৮)তপশিলি জাতি/ উপজাতি/ ওবিসি সার্টিফিকেট ৯) ন্যাশানাল রেজিস্টার অব সিটিজেন্স ১০) ফ্যামিলি রেজিস্টার ১১) জমি বা আবাস যোজনার শংসাপত্র। এই তালিকার নবম ও দশমটা বিহারের জন্য প্রযোজ্য নয়। এগারো নম্বর নথিটা পেতে গেলে আধার কার্ড জমা করতে হয়। ছয় নম্বর নথিটা বেশিরভাগ মানুষের কাছে থাকার কথা নয়। পাসপোর্টতো সারা দেশের এক শতাংশ মানুষের কাছে নেই। আমাদের মত দেশে সবচেয়ে সমস্যা হল অশিক্ষা, দারিদ্র্য। নব্বই এর দশকের আগে সন্তানের জন্ম গ্রামের দিকে মূলত বাড়িতেই হত। কোটি কোটি মানুষের কাছে সেই অর্থে জন্ম ও জন্মস্থানের কোন শংসাপত্র পর্যন্ত নেই। এই অবস্থায় গণতন্ত্রের কাজ হল ভোটার লিস্টে নাম তোলার প্রক্রিয়াটাকে সরল করা। এতদিন তা হয়ে এসেছে কিন্তু বর্তমান নির্বাচন কমিশন পরিকল্পিত ভাবে প্রক্রিয়াটিকে জটিল করে নাগরিকদের আতঙ্কিত করতে চাইছে। এখানে কেন নির্দিষ্ট ভাবে বিহারে ২০০৩ বা পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে মাপকাঠি মানা হচ্ছে তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর নেই। বলা হচ্ছে পূর্ববর্তী এসআইআর ঐসময় হয়েছিল। কিন্তু সেবার এইভাবে কোন প্রক্রিয়া চালানো হয় নি যাতে ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে তাদেরও ফর্ম জমা করতে হয়। এমনকি নির্বাচন কমিশন এমন কোন সার্কুলার দেখাতে পারে নি যাতে এবারে যে নথিগুলো চাওয়া হয়েছে, সেবারও সেগুলোর উল্লেখ ছিল। সর্বোপরি সেবার নির্বাচন কমিশন তার নিজের দেওয়া ভোটার আইডেনটিটি কার্ডকে অস্বীকার করেনি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি ও প্রাবন্ধিক সঞ্জয় হেগড়ে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে আমাদের সঠিকভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে যখন ভারত একটা প্রজাতন্ত্র হয়েছিল: সাক্ষরতা, আর্থিক রোজগার এবং জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দিয়েছিল। সংবিধান সভায় এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল। অনেক সদস্য সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে দেশ এর জন্য প্রস্তুত কি না। কিন্তু ড: বি আর আম্বেদকর সহ অন্যান্যরা জোর দিয়েছিলেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা অর্জনের পূর্ব শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক সমতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই নীতি বাস্তবে রূপান্তরিত করেছিলেন দেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন। ১৭৩ মিলিয়ন সম্ভাব্য ভোটারের মুখোমুখি হন তিনি, যাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন

নিরক্ষর। কিন্তু তিনি উদ্ভাবনের রাস্তায় হেঁটেছিলেন। তিনি প্রতীক চালু করেছিলেন এবং প্রক্রিয়াগুলো এমনভাবে নকশা করেছিলেন যাতে অংশগ্রহণ সহজ হয়, দুরূহ নয়। ভারতের প্রথম নির্বাচন নিখুঁত ছিল না ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক। বিপরীতে ভারতের ২৬ তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে যে সংশোধন ঠিক তার বিপরীত। জন্ম সনদ এবং পাসপোর্টের মত বিরল নথির দাবি করে- যা জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশের কাছে রয়েছে। নির্বাচন কমিশন এমন একটি মানদণ্ড খাড়া করেছে যা লক্ষ লক্ষ মানুষ পার হতে পারবে না। আধার কার্ড ও রেশন কার্ড, যা দরিদ্রদের কাছে ব্যাপকভাবে রয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। দেশে আজ যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোটাধিকার হারানোর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন তার সম্পূর্ণ দায় নির্বাচন কমিশনের।

এই এসআইআর প্রকল্পের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পারাকলা প্রভাকর সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন: "SIR of electoral roll means that it is the government choosing the voters instead of the other way round"। এই ভাবনাটা ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভাবনার বিরোধী। সরকার যাদের ভোটার তালিকা দেখতে চায় না, তাদের ভোটার তালিকা থেকে এই প্রক্রিয়া বাদ দিতে চায়। ইতিমধ্যে ভাইরাল হওয়া নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের বক্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন এসআইআর করার সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের নয়। তাহলে প্রশ্ন হল এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞের সিদ্ধান্ত আসলে কার! এই এসআইআরের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে কারণ কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের এনআরসি করার পরিকল্পনা বিগত সময়ে গণ আন্দোলনের চাপে সফল হয়নি। এক বিশাল সংখ্যক মানুষকে (যাদের মধ্যে বেশিটাই সংখ্যালঘু, প্রান্তিক ও মহিলা) যদি রাজনৈতিক সমাজ থেকে বহিষ্কার করা যায় তাহলে এদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে রূপান্তরিত করা যাবে। তাই সহজ কথাটা হল এসআইআর ভোটার লিস্টের প্রয়োজনীয় সংশোধনী নয়, আদতে ভোটার লিস্টের পুনর্লিখন।

চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া এখনো পর্যন্ত সাংবিধানিক বা আইনি বৈধতার কোন নথি দেখাতে পারেনি। এক্ষেত্রে মূলগত বিষয়টা হল যে এই প্রক্রিয়া সরাসরি ন্যায় বিচারের ধারণাকে অস্বীকার করছে। আমরা জানি একটা মানুষ ততক্ষণ নির্দোষ যতক্ষণ না তিনি আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন এবং সেই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত (এক্ষেত্রে অনাগরিক) করার দায় হল রাষ্ট্রের বা সেই ব্যক্তির যিনি কারো নাগরিকত্ব নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখানে ঠিক তার উল্টো হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া সমস্ত জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্বের বিষয়ে সন্দেহের চোখে দেখছে এবং নাগরিককে বাধ্য করছে এক কঠিন ও অবাস্তব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাগরিক প্রমাণ করার। এইজন্য এসআইআর হয়ে উঠেছে গণ হারে ভোটাধিকার বঞ্চিতকরণের এক মহাপ্রকল্প। একই সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে মনে রাখা দরকার ভারতীয় সংবিধানের কোথাও নির্বাচন কমিশনকে নাগরিকত্ব যাচাই করার অধিকার দেওয়া হয়নি, সেই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। অথচ এবার ভোটাধিকার ও নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বিষয় দুটোকে একসাথে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমরা যদি পর্যায়ক্রমিক ভাবে বাংলার চলমান এসআইআর প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কিভাবে এই প্রকল্প এই রাজ্যে একটি ফ্যাসিবাদী প্রকল্পের চরিত্র নিচ্ছে তা সহজে বুঝতে পারব।

পশ্চিমবঙ্গে গত পাঁচ মাস ধরে চলা এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ ছিল খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ। মানুষ সব কাজ ফেলে তালিকায় নিজের নাম খুঁজছেন। এই তালিকা প্রকাশের আগেই কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির পক্ষ থেকে এসআইআরের সম্ভাব্য পরিণাম সংক্রান্ত ফলাফল নিয়ে এক আগ্রাসী ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছিল, যা মেইনস্ট্রিম মিডিয়ার সৌজন্যে সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই ন্যারেটিভের প্রচারক ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং এ রাজ্যে বিজেপির সভাপতি, বিরোধী দলনেতা থেকে শুরু করে চার আনা-আট আনার নেতারা। সেই ন্যারেটিভের মূল কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে বাংলাদেশ সংলগ্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাগুলো অবৈধ অনুপ্রবেশকারী / রোহিঙ্গা/ ঘুসপেটিয়াতে ভরে গেছে। এরা সবাই রাজ্যের সম্পদে ভাগ বসাচ্ছে, এখানে নানান ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম করছে সর্বোপরি রাজ্যের শাসকদলের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করছে। এসআইআরের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রমাণ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী শেষে নিদেনপক্ষে এক কোটি রোহিঙ্গা/

ঘুষপেটিয়া বাদ পড়বে, রাজ্য জঙ্গলমুক্ত হবে এবং বিজেপি নিশ্চিতভাবে ক্ষমতায় আসবে। এই ন্যারেটিভে একটা দুর্বল অংশও ছিল। সেটা ছিল দলিত শরণার্থী হিন্দু যারা মতুয়া সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এদের অনেকেই ১৯৭০ পরবর্তী সময়ে এদেশে আসেন এবং তাদের নাগরিকত্বের দাবি ছিল একশ শতাংশ ন্যায্য। বিজেপির এই ঘৃণ্য অনুপ্রবেশ তত্ত্বে এই মতুয়াদের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন প্রথম থেকেই ছিল এবং বিজেপির কাছে তা ছিল অস্বস্তিকর। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এসআইআরের অসাংবিধানিক গঠন, পরোক্ষে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নীল নকশার বিরুদ্ধে এ রাজ্যে প্রায় কোন সংসদীয় দল বিরোধিতা করেনি। তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির এসআইআর বিরোধিতা ছিল আংশিক ও মূলত প্রয়োগবিধির জটিলতা সম্পর্কিত। তাই বলা যায় কোন কার্যকরী বিরোধিতা ছাড়াই এই রাজ্যে সমীক্ষা শেষ হয়েছে।

খসড়া তালিকা নিয়ে আলোচনায় প্রবেশের আগে 'নো ম্যাপিং' ক্যাটাগরির অর্থটা বুঝে নেওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশনের ভাষায় তাদের ঐতিহাসিক ডাটাবেস হল ২০০২ সালের ভোটার তালিকা। এই তালিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) মানুষদের নাম এই তালিকায় নেই। আর ভোটের নিয়ম সম্পর্কে সামান্য ধারণা আছে এমন মানুষরা জানেন যে ভোটার তালিকায় এএসডি ক্যাটাগরি থাকে যাদের মধ্যে আছে অনুপস্থিত/ মৃত/ ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম। পশ্চিমবঙ্গে খসড়া তালিকা অনুযায়ী ৫৮,২০,৮৯৮ জনের নাম বাদ গেছে। এর মধ্যে মৃত ভোটার ২৪,১৫,৮৫২ জন। স্থানান্তরিত ভোটার ১৯,১৫,৮৫২ জন। নিখোঁজ ভোটার ১২,২০,২৩৮ জন। ডুপ্লিকেট এবং অন্যান্য ভোটার ১,৯৫,৯৩৪ জন।

এই খসড়া তালিকায় প্রথমে আমাদের খোঁজা দরকার ঘৃণার কারবারীদের মুখে বারংবার উচ্চারিত এক কোটি রোহিঙ্গাদের। এই তালিকায় উদাহরণ হিসাবে এমন সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র বেছে নেওয়া হচ্ছে যেখানে ভোটারদের ৭৫% মুসলমান। আমরা এই কেন্দ্রগুলোতে নো ম্যাপিং বা আনম্যাপড ভোটারদের শতাংশগুলো দেখব - ডোমকল(০.৪২%), রানীনগর(০.৯১%), হরিহরপাড়া (০.৬%), সুজাপুর(০.৫%), রঘুনাথগঞ্জ(০.৭%), সামসেরগঞ্জ(১%) এবং লালগোলা (১.১%)। এই পরিসংখ্যান শুধু এক কোটি রোহিঙ্গার গাঁজাখুরি তত্ত্বের মুখোশ খুলছে না, একই সঙ্গে বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যকেও উন্মোচিত করছে। কোনরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলিতে জনবিন্যাস পাল্টে যাওয়ার যে অভিযোগ তুলেছিলেন, তার অসারতা প্রমাণ করছে।

এই ভোটার তালিকায় সবচেয়ে বেশি যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা হলেন হিন্দু দলিত অর্থাৎ মতুয়া সম্প্রদায়। এক কথায় বলতে গেলে মতুয়ারা বিজেপির নাগরিকত্বের ফাঁদে ধরা পড়লেন। আমরা এবার দেখে নেব মতুয়া অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলোর অবস্থা-- গাইঘাটা তপশিলি (১৪.৫১%), বাগদা তপশিলি (১২.৬৯%), কল্যাণী তপশিলি (১১.৯২%), বনগাঁ উত্তর তপশিলি (১১.৩%), রানাঘাট উত্তর পূর্ব তপশিলি (১১.১৯%), বনগাঁ দক্ষিণ তপশিলি (১০.৮৩%), কৃষ্ণনগর তপশিলি (১০.৪৩%), রানাঘাট উত্তর পশ্চিম (১০.৪৮%), রানাঘাট দক্ষিণ তপশিলি (৯.৩২), স্বরূপনগর তপশিলি (৬.৮৭%)। সারা রাজ্যে নো ম্যাপিং এর শতাংশ সেখানে ৩.৯৯% সেখানে মতুয়া প্রভাবিত এলাকায় গড় ৯.৪৩%। এককথায় এই খসড়া তালিকা মতুয়াদের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

খসড়া ভোটার তালিকায় এক কোটি রোহিঙ্গার হদিশ করতে না পেরে জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন উন্মাদের মত আচরণ করছে। এই আচরণের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল শুনানির প্রয়োজনীয় খসড়া হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বাতিল করা (পরে সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণযোগ্য বলে)। অথচ একথা সবার জানা যে একটা সময় যখন ছোটবেলায় জন্ম নথিভুক্ত করার রেওয়াজ ছিল না তখন একটা বড় অংশের মানুষের কাছে জন্মের শংসাপত্র বলতে এই মাধ্যমিক কার্ডকেই বোঝাত।কমিশনের নির্দেশিকার নির্বুদ্ধিতা তখনই স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটের গ্রহণযোগ্যতা আছে অথচ সেই সার্টিফিকেটে দেওয়া জন্মতারিখটি যে অ্যাডমিট কার্ডের অনুসারী, তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। নির্বাচন কমিশন বোধহয় ভুলে গেছে যে ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য মাধ্যমিক পাশ হওয়ার দরকার হয় না, দরকার জন্মতারিখটি যা এই অ্যাডমিট কার্ডে পরিষ্কার ভাবে দর্শানো থাকে। আশঙ্কামত কমিশনের এই তুঘলকি চাল, নিত্য নতুন নিয়ম বদল সাধারণ মানুষের কাছে বলির পাঁঠা করে তুলছে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও)। বিভিন্ন জায়গা

থেকে বিএলওদের ক্ষোভ ও গণপদত্যাগের খবর সামনে এসেছে। এ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হবার পর থেকে বহু মানুষ মারা গেছেন। এই তালিকায় যেমন প্রয়োজনীয় নথি না থাকার ফলে আতঙ্কিত মানুষ আছেন, তেমনি আছেন অসম্ভব মানসিক চাপের শিকার বিএলওরা। ভোটার তালিকা সংশোধনের মত একটি স্বাভাবিক, সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে রক্তাক্ত করে তোলার দায় অবশ্যই নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করার পর এটা পরিষ্কার যে বাংলায় এসআইআরের নামে এক চক্রান্ত জাল বিস্তার করছে। এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য বিজেপির নির্বাচনী সুবিধা সুনিশ্চিত করা। এই বিষয়টি বুঝতে আমাদের প্রথমেই নজর দিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের বিডিও ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও) মৌসম সরকারের পদত্যাগ পত্র। এই পদত্যাগ পত্রে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে যে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির মাধ্যমে এক ত্রুটিপূর্ণ অ্যাপকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার মানুষকে ভোটার তালিকার বাইরে করা হচ্ছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যে সমস্ত নামের বানান, লিঙ্গ পরিচয় ভুল ছিল, তা ভোটাররা পরবর্তী কালে ফর্ম ৮ এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে সংশোধন করে। অথচ ২০০২ ও ২০২৫ এর তালিকার তথ্য মিলছে না এই অজুহাতে সেইসমস্ত ভোটারকে শুনানির নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এই অ্যাপ ভুলে ভরা। মৌসম সরকার তার পদত্যাগের শেষ অনুচ্ছেদে যে কয়টি কথা লিখেছেন তা আরেকবার উল্লেখ করা প্রয়োজন : "Therefore I want to tender my resignation from the post of AERO so that I would have the consolation that I have not betrayed my countrymen and nations consciously"। (চিঠিটির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দি নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস / ১০ জানুয়ারি, ২০২৬ দ্রষ্টব্য)। একই সঙ্গে ভারতের অন্যতম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'দি রিপোর্টার্স কালেকটিভ' (১৪ জানুয়ারি, ২০২৬) এর বিস্তৃত প্রতিবেদনটা উল্লেখ করা দরকার যেখানে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অফিসাররা বাংলার জন্য এমন কিছু নির্দেশিকা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়েছেন যার কমিশনের পক্ষ থেকে কোন লিখিত আদেশ নেই। এমনকি বহু ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সর্বভারতীয় নির্দেশিকার বিরোধী বক্তব্য বাংলায় মৌখিক ভাবে লাগু করার কথা বলা হচ্ছে।

প্রথম খসড়া তালিকায় সুবিধা করতে না পেরে নির্বাচন কমিশন এক নতুন অস্ত্র বের করেছে যার নাম'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' (যৌক্তিক অসঙ্গতি)। এই অস্ত্রকে নতুন বলার কারণ বিহার এসআইআরে এই বিষয়টি ছিল না। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই অসঙ্গতি বলতে কি বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রাথমিক খসড়া তালিকার সময়ে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল। সে সময় যাদের নাম তালিকায় উল্লেখ ছিল, সেই অংশের অনেকেই উল্লাসে মেতেছিল। আমাদের আশঙ্কা ছিল দ্বিতীয় পর্বে অনেকের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এখন নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য মোতাবেক বোঝা যাচ্ছে যে ১.৬৭ কোটি মানুষের কাছে শুনানির নোটিশ যাবে। এদের মধ্যে ১.৩৬ লক্ষ হতে চলেছেন এই যৌক্তিক অসঙ্গতির শিকার। কারা থাকছেন এই তালিকায়! সেই মানুষেরা যারা বাবা- মায়ের পরিবর্তে তাদের ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার নাম দিয়েছেন। সেই সমস্ত ভোটার যাদের সন্তানের সংখ্যা ৬। এছাড়া বাবা ও ছেলের বয়সের অসঙ্গতি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ছিল বাংলাতে। অ্যাপের মাধ্যমে সেগুলো ইংরেজি করতে গিয়ে একাধিক অসঙ্গতি তৈরি হচ্ছে যা মূলত অ্যাপের প্রয়োগগত সমস্যা। দু একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পদবির ক্ষেত্রে এই ভুল সবচেয়ে বেশি। পদবি বণিক (Banik/Vanik), মন্ডল (Mondal/Mandal)। এছাড়া রয়েছে ব্যানার্জী/ বন্দোপাধ্যায়, চ্যাটার্জী/ চট্টোপাধ্যায় যে এক তা বুঝতে না পারার ব্যর্থতা। এই সব অসঙ্গতিকে কেন্দ্র করে পাইকারি হারে অশক্ত, বৃদ্ধ, অসুস্থ, কর্মসূত্রে প্রবাসী মানুষদের নোটিশ ধরানো হচ্ছে। এই ভাবে বাংলায় এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে।

এই লেখার শুরুতে উল্লেখ করেছি যে এক কোটি রোহিঙ্গা খুঁজে না পেয়ে এবং নির্দিষ্ট করে মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হয়ে বিজেপির স্বার্থ পূরণ করতে এই যৌক্তিক অসঙ্গতির মুখোশে নিশানা করা হচ্ছে মুসলিমদের। দ্য ওয়্যার ওয়েব ম্যাগাজিনে অপর্ণা ভট্টাচার্যের অনবদ্য সমীক্ষা গোটা বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই সমীক্ষা দেখিয়েছে,

এইএসআই প্রক্রিয়া সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এর কাঠামো কিন্তু এক নয়। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য এই কাঠামোর নিয়ত পরিবর্তনশীল। বাংলার ক্ষেত্রে প্রথম খসড়া তালিকায় এক কোটি রোহিঙ্গার সন্ধান করতে না পেরে পরের ধাপে নির্বাচন কমিশন কৌশল বদলে ফেলে। যৌক্তিক অসঙ্গতিকে নতুন বলার কারণ বিহার এসআইআরে এই বিষয়টি ছিল না। এক্ষেত্রে বানান ভুল, ছয় সন্তানের পিতা, বাবা ও ছেলের বয়সের অসঙ্গতি, এমনকি ২০০২ এ কোন ভোটারের কার্ডে যদি কোন তথ্যগত বিভ্রান্তি পরে কমিশনের নিয়মে সংশোধন হয় তবে সেই মানুষকেও শুনানির চিঠি ধরানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে শুনানির হার অনেক বেশি। যেমন মুর্শিদাবাদ (৬৬% মুসলিম, এসআইআর নোটিশ ৩০.২০%), উত্তর দিনাজপুর (৪৯.৯% মুসলিম, নোটিশ ২৯.৭৫%), মালদা (৫১.৩% মুসলিম, ২৮.৪২% এসআইআর নোটিশ)। কিন্তু যে সমস্ত জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা কম, সেখানে এসআইআর নোটিশের হারও কম। যেমন বাঁকুড়া (৮% মুসলিম, এসআইআর নোটিশ ১১%), পুরুলিয়া (৭.৮% মুসলিম, শুনানির হার ১২%)। আমরা যদি মুসলিম প্রধান কিছু বুথের দিকে তাকাই তাহলে সংখ্যা তত্ত্বটা আরো সহজে বোধগম্য হবে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় পোলিং স্টেশন ৫২, নোটিশ ৫৪০ জন, পিএস ৫৩, নোটিশ ৫৩০, পিএস ৬৩, নোটিশ ৫০৩। আবার হুগলি যেখানে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু মুসলিমরাও আছেন, সেখানে পঞ্চায়েত ভিত্তিক ছবিটাও একই প্যাটার্নের। মুসলিম প্রধান নবাবপুর, ভগবতীপুর পঞ্চায়েত নোটিশের সংখ্যা যথাক্রমে ৫০০০ ও ৪০০০ কিন্তু হিন্দু প্রধান কৃষ্ণরামপুরে নোটিশের সংখ্যা ১০০০ মাত্র। একথা আর লুকানো যাচ্ছে না যে এই যৌক্তিক অসঙ্গতির গল্পের একটা সাম্প্রদায়িক সূত্র রয়েছে।

এইএসআই প্রক্রিয়া সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এর কাঠামো কিন্তু এক নয়। রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণের জন্য এই কাঠামোর নিয়ত পরিবর্তনশীল। বাংলার ক্ষেত্রে প্রথম খসড়া তালিকায় এক কোটি রোহিঙ্গার সন্ধান করতে না পেরে পরের ধাপে নির্বাচন কমিশন কৌশল বদলে ফেলে। যৌক্তিক অসঙ্গতিকে নতুন বলার কারণ বিহার এসআইআরে এই বিষয়টি ছিল না। এক্ষেত্রে বানান ভুল, ছয় সন্তানের পিতা, বাবা ও ছেলের বয়সের অসঙ্গতি, এমনকি ২০০২ এ কোন ভোটারের কার্ডে যদি কোন তথ্যগত বিভ্রান্তি পরে কমিশনের নিয়মে সংশোধন হয় তবে সেই মানুষকেও শুনানির চিঠি ধরানো হয়েছে। জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা ১.৬৭ কোটি। এদিকে আমরা দেখলাম নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্ররা ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেছেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি অ্যাপের প্রয়োগগত সমস্যার কারণে এত অসঙ্গতি তৈরি হচ্ছে। আর এই অসঙ্গতির অজুহাতে কাদের নিশানা করা হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট। সাংবাদিক অপর্ণা ভট্টাচার্য 'দি ওয়ার' পোর্টালে একের পর এক প্রতিবেদনে স্পষ্ট করেছেন এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি শুনানির চিঠি গেছে সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলোতে, এমনকি সবচেয়ে বেশি সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে মুসলমানদের নাম। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া কিভাবে নির্বাচন কমিশন চালিয়েছে তা প্রকাশ করে দিয়েছে রিপোর্টার্স কালেকটিভ (আয়ুশি করের প্রতিবেদন) : "In west bengal, the ECI did not run the SIR in a vacuum. Rather, they issued orders one after another that twisted the process to such an extent that even those who were running the process could not keep it straight. None of these intermittent orders were made public. While some changes to the SIR were communicated in writing to local officers, most of the important instructions reached the staff through informal channels."। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ভিডিও কনফারেন্স, মৌখিক ফতোয়ার এক জগত যা বিএলওদের জন্য এক সন্ত্রাসের রাজত্ব বয়ে এনেছিল। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর ৬০ লক্ষ নাগরিককে বিচারাধীন রাখা এক চক্রান্তের অংশ। স্বাভাবিক ভাবেই কেউ জানে না এদের ভবিষ্যত কি!

এসআইআর প্রকল্পের পরতে পরতে রয়েছে ফ্যাসিবাদী

বৈশিষ্ট্য। জার্মানিতে ইহুদি নিধন যজ্ঞ শুরু করার আগে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করে ইহুদিদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণার পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছিল। এদেশেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একই ভাবে ঘৃণা ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে। অনুপ্রবেশের জুজু দেখিয়ে এসআইআরের পক্ষে বৈধতা তৈরি করা হচ্ছে। ফ্যাসিবাদ জনগণকে শেখায় রাষ্ট্রের স্বার্থে জনগন বলিপ্রদত্ত। নোটবন্দী যেমন মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছিল, এই এসআইআর তেমনি এক তথাকথিত অনুপ্রবেশ মুক্ত শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়ে জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে এনেছে। ফ্যাসিবাদের আরেকটি চরিত্র লক্ষণ হল মতপ্রকাশের অধিকারকে, প্রশ্ন করার অধিকারকে রুদ্ধ করা। এসআইআর শুরু করার আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ সমস্ত কমিশনারদের এমনভাবে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা যাবতীয় প্রশ্ন ও আইন থেকে রক্ষা পান। এই রক্ষাকবচ থেকে সর্বোচ্চ আদালত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছে যে কমিশনাররা কি আইনের সীমানার বাইরে! ফ্যাসিবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ সহ সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান শাসকের সুরে কথা বলে। এসআইআর সংক্রান্ত একাধিক মামলায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থাকলেও আদালত কিন্তু এসআইআরের সাংবিধানিক বৈধতা সংক্রান্ত মামলাটিতে কোন নির্ণায়ক রায় দেয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তের যে ধারা লক্ষ্য করা গেছে, তাতে এই বিলম্ব বা পর্যবেক্ষণ সচেতন মহলের নজর কেড়েছে।

আশার কথা হলো, এসআইআরের ধারাবাহিক আগ্রাসন ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শিবির বিভাজন স্পষ্ট। একদিকে একমাত্র বিজেপি, যারা এই এসআইআরকে তাদের মেরুকরণের রাজনীতির অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। অন্যদিকে রয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন পূর্বতন বামফ্রন্ট, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, এসইউসিআই, আইএসএফ এবং সিপিআই(এমএল) লিবারেশন। সংসদীয় বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সবাই এসআইআরের প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধিতা রেখেছে, যদিও প্রতিবাদের ভরকেন্দ্রে রয়েছে ষাট লক্ষ বিচারাধীন ভোটার। এই দলগুলো বহুল ব্যবহৃত ধরনা-রাজনীতিকে আশ্রয় করেছে। শুধু পার্থক্যকারী জায়গাটা হলো সিপিআই(এম) বিচারাধীন ভোটারদের দুর্ভোগের জন্য রাজ্য সরকারের প্রশাসন ও তৃণমূল কংগ্রেসকে বিজেপি-নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছে। এই চালচিত্রে একটি দাবি জনপ্রিয় হয়েছে তা হলো, ষাট লক্ষ মানুষকে বিচারাধীন রেখে নির্বাচনের ঘোষণা করা যাবে না। এর পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নাগরিক প্রতিবাদের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যস্তরে বিচারাধীন নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য একাধিক ফোরাম তৈরি হচ্ছে। এনআরসি-বিরোধী আন্দোলনের সময়ের মতো পার্ক সার্কাসে অবস্থান চলছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কলকাতা সফরে নানান ধরনের প্রতিবাদ দেখা গেছে, যা কল্লোলিনীর মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই প্রতিবাদ আশু ফল না দিতে পারলেও সর্বোচ্চ আদালত সম্প্রতি যে ট্রাইবুনালের প্রস্তাব করেছে, তা ভবিষ্যতের লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই ফ্যাসিবাদী প্রকল্প ভারতীয় জনগণের জন্য কি বিপর্যয় ডেকে আনছে তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়েছে সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। কোনরকম সংবিধান সংশোধন ছাড়া, কোন দেশব্যাপী বিতর্ক ছাড়াই একতরফা ভাবে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে ধ্বংস করে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আলোচনার শুরুতেই আমরা উল্লেখ করেছি যে সংসদীয় বিরোধী দলগুলো এসআইআরের প্রায়োগিক সমস্যাগুলোর বিরোধ করে এবং কিছু রিলিফ আদায় করে খুশি থাকছে। এরা ভুলে যাচ্ছে এই অবস্থানের কারণে একটি স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে তারা বৈধতা দিচ্ছে এবং গণ হারে ভোটদানের অধিকার বহিষ্কার করার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠছে। দাবিটা হওয়া উচিত ছিল এসআইআর প্রক্রিয়াকে বর্জন করার, এই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কারণে বাদ পড়া সমস্ত নামকে ভোটার তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্তি। বলা উচিত ছিল ভোটার তালিকাকে সংশোধন করার কাজের সঙ্গে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের কাজ যুক্ত করা আইন বিরুদ্ধ, দাবি করতে হত আজ পর্যন্ত যত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে জনতার সামনে প্রকাশ করার এবং ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বছরকে মান্যতা দেওয়া যাবে না। সৌভাগ্যের বিষয় হল মুষ্টিমেয় অধিকার সংগঠন তথা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষ একথাগুলো বলেছেন। তবে সেই কথাগুলো যাতে জনতার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য চেষ্টা জারি রাখতে হবে।

প্রাণ আছে, এখনও আশা আছে

সুমন সেনগুপ্ত

সুইটি বিবি, ৩৩ বছর বয়স। তাঁর দুই সন্তান, একজন কুরবান যার বয়স ৬ এবং ১২ বছরের ইমরান সহ আজ প্রায় ৮ মাস হয়ে গেল বাংলাদেশের জেলে আছে। সুইটি বিবি দিল্লিতে ময়লা কুড়ানোর কাজ করতেন। তাঁদের ৩ জনকে দিল্লি পুলিশ গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করেছে। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন। তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বাংলাদেশের জেলে পচতে হচ্ছে। বীরভূমের মুরারাইয়ের বাসিন্দা সুইটি বিবির আরও এক প্রতিবেশী সোনালি খাতুনকে মানবিকতার খাতিরে দেশে ফেরানো হলেও, সুইটি বিবি জানেন না তাঁর কপালে আর কতদিন এই কষ্ট আছে। তিনি আর দিনও গোনাও ছেড়ে দিয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা হয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে রীতিমত ধমক দিয়েছিল সোনালি খাতুন মামলায়।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রশ্ন করেছিল, কোন এক্তিয়ারে ১৮ জুন, সোনালি খাতুন, তার স্বামী দানিশ এবং তাদের আট বছরের ছেলে, বীরভূমের পাইকার গ্রামের বাসিন্দা, সুইটি এবং তার দুই ছেলে, যারা বীরভূমের ধিতোরা গ্রামের বাসিন্দা, তাদের সাথে দিল্লি পুলিশ এই আচরণ করেছিল। যথারীতি কোনও উত্তর দিতে পারেনি, কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় চলা দিল্লি পুলিশ। অনেক টালবাহানার পরে গত বছরের ৫ ডিসেম্বর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) এর মধ্যে পতাকা বৈঠকের পর গর্ভবতী সোনালি কে তার ছেলেসহ ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়, কিন্তু দলের বাকি সদস্যদের সেখানেই থাকতে হয়। এরপর, সোনালি বাংলায় সন্তান প্রসব করেন।

শুধু সোনালি বিবি বা সুইটি বিবি নন, আমরা কী করে ভুলে যাব মালদহের পরিযায়ী শ্রমিক আমির শেখের কথা, যাকে রাজস্থান থেকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল পে লোডার করে। তাঁরও একই অপরাধ, তিনিও বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক, তিনিও বাংলার বাসিন্দা, তিনিও বাংলায় কথা বলতেন। যদিও ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের কোনও নির্দিষ্ট নথি নেই,

তা সত্ত্বেও আমির শেখ কিন্তু তাঁর কাছে থাকা সমস্ত পরিচয়পত্র দেখিয়েছিলেন। তাঁর ভোটার পরিচয়পত্র, আধার, রেশন কার্ড দেখানো সত্ত্বেও রাজস্থান সরকারের পুলিশ আমিরকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেয়, আর তাঁরাও আইন কানুনের তোয়াক্কা না করে আমিরকে বাংলাদেশে ছুঁড়ে ফেলে। একটা সভ্য দেশে এই ধরনের শাস্তি সম্ভব কি না, সেই প্রশ্ন কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালত কিংবা কলকাতা হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে করেনি। একবারও জিজ্ঞেস করেনি, কী ভাবে বোঝা গেল আমির বাংলাদেশী? বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশী এই ভাষ্যটা কে ঠিক করে দিল? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি পারেন সমস্ত বাংলাভাষীকে বাংলাদেশী দাগিয়ে দিতে? ভোটার তালিকায় যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলছে বাংলা সহ ১২টি রাজ্যে সেখানেও শুধুমাত্র বাংলায় কেন বাংলাদেশী খোঁজার হিড়িক? কেন মুসলমান মানেই বাংলাদেশী এই ভাষ্যটা দাঁড় করানো হল, সেই প্রশ্ন তো আজকেই করার দিন, কারণ আজকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

যখন দেশের নানান প্রান্তে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশী বলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, যখন বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চলছে, তখন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস আরও বড় একটা ঘোষণা করেছেন, যা আরও ভয়ঙ্কর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে নাকি এবার থেকে বাংলাদেশী চেনা হবে, সেইরকম প্রযুক্তি তাঁরা আনতে চলেছেন। বাংলায় কথা বললে, সেই ভাষার কথা এবং স্বর-নিক্ষেপকে বিশ্লেষণ করা হবে, তার মধ্যে দিয়েই নাকি চেনা যাবে কে ভারতীয় বাঙালি আর কে বাংলাদেশী। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায় প্রতিটি মানুষকে এই যে সন্দেহের তালিকায় রাখা, প্রতিটি মানুষকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ভাবা এবং সেই ভাবনাকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই আসলে ফ্যাসিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট। ঠিক এই ভাবনাই জড়িত করে দেওয়া হয়েছিল নাজি জার্মানিতে। ইহুদিদের খাওয়া পরা এবং পাশের মানুষকে ইহুদি ভাবার যে ধারণা সেটাই ফ্যাসিবাদ। এই প্রক্রিয়ায় সেই সময়ে সাহায্য করেছিল, বহুজাতিক সংস্থা আইবিএম। তাঁদের সহযোগী সংস্থা ডেহোম্যাগের মাধ্যমে হলেরিথ পাঞ্চ কার্ড প্রযুক্তি এই কাজটা করেছিল। এই প্রযুক্তি জনগণনার তথ্য সারণীবদ্ধ করতে, ইহুদি জনসংখ্যা সনাক্তকরণ এবং নিবন্ধন করতে ব্যবহৃত হত, যা গণহত্যাকে সহজতর করেছিল। এই প্রযুক্তি, যা প্রায়শই "আইবিএম কার্ড" নামে পরিচিত, তৃতীয় রাইখে দক্ষ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আজকের ভারতেও যে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চলছে, বা বিভিন্ন যে পরিচয়পত্র তৈরী করে, একটা কেন্দ্রীভূত তথ্যভান্ডারে রাখা হচ্ছে। এই তালিকা যে ভবিষ্যতের গণহত্যার জন্য আগাম তালিকা নয় তা কে বলতে পারে? তবে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে বাঙালির ওপর এই আক্রমণ নিয়ে কিন্তু শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালির কিন্তু এখনও ঘুম ভাঙেনি। তাঁরা মনেই করে না, বাঙালি ভাষার জন্য আক্রান্ত হচ্ছে, তাঁদের ধারণা শুধুমাত্র পরিযায়ী শ্রমিকেরা আক্রান্ত হচ্ছেন, কিন্তু বিষয়টা একেবারেই তা নয়। সারা দেশে বাঙালি বিদ্বেষী একটা হাওয়া তৈরী হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি পর্যটকেরাও যে আক্রমণের শিকার হননি বা ভবিষ্যতে হবেন এমনটা নয়। বাঙালির খাওয়ার অভ্যেসের ওপরেও নানান জায়গায় আক্রমণ হয়েছে। অভিনেতা পরেশ রাওয়াল একবার বলেছিলেন, যে তাঁর পাশের বাড়ি থেকে মাছের গন্ধ আসে, তা তাঁর অপছন্দের। পরে অবশ্য তিনি ভুল স্বীকার করে নেন। কিন্তু তাতেও কি বিতর্কটা কমেছে?

কিছুদিন আগে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলাম ২১ শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে এটি বিশ্বজুড়ে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশীদের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানিদের) ভাষা আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে যে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) সালাম, রফিক, বরকত ও জব্বার। সারা দিনে অনেক সভা, সমিতি সেমিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা নিয়ে আলোচনা হল, চর্চা হল। প্রধানমন্ত্রীও শুভেচ্ছা জানাতে দ্বিধা করবেন না। ২০২২ সালে এই দিনেই প্রধানমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন নিজের মাতৃভাষায়- "आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरु हो चुकी है" তাঁর কথার মানে দাঁড়ায়, একজন শিশুর মানসিক বিকাশ তখনই সম্ভব হয়, যখন সে তাঁর মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে। তাহলে সোনালি বিবির যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, কিংবা

সুইটি বিবির দুই সন্তান ইমরান আর কুরবান যদি পরবর্তীতে নিজের মাতৃভাষায় পড়াশুনা করে, কথা বলে তাহলে কি তাঁদের বাংলাদেশী দাগিয়ে দেওয়া হবে, এই প্রশ্ন তো করতে হবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে। তাহলে তাঁর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বার্তার কি কোনও মানে থাকে, নাকি সবটাই লোকদেখানো মনে হয়। তখন প্রশ্ন উঠবে ভাষা দিবসে আমাদের প্রাপ্তির ভান্ডার কি শূন্য?

তবে এই এত কিছু খারাপের মধ্যেও কি আশার আলো কোথাও নেই? সবটাই কি অন্ধকারাচ্ছন্ন? কোথাও কি সংখ্যালঘু মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো মানুষ নেই? বিশ্বের তথা ভারতের ইতিহাস কিন্তু তা বলে না।

আমাদের দেশের উত্তরে 'উত্তরাখণ্ড' বলে একটা চমৎকার রাজ্য আছে। পাহাড়ে মোড়া সে-রাজ্যের সরকার বর্তমানে কিছু খারাপ, ঝগড়ুটে লোকের হাতে। কিন্তু উত্তরাখণ্ডে এই মুহূর্তে তাঁরা আলোচিত নয়। একমাত্র আলোচিত মানুষ, আলোকিত মানুষ— 'মহম্মদ দীপক'! ওই রাজ্যের কোটদ্বার শহরের বাজারে একজন বয়স্ক মুসলমান দোকানির একটা জামাকাপড়ের দোকান ছিল। তিনি বেচতেন বাচ্চাদের স্কুলের পোশাক। দোকানের নাম ছিল 'বাবা' শপ। একদিন সকালে বজরং দলের কিছু লোকেরা এসে তাঁকে বলে, "মুসলমান লোক দোকানের নাম 'বাবা' শপ রাখতে পারবে না।" নাম নাকি পাল্টাতে হবে। 'বাবা' বলে নাকি ওরা ওদের ঈশ্বরকে ডাকে।

মাসখানেক ধরে বারবার তাঁরা দোকানিকে উত্যক্ত করছিল। হঠাৎ নাম বদলালে যে ব্যবসার সমস্যা হবে— একথা তারা বুঝতেই চাইছিল না। শেষে একদিন বেদম ঝামেলা পাকাল তারা। তখন এক তাগড়াই চেহারার ভালো মানুষ রুখে দাঁড়ালেন। তিনি জিম চালান, গায়ে খুব জোর। লোকে তাঁকে 'দীপক কুমার' বলে চেনে। মুসলমান দোকানিকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর ওই বজরং দলের গুন্ডাদের সঙ্গে হাতাহাতির জোগাড়। তাঁকে নাম জিজ্ঞেস করতে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'মহম্মদ দীপক'। মুসলমান নাম। কিন্তু এটা তো তাঁর আসল নাম নয়! তিনি তো হিন্দু— দীপক কুমার। তিনি নিজের এই নাম বলেছিলেন, কারণ তাঁর ধর্ম, যা কি না হিন্দুধর্মই, তাঁকে আর্তর সঙ্গে একাত্ম হতে শিখিয়েছে। সেই দিন থেকেই 'মহম্মদ দীপক' সারা দেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

সেদিন চলে গেলেও পরের দিন পুলিশি প্রহরায় বজরং দলের গুন্ডারা আবার এসে দীপক কুমারের জিমের সামনে ঝামেলা শুরু করে। বাধা দিতে গিয়ে তিনি গ্রেফতার হলেন। বর্তমানে ছাড়া পেয়েছেন। যদিও তাঁর নামে পুলিশে অভিযোগ জমা পড়েছে— কিন্তু তিনি ভয় পাননি। উল্টে সামাজিক মাধ্যমে এসে বলেছেন, তিনি কোনও অন্যায় করেননি। তিনি একটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং ভারতবাসী হিসেবে তাঁর প্রধান কর্তব্য পালন করেছেন।

দীপক কুমার যা বলেছেন, তা আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জরুরি একটি বার্তা— যখন ঘৃণা-বিদ্বেষের আবহাওয়া দূষিত করে চলেছে আমাদের দেশকে। 'আমি হিন্দু নই, মুসলিম নই, শিখ নই, খ্রিস্টানও নই। প্রথমত, আমি একজন মানুষ। কারণ মৃত্যুর পর আমাকে ঈশ্বর এবং মানবতার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, কোনও ধর্মের কাছে নয়।' অন্য সংখ্যালঘু মানুষদের আড়াল করাই তো একজন সংখ্যাগুরুর দায়িত্ব হওয়া উচিত। সেই শিক্ষাই তিনি আমাদের দিলেন। ওই ভিডিও বার্তায় তিনি আরও বলেছেন, 'আমি আপনাদেরকে, আমার ভাইবোন ও বন্ধুদের বলতে চাই যে, আমাদের দেশের ভালোবাসা ও স্নেহ প্রয়োজন, ঘৃণা নয়। আপনারা যত খুশি ঘৃণা ছড়াতে পারেন; তা থামানোর কোনও উপায় নেই। কিন্তু ভালোবাসা ছড়ানোটা অনেক বড় ব্যাপার।'

ভিডিওটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই দীপককে এক্স, ইনস্টাগ্রাম এবং ফেসবুকে দক্ষিণপন্থী সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে। তাঁর পাবলিক প্রোফাইলগুলো আপত্তিকর মন্তব্যে ভরে গিয়েছে। একই সঙ্গে, অনেক ব্যবহারকারী তাঁর অবস্থানের জন্য সমর্থন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। দেশের লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সরাসরি এই 'মহম্মদ দীপক'কের এই কাজকে সমর্থন করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেল লিখেছেন, 'উত্তরাখণ্ডের দীপক ভারতের নায়ক'। তিনি আরও লিখেছেন, 'সংঘ পরিবার ইচ্ছাকৃতভাবে দেশজুড়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষ ছড়াচ্ছে যাতে ভারত বিভক্ত থাকে এবং কিছু ব্যক্তি ভয়ের মাধ্যমে শাসন চালিয়ে যেতে পারে।'

রাহুল গান্ধীর এই কথার মধ্য দিয়ে ঘটনাটির রাজনৈতিক মাত্রাও বেড়েছে। আর বাড়বে না কেন,

যেখানে বিভিন্ন রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, ভারতে ঘৃণার চাষ এই কেন্দ্রীয় সরকারের সময়ে ঊর্ধ্বমুখী। একটি মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়া হেট ল্যাব'-এর মতে, ২০২৪ সালে ভারতে দেশটির ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ঘটনা 'বিস্ময়করভাবে' বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের রিপোর্ট বলছে, এই উদ্বেগজনক বৃদ্ধি ক্ষমতাশালী 'ভারতীয় জনতা পার্টি' (বিজেপি) এবং বৃহত্তর হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আদর্শগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। গত ২০২৪ সালের ভারতের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লোকসভা নির্বাচনের সময় সমালোচক এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের মেরুকরণের করার লক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যকে নজিরবিহীন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জনসভাগুলোতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদেরকে 'অনুপ্রবেশকারী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং দাবি করেন যে, প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস যদি জয়ী হয়, তবে তারা দেশের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করবে।

বিজেপির হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিৎকার ভারতের ২২ কোটিরও বেশি মুসলিম জনসংখ্যাকে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে ঘৃণামূলক মন্তব্যের ঘটনা ২০২৩ সালে ৬৬৮টি ছিল, যা ২০২৪ সালে ১,১৬৫টিতে পৌঁছেছে, যা বিস্ময়করভাবে ৭৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই 'ইন্ডিয়া হেট ল্যাব' তাঁদের রিপোর্টে লিখেছে, ঘৃণামূলক মন্তব্যে ৯৮.৫ শতাংশই মুসলমানদের লক্ষ্য করে দেওয়া হয়েছিল। এর দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ঘটনা বিজেপি বা তার সঙ্গীদের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিতে ঘটেছে। আজকে ২০২৬ সালে যদি হিসেব করা যায়, তাহলে তা নিশ্চিত বেড়েছে বলেই বিশ্বাস। প্রতিটি মুসলমান মানুষ আতঙ্কে দিন কাটান রোজ, আবার কোনও আইন এনে তাঁদের হয়রানি করা হবে না তো? সারা দেশে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে বাদ যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলেছেন, তিনি বাংলাভাষী মুসলমান, অর্থাৎ 'মিঁয়া'দের কষ্ট দিতে চান।

যখন চারিদিকে এই ঘৃণার পরিবেশ, যখন আমাদের চেনা শহরেও চিকেন প্যাটিস বিক্রি করার অপরাধে হেনস্তা হতে হচ্ছে, যখন একটি কলকাতার বিখ্যাত রেস্তরাঁতে একজন মুসলমান বেয়ারাকে, একটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তাঁর ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ শুনতে হচ্ছে তখন উত্তরাখণ্ডের 'মহম্মদ দীপক' যেন রূপকথার চরিত্র হিসেবে সামনে আসছেন। তবু আশা জাগে, দীপকের মতো মানুষ আছে বলেই। এই ঘটনার কথা অবশ্যই পরের প্রজন্মের মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। 'মহম্মদ দীপক' আমাদের বোঝালেন, আমাদের এই দেশটা অসম্ভব সুন্দর, পাহাড়-নদী ও অনেক বড় এবং পাশাপাশি-মানুষের হৃদয়ও বড় মাপের। তবুও এখানে আছে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে কোনও নিরাপত্তা নেই। এই অন্ধকারে ভয় ছাড়া কিছু নেই সংখ্যালঘুদের জন্য। তবু আমরা লড়ব, ভালোবাসব, এক হব, ঐক্য ও ভালবাসার দেশ গড়ব। কারণ, এ দেশ সত্যিই আমাদের প্রত্যেকের— তোমার, আমার, আমাদের।

আমাদের বড় হওয়ার সময়ে দূরদর্শনে প্রচারিত হওয়া সেই শিল্পী, সাহিত্যিক, ক্রীড়াবিদদের উপস্থিতিতে সেই গান যেন 'মহম্মদ দীপক' আবার নতুন করে গেয়ে উঠলেন— 'মিলে সুর মেরা তুমহারা/তো সুর বনে হামারা।' দীপক কুমার ওরফে মহম্মদ দীপক আজকের এই ঘৃণা বিদ্বেষের সময়ে আশার আলো। একদিন সুইটি বিবি ফিরবেন, একদিন মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এই আশাটা একেবারেই দূরাশা নয়। এটা বাস্তব। এবারের ঈদ ও হয়তো তাঁরা নিজেদের ভিটেতে পালন করতে পারলেন না, কিন্তু একদিন আমরা সবাই সুইটি বিবি, সোনালি বিবিদের সঙ্গে ঈদ পালন করবো, সেটা নিশ্চিত জানি।

বিখ্যাত কবিদের কাব্য ভাবনায় ঈদ প্রসঙ্গ

তৈমুর খান

'ঈদ' শব্দটি মূলত একটি আরবি শব্দ। আরবি 'আওদ' মূল ধাতু থেকে 'ঈদ' শব্দটি এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো ফিরে আসা। যেহেতু এই দিনটি প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে বারবার ফিরে আসে, তাই একে 'ঈদ' বলা হয়। প্রচলিত অর্থে ঈদ বলতে এমন এক আনন্দঘন দিনকে বোঝায়, যা বারবার ফিরে এসে মনে প্রশান্তি ও খুশি জাগিয়ে তোলে। ইসলামি পরিভাষায়, দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর যে উৎসব আসে তা হলো ঈদুল ফিতর, আর ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর উৎসবটি হলো ঈদুল আজহা।

বাংলা সাহিত্যে ঈদ কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাম্য এবং মিলনের এক শাশ্বত প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় পুঁথি সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালের কবিতা ও গদ্য-সবখানেই ঈদের আনন্দ ও আর্তমানবতার প্রতিফলন দেখা যায়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে ঈদ কেবল একটি তারিখ নয়, বরং এটি একটি মানবিক চেতনা। বড়দের শ্রদ্ধা জানানো, ছোটদের স্নেহ এবং আর্তমানবতার সেবার যে মহিমা সাহিত্যে বারবার উঠে এসেছে, তা-ই মূলত বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যের আয়নায় ঈদের এই গভীর জীবনদর্শনকে অন্বেষণ করলে আমরা কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় প্রধান তিনটি দিক উঠে আসতে দেখি-আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক ঐক্য এবং মানবিক করুণাধারা। তাঁদের লেখনীতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সেসব বিষয়ই ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাংলা সাহিত্যে ঈদের প্রথম দিকের পদচারণা মূলত পুঁথি সাহিত্যের হাত ধরে। সৈয়দ সুলতান বা শেখ ফয়জুল্লাহর মতো কবিদের লেখনীতে ধর্মীয় অনুষঙ্গ হিসেবে ঈদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তা মূলত ধর্মীয় আখ্যান নির্ভর হলেও আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক মিলনমেলা হিসেবেও এর গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।

সৈয়দ সুলতান ও 'নবী বংশ':

ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সৈয়দ সুলতান তাঁর মহাকাব্য 'নবী বংশ'-এ ইসলামের ইতিহাস ও নবীগণের জীবনী বর্ণনায় ঈদের প্রসঙ্গ এনেছেন। তাঁর বর্ণনায় ঈদ আসে দীর্ঘ ত্যাগের পর এক স্বর্গীয় উপহার হিসেবে। কবির ভাবনায় প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উঠে আসে:

"রোজা অন্তে আইল ঈদ আনন্দিত মন,
খুশিতে মগন হৈল যত মোমিনগণ।"

কবির রচনায় ঈদের চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে যে ব্যাকুলতা এবং পরবর্তী উৎসবের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনেরও একটি প্রতিফলন। তিনি ঈদকে 'মোমিনগণের মিলন' হিসেবে চিত্রিত করেছেন। মোটকথা সৈয়দ সুলতানের লেখায় ঈদ অনেকটা মহিমান্বিত ও শাস্ত্রীয় প্রেক্ষাপটে উপস্থিত। তিনি ঈদের আধ্যাত্মিক বিজয়কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

শেখ ফয়জুল্লাহ ও 'জয়নবের চৌতিশা':

মধ্যযুগের আরেক শক্তিমান কবি শেখ ফয়জুল্লাহ। তাঁর 'জয়নবের চৌতিশা' বা অন্যান্য পদাবলীতে শোক ও আনন্দের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। যদিও তাঁর অনেক কাব্য বিরহ ও কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার ওপর আধারিত, তবুও সেখানে উৎসবের স্মৃতি হিসেবে ঈদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর রচনায় ঈদের তাৎপর্য ফুটে ওঠে এভাবে:

"মাসের শেষেতে উদয় হইল চান,
ঈদ উৎসবে মাতিল সবার প্রাণ।"

কবির কাব্যে ঈদের চাঁদ দেখা এবং সেই আনন্দকে খোদার নেয়ামত হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়টি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ শেখ ফয়জুল্লাহর বর্ণনায় ঈদের আনন্দ আবেগী ও মানবিক। লোকজ সংস্কৃতির ছোঁয়া তাঁর কাব্যভাষায় ঈদের বর্ণনাকে প্রাণবন্ত করেছে।

কবিতায় ঈদ: নজরুলের সাম্যবাদ ও ফররুখের আর্তনাদ

নজরুলের কাছে ঈদ ছিল শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের হাতিয়ার। তাঁর কবিতায় ঈদ মানেই হলো মানুষের সাথে মানুষের মহামিলন।

"আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরিদ।
ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।"

(কবিতা: রমজানের ওই রোজার শেষে)

আবার 'ঈদ মোবারক' কবিতায় তিনি আভিজাত্যের দম্ভ চূর্ণ করে লিখেছেন:

"ইসলাম বলে, সকলি সমান, কেহ নয় উচ্চ-নীচ,
মোসলেম-মিল্লাত-মউদিদ-মহফিলে নাই কোনো ভেদ-বিচ।
পদাঘাত করি' ছিন্ন কর রে আভিজাত্যের ওই বিষ।"

বাংলা সাহিত্যে ঈদকে সাধারণ মানুষের উৎসব হিসেবে জনপ্রিয় করেছেন কাজী নজরুল ইসলামই। তাঁর কালজয়ী গান ও কবিতা ছাড়া বাঙালির ঈদ আজও অপূর্ণ। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার এই মহান উৎসবকেই তিনি স্বাগত জানিয়েছেন তা পালনের মধ্য দিয়ে।

অন্যদিকে, ফররুখ আহমদ তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যে ঈদের আনন্দের পাশাপাশি সমাজের বঞ্চিত মানুষের হাহাকার তুলে ধরেছেন:

"পথে পথে ঘোরে ক্ষুধার্ত শিশু, ম্লান মুখ নিরুপায়
ঈদের চাঁদ কি এদের লাগিয়া নেভে আর জ্বলে হায়?
যাদের জীবনে আসেনি ঈদ একটি দিনের তরেও
তাদের লাগিয়া আল্লা-রসুল বলেছে কি কভু কেউ?"

(কবিতা: সাত সাগরের মাঝি)

ফররুখ আহমদের কবিতায় ঈদের আধ্যাত্মিকতাই শেষ কথা নয়, মানবিকতার গভীর দর্শনও প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কতখানি সহানুভূতিশীল ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তা এখানে স্পষ্ট হয়েছে। নজরুলের ঈদগাহ ময়দান হয়ে উঠেছে এমন এক মিলনমেলা যেখানে রাজা এবং প্রজা, আমির এবং ফকির একই সঙ্গে আলিঙ্গন করে। আর ফররুখ আহমদের কবিতায় ঈদের চাঁদ অনেক সময় দগ্ধ রুটির মতো মনে হয় সেইসব মানুষের কাছে যাদের ঘরে অন্ন নেই।

জসীমউদ্দীন: পল্লী বাংলার কবি

পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় ঈদ মানে কেবল আনন্দ বা উৎসব নয়, বরং এটি গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনা এবং সম্প্রীতির এক নিখুঁত ছবি। তাঁর 'জিঞ্জির' কাব্যগ্রন্থের 'ঈদ' বা অন্যান্য রচনায় ঈদের যে ভাবনা ফুটে উঠেছে, তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোই হলো সাম্য ও সম্প্রীতির বার্তা। জসীমউদ্দীন ঈদকে দেখেছেন মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ভোলার দিন হিসেবে। তাঁর কবিতায় আমির-ফকির, ধনী-দরিদ্র সবাই এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। ঈদের চাঁদ যেন

আহসান হাবীব মূলত মধ্যবিত্তের কবি। তাঁর কবিতায় ঈদের আনন্দ প্রায়ই অভাব-অনটন আর সীমাবদ্ধতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। সাধারণ মানুষের ঈদ উদযাপনের যে কায়ক্লেশ রূপ, তিনি তা পরম মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে নতুন জামা বা ভালো খাবারের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে জীবনসংগ্রাম। কবির কাছে ঈদ মানেই ফিরে যাওয়া সেই ফেলে আসা গ্রামে, যেখানে শৈশবের অমলিন স্মৃতি মিশে আছে। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে গ্রামের মেঠো পথ, শৈশবের নতুন জামার গন্ধ এবং বন্ধুদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার দৃশ্য। এই নস্টালজিয়া বা স্মৃতিকাতরতা তাঁর ঈদ বিষয়ক কবিতাকে এক ধরনের মায়াবী বিষণ্ণতা দান করে।

সবার জন্যই সমান আনন্দ নিয়ে আসে। ঈদের বর্ণনায় গ্রামের মেঠো পথ, নতুন ধানের গন্ধ এবং খড়ের চালের ঘরের আমেজ পাওয়া যায়। শহরের যান্ত্রিকতা নয়, বরং গ্রামের সহজ-সরল জীবনের প্রেক্ষাপটেই তাঁর ঈদ ভাবনা আবর্তিত হয়। তিনি শুধু উৎসবের উজ্জ্বল দিকটিই দেখাননি, বরং অভাবী মানুষের ঘরে ঈদের প্রস্তুতি কেমন হয়, সেটিরও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। এক চিলতে সেমাই বা এক টুকরো নতুন কাপড়ের জন্য গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের যে হাহাকার এবং তা পাওয়ার পর যে অকৃত্রিম হাসি-সেটিই তাঁর কবিতার প্রাণ।

আবার তাঁর কবিতায় ঈদ কেবল মুসলমানদের উৎসব নয়, এটি বাঙালির এক মিলনমেলা। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ি যাওয়া এবং আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার যে চিরচেনা বাংলার রূপ, তিনি তা দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

"আজকে সকল চাওয়া-পাওয়ার মিটবে রে ভাই আশ,
আসবে নেমে ধরণীতে খুশির বারো মাস।"

'ঈদ' কবিতায় ঈদের বর্ণনা অত্যন্ত সহজ, সরল এবং গ্রাম্য জীবনের মাধুর্যে ঘেরা। তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে সেইসব সাধারণ মানুষের ঈদের আনন্দ:

"ঈদের চাঁদের উদয় হয়েছে গগনে গগনে আজ,
মোমেনগণের হৃদয়ে লেগেছে রঙিন খুশির সাজ।
পাড়ায় পাড়ায় ফিরিছে বালকেরা দল বেঁধে সারি সারি,
নতুন জামার রঙ লেগেছে তাদের বুকের উপরি।"

এই চিত্র আজও আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। গ্রামের মানুষেরা জানেন সেই ঈদ তার ঐতিহ্যকে এখনো হারায়নি।

আহসান হাবীব: মধ্যবিত্তের জীবনশিল্পী

বাংলা সাহিত্যে কবি আহসান হাবীব সংবেদনশীল ও মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবে পরিচিত। তাঁর কাব্য ভাবনায় 'ঈদ' কেবল ধর্মীয় উৎসব হিসেবে আসেনি, বরং এটি এসেছে সামাজিক বাস্তবতা, শৈশবের স্মৃতি এবং মধ্যবিত্তের আনন্দ-বেদনার এক নিপুণ সংমিশ্রণ হিসেবে। তাঁর কবিতায় ঈদ প্রসঙ্গের প্রধান দিকগুলো হলো মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন, শৈশবের নস্টালজিয়া, সামাজিক বৈষম্য ও মানবের মিলনক্ষেত্র হিসেবে।

আহসান হাবীব মূলত মধ্যবিত্তের কবি। তাঁর কবিতায় ঈদের আনন্দ প্রায়ই অভাব-অনটন আর সীমাবদ্ধতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। সাধারণ মানুষের ঈদ উদযাপনের যে কায়ক্লেশ রূপ, তিনি তা পরম মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে নতুন জামা বা ভালো খাবারের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে জীবনসংগ্রাম। কবির কাছে ঈদ মানেই ফিরে যাওয়া সেই ফেলে আসা গ্রামে, যেখানে শৈশবের অমলিন স্মৃতি মিশে আছে। তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে গ্রামের মেঠো পথ, শৈশবের নতুন জামার গন্ধ এবং বন্ধুদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার দৃশ্য। এই নস্টালজিয়া বা স্মৃতিকাতরতা তাঁর ঈদ বিষয়ক কবিতাকে এক ধরনের মায়াবী বিষণ্ণতা দান করে।

আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় ঈদের সাম্যের দিকটি তুলে ধরার পাশাপাশি সমাজের কঠোর বাস্তবতাকেও উপেক্ষা করেননি। একদিকে বিত্তবানদের জাঁকজমক, অন্যদিকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শূন্যতা-এই বৈপরীত্য তাঁর কাব্য ভাবনায় ঈদের আনন্দকে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ করে। তাঁর ঈদ ভাবনা তাই কেবল উৎসবের নয়, বরং সহমর্মিতারও। কবির দৃষ্টিতে ঈদ হলো মিলনের উৎসব। সব ভেদাভেদ ভুলে মানুষের কাছাকাছি আসার এক সুযোগ। তাঁর কবিতায় ঈদ প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে বারবার ব্যক্ত হয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের

ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব। 'ঈদ মোবারক' কবিতায় সেই স্মৃতিকাতরতা আর সামাজিক বাস্তবতার মিশেলেই ফুটে উঠেছে কবির জীবন দর্শন:

"আজকে তবে খুশির জোয়ারে ভাসবে না কেন ভুবন?
কেন তবে আজ আঁখি-কোণে হানা দেবে শুধু ক্রন্দন?
এই ধরণীর ধূলোর ওপর বিছিয়ে সুখের শতরঞ্চি
আসুক ঈদ, নিয়ে আসুক আনন্দ আর বিরতি।"

আল মাহমুদ: আধুনিকতার ছোঁয়ায় ঈদ

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ গ্রামীণ পটভূমি, লোকজ ঐতিহ্য এবং ইসলামি সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় ঈদ কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি গ্রামবাংলার প্রকৃতি, শৈশবের স্মৃতি এবং আধ্যাত্মিক চেতনার মিশেলে এক জীবন্ত রূপ পেয়েছে। তাঁর কবিতায় ঈদ প্রসঙ্গের প্রধান কিছু দিকগুলি হলো-শৈশবের স্মৃতি, গ্রামবাংলার চিরচেনা রূপ, আধ্যাত্মিকতার পরিচয় এবং বিরহ ও একাকিত্ব।

আল মাহমুদের কবিতায় ঈদের কথা এলেই ফিরে আসে শৈশবের সেই হারানো দিনগুলো। তাঁর বিখ্যাত 'নোলক' কাব্যগ্রন্থসহ বিভিন্ন কবিতায় ঈদ এক আনন্দময় নস্টালজিয়া হয়ে ধরা দেয়:

"আব্বা বলেন, 'আয়রে খোকা ঈদগাহেতে যাই,'
আম্মা বলেন, 'বড্ড দেরি, সেমাই রাঁধি আমি।'
নতুন জামা গায় দিয়ে সব ছোট ভাইবোন,
রঙিন হাসির হররা ছোটে আমার বাড়ি ঘর।"

শহুরে যান্ত্রিকতার চেয়ে আল মাহমুদের ঈদ অনেক বেশি শেকড়মুখী। ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে যে উত্তেজনা, তা তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে চমৎকারভাবে:

"বাঁশবাগানের মাথার ওপর উঠল ঈদের চাঁদ,
খুশির জোয়ার নামল যেন কাটল দুখের ফাঁদ।"

তিনি ঈদের চাঁদকে কেবল আকাশের জ্যোতিষ্ক হিসেবে দেখেননি, বরং একে দেখেছেন দুঃখ মোচনের প্রতীক হিসেবে। কবির কাছে ঈদ মানে ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া এবং এক পরম সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ। তাঁর কবিতায় নামাজের দৃশ্য এবং মোনাজাতের আকুলতা বারবার ফিরে এসেছে:

"কাতার কাতার মানুষ দাঁড়ায় শুভ্র টুপি মাথায়,
এক হয়ে সব মিশে গেছে এক ইমামের কথায়।"

জীবনের শেষ দিকে কবির কবিতায় ঈদের আনন্দ কিছুটা ম্লান ও একাকিত্বের সুরেও ধরা দিয়েছে। প্রবাসের ঈদে ফেলে আসা দিনগুলোর প্রতি তাঁর হাহাকার ফুটে উঠেছে:

"আমার ঈদ তো কাটছে একা স্মৃতির জানালায়,
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো সব ডাকছে আমায় তায়।"

আল মাহমুদের শ্রেষ্ঠ তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩), 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩) এবং 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' (১৯৯৪)। এই তিনটি গ্রন্থেই কবি যেভাবে গ্রামীণ জীবন, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতাকে মিলিয়েছেন, সেখানে ঈদ কোনো বিচ্ছিন্ন উৎসব হিসেবে নয় বরং বাঙালির মজ্জাগত সংস্কৃতির অংশ হিসেবে উঠে এসেছে। 'লোক লোকান্তর'-এ কবি মূলত নিজের অস্তিত্ব ও চেতনার উৎস খুঁজেছেন। এখানে ঈদ আসে গ্রামবাংলার চিরায়ত রূপ নিয়ে। কবির কাছে ঈদ মানেই শহর ছেড়ে সেই চেনা ধুলোবালির গ্রামে ফিরে যাওয়া।

"শহরের এই ধুলোবালি আর যান্ত্রিক কোলাহল,
ছেড়ে যাব সেই গাঁয়ে যেখানে ঈদের চাঁদ ওঠে অতল।"

এই পঙক্তিতে কবি ঈদের চাঁদকে কেবল আকাশের বস্তু হিসেবে দেখেননি, বরং একে শান্তির এক 'অতল' আধার হিসেবে দেখেছেন যা শহরের যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়।

'সোনালী কাবিন' আল মাহমুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী কাব্যগ্রন্থ। এখানে তিনি গ্রামীণ জীবনের শ্রমজীবী মানুষের প্রেম এবং লড়াইকে তুলে ধরেছেন। এই কাব্যে ঈদ কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের আনন্দ ও বিরহকে স্পর্শ করে। একটি কবিতায় ঈদ ও উৎসবের আমেজ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

"গরিবের ঘরে ঈদের চাঁদের হাসিখানি বড় ম্লান,
তবু তো জাগে অন্তরে এক মিলনের কলতান।"

'সোনালী কাবিনে'র কবি অত্যন্ত বাস্তববাদী। তিনি জানেন গ্রামের কৃষকের ঘরে ঈদের আনন্দ সবসময় পূর্ণতা পায় না। অভাব থাকলেও মানুষের মনে যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটিই কবির কলমে ফুটে উঠেছে।

আল মাহমুদের পরবর্তী জীবনের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না' একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাজ। এই সময়ে কবির লেখনীতে আধ্যাত্মিকতা, আত্মসমর্পণ এবং ইসলামের মৌলিক চেতনার প্রতিফলন অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখানে ঈদ কেবল উৎসব নয়, বরং স্রষ্টার প্রতি এক গভীর আর্তি এবং জীবনের নশ্বরতাকে স্বীকার করে নেওয়ার উপলক্ষ্য। এখানে কবির মোনাজাতের সুর প্রবল।

"ঈদের নামাজ শেষে যখন হাত তুলি আসমানে,
মনে হয় এক নূরের নদী বইছে আমার প্রাণে।"

এখানে কবি ঈদের নামাজের পর যে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন, তাকে 'নূরের নদী'র সাথে তুলনা করেছেন। এটি তাঁর গ্রামীণ নস্টালজিয়া থেকে সরে এসে আরও বেশি গভীর ধর্মীয় উপলব্ধির পরিচয় দেয়। এই কাব্যে ঈদ মানেই ভেদাভেদ ভুলে যাওয়া।

"একই কাতারে দাঁড়াই যখন আমীর ও ফকির ভাই,
তখন বুঝি এই পৃথিবীতে পর বলে কেউ নাই।"

এইভাবেই 'অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না'য় কবি সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে, ঈদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ভুলে একই কাতারে দাঁড়ানো। আল মাহমুদ এই পর্যায়ে জীবনের শেষ সময়ের উপলব্ধি থেকে লিখেছেন। এখানে ঈদের আনন্দের সাথে মিশে আছে পরকালের ভাবনা:

"ঈদের জামাতে লুঙ্গির ভাঁজে যে খুশির ঢেউ দেখি,
তা কি কেবল এই পৃথিবীর? নাকি ওপার হতে শিখি?"

কবি ঈদকে কেবল জাগতিক আনন্দ হিসেবে দেখেননি, বরং একে পরকালীন মুক্তির এক পূর্বাভাস হিসেবে কল্পনা করেছেন। অর্থাৎ, দুনিয়ার ঈদ যেন আখেরাতের মহামিলনের একটি ক্ষুদ্র মহড়া।

কেন আল মাহমুদের 'ঈদ' অনন্য?

আল মাহমুদের ঈদ অনন্য হয়ে ওঠার কিছু কারণ আমরা জানতে পারি:

১) চিত্রকল্প: তিনি ঈদকে কেবল শব্দে নয়, রঙিন সব ছবির মতো ফুটিয়ে তোলেন।

২) লোকজ অনুষঙ্গ: সেমাই, আতর, সুরমা এবং নতুন লুঙ্গির মতো অনুষঙ্গগুলো তাঁর কবিতায় ঈদকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসে।

৩) ধর্ম ও সংস্কৃতি: তিনি ধর্মীয় অনুশাসনকে লোকজ সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে গেঁথেছেন যে তা সাধারণ মানুষের প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

"আমাদের ঈদ আমাদের এই মাটির সোঁদা ঘ্রাণে,
মিশে আছে ভাই-বোনের হাসি, আর কৃষাণের গানে।"

তাঁর কবিতায় ঈদের এই মানবিক ও গ্রামীণ রূপটি চিরন্তন মানবিকতা বোধের পরিচয় বহন করছে। চিত্রকল্পগুলিও অনেক সময় লোকজ এবং ধর্মীয় অনুভূতির এক অনন্য মিশ্রণ তৈরি করেছে।

"আমার মায়ের আঁচলে বাঁধা সেই ঈদের নতুন টাকা,
আজও মনে পড়ে সেই দিনগুলো-স্মৃতিতে রঙিন আঁকা।
ঈদগাহ মাঠের ধুলোমাখা পথ, আতরের সুবাস বয়,
হৃদয়ে খুশির নহর বয় যেন, নেই কোনো সংশয়।"
(কবিতা: ঈদের স্মৃতি)

আমাদের বাস্তব জীবনকে এক আধ্যাত্মিক পবিত্রতার সেতুতে এসে দাঁড় করিয়েছেন আল মাহমুদ। আমরা যে শূন্যতা, যে রিক্ততা ও ক্লান্তি-বিপন্নতা নিয়ে জীবনযাপন করি তা থেকে মুক্তি পেতে এই আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আমাদের উপলব্ধির দরজা খুলে দেয় আর এখানেই তাঁর ভাবনার অনন্যতা।

ঈদকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য তথা কবিতার ডালি ফুলে-ফলে ভরে উঠেছে। যুগে যুগে কবিরা তাঁদের উপলব্ধিকে, তাঁদের জীবনযাপনকে, তাঁদের সময়কে ক্যামেরাবন্দি করেছেন। ইসলামি সংস্কৃতির একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এই ঈদ ভাবনা। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে কিছুতেই একে উপেক্ষা করা যায় না।

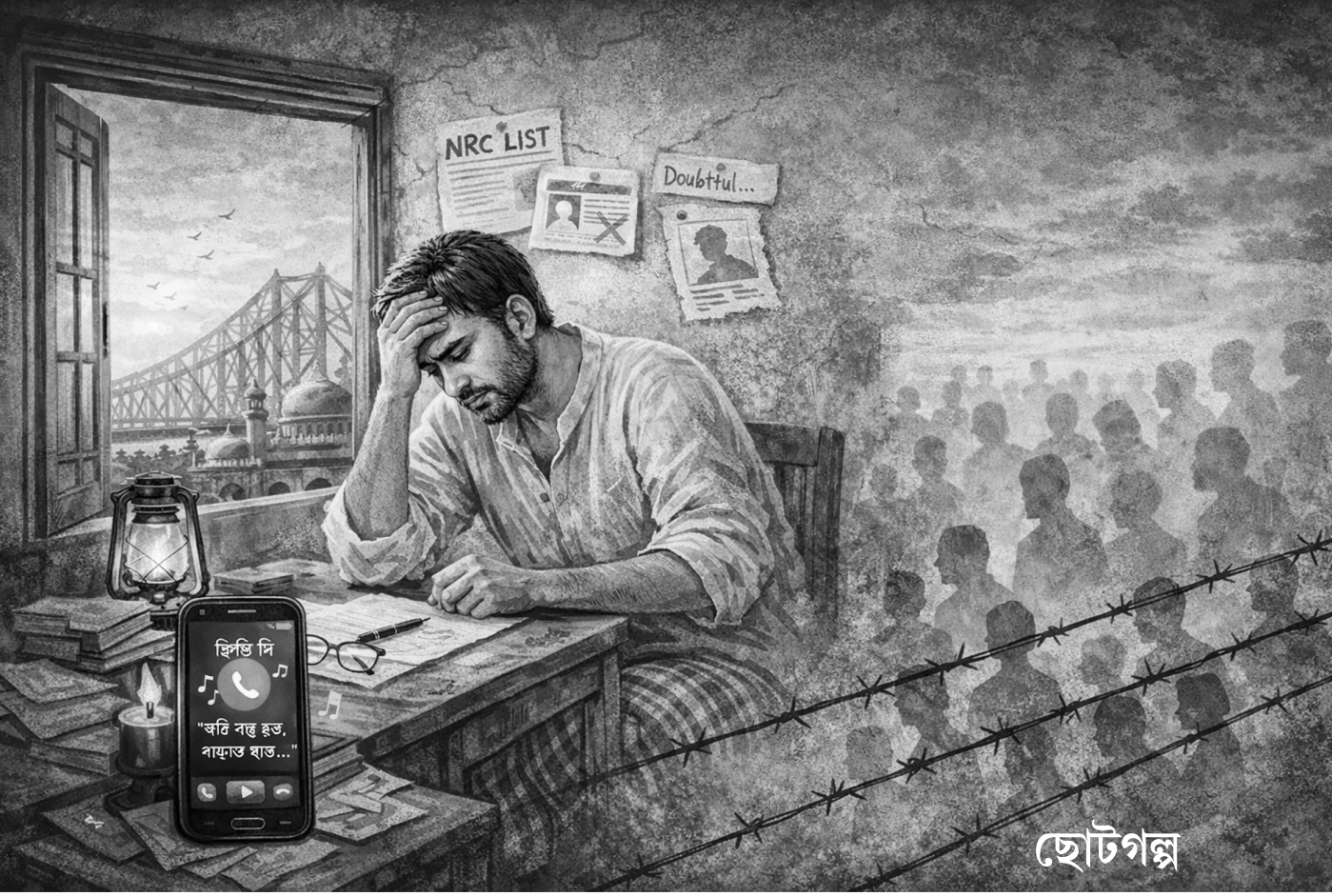

ছোটগল্প

দাগ

ইসমাইল দরবেশ

হাওড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তের এক পুরোনো মহল্লায় আফসার থাকে। একখানা ঘর, জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকে সকালের কচি রোদ আর সন্ধ্যার নরম হাওয়া। বয়স তার তিরিশের সামান্য ওপরে। ইতিহাসে স্নাতক। সাহিত্যের প্রতি তার অগাধ আকর্ষণ। মালদহ জেলার সীমান্ত লাগোয়া প্রত্যন্ত গ্রাম সরিতপুর থেকে এসে এখানে থাকে। কলকাতার একেবারে কাছেই। শিবপুর ব্রিজ টপকালেই কলকাতা মহানগরী।

বছর পাঁচেক আগে আসা আফসার ভেবেছিল, কলকাতা ঘেঁষে না থাকলে সাহিত্য জগতকে চেনা যাবে না। কিন্তু শুধু সাহিত্য করলে কি পেট ভরে? চেয়েছিল সাংবাদিকতা করতে। পোষায়নি। ছোট কাগজে প্রতি মাসে ঠিকঠাক বেতন পাওয়া দুষ্কর। পার্ক সার্কাস এলাকায় যে বেসরকারি অফিসে কাজ করে আফসার, তার সামনেই পুরোনো মসজিদ। আফসারের ভিতরে আছে ধর্মের প্রতি একটা নরম টান। ধূপের ধোঁয়ার মতো কোমল, কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মতো নয়। অর্থাৎ আফসার জুম্মা তো বটেই, মাঝেমধ্যে জোহর আর আসরের নামাজও পড়ে। দোকানের মালিক নামাজের সময়টুকু ছাড় দিয়ে থাকেন। এই সুযোগে আফসার ডুবে যায় কলকাতার ইতিহাস-চেতনার অনন্য স্রোতে। সেই স্রোত থেকেই জন্ম নেয় নানান আখ্যান।

আফসারের লেখক-পরিচিতি তৈরি হয়েছে এই আখ্যানধর্মী রচনা থেকেই। অল্প কিছু পাঠক তাঁর প্রতি নরম ভালোবাসা দেখায়। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটা তো নরম নয়! বিশেষ করে পৃথিবী যে কখন নরম আর

কখন গরম হয়ে উঠবে, তা নির্ভর করে রাজনৈতিক শক্তির ওপর।

আফসার লেখে। গল্প, প্রবন্ধ, কখনও কখনও রম্যরচনাও। মানুষের গল্প লেখে। ধর্মকে ছাড়িয়ে সেই গল্পে উঠে আসে নিখাদ মানবতার প্রতিকৃতি। ছোট, অল্প পরিচিত ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় এইসব লেখা। বড় কাগজেও দু-চারটি যে প্রকাশ হয়নি, এমন নয়। তার গল্পগুলি চোখে পড়ে অনেকের। কেননা আফসার বিভিন্নজনের কাছ থেকে শুনেছে, তার লেখা নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়। কিন্তু কলকাতার মূলধারার সম্পাদকরা তার নাম শুনলেই ভুরু কুঁচকান।

একদিন এক সম্পাদক ফোনে বলেছিলেন-

'দেখুন, আপনার লেখা খারাপ নয়। কিন্তু বাজার তো বুঝতেই পারছেন!'

আফসার মাথা চুলকে জানতে চেয়েছিল-

'আমার লেখার সঙ্গে বাজারের কী সম্পর্ক?'

ওপাশে দীর্ঘশ্বাস। বললেন-

'আসলে আপনার নামটা, মানে ইয়ে-। আপনি চাইলে আমরা অন্য নামে আপনার লেখা ছাপতে পারি। আর একটা পরামর্শ দিই, আপনার গল্পের চরিত্র বা প্লটগুলো যদি একটু পরিবর্তন করতেন-মানে, আপনার অনেক লেখাতেই একটা সুনির্দিষ্ট সমাজকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে।'

'সে না হয় মানলাম, কিন্তু নিজের নামে কী সমস্যা?'

'সমস্যা আপনার নেই, আমাদের আছে। শিল্প-সাহিত্যে নাম পরিবর্তন বিষয়টা নতুন তো নয়! আপনাকে খারাপ কিছু বলা হয়নি। ইউসুফ খান যদি দিলীপ কুমার হতে পারেন, আপনার সমস্যা কোথায়?'

আফসার প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। একি কথা শুনছে সে? এমন কথা তো শোনা যেত না আগে! ক্ষোভ চেপে রেখে হেসে বলল আফসার-

'আপনি সাহিত্য-সম্পাদক। সাহিত্যিক আফসার আহমেদের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন? আমার নামেই নাম। তাঁর তো সমস্যা হয়নি স্বনামে লিখতে এবং বিখ্যাত হতে!'

তিনি ফোন কেটে দিলেন। ফোন কেটে গেলে আফসার হেসে ফেলেছিল। সেই হাসি এক করুণ হাসি। কিন্তু তারপরেও তার মন খারাপ হয়নি। কারণ কলকাতা নামক শহর তাকে যে চেনে না, এটুকু সে জানে। কিন্তু আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল। মানুষ মানুষকে চিনতে শেখার আগেই খোপে ভরে ফেলছে কেন ইদানিং? কী হল এই বাংলার?

তার পাঠকের সংখ্যা কম। কিন্তু তারই মধ্যে আছে কয়েকজন, যারা তার লেখা বেশ পছন্দ করেন। যেমন তৃপ্তি মুখার্জি। দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলশিক্ষিকা। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। মননে উদার, ভাষায় নম্র। তিনি তার ফেসবুকের ফলোয়ার এবং পাঠিকা। প্রায়ই মেসেজ লিখতেন। এই তো মাস সাতেক আগে একটি গল্প পড়ে লিখলেন-

'আপনার গল্প পড়লে মনটা পরিষ্কার হয়। মনে হয় মানুষ হওয়াটাই যথেষ্ট, আর কিছু দরকার নেই। বিশেষত ইতিহাসকে অবলম্বন করে আপনি যে শ্রমজীবী মানুষের বেদনার কথা লেখেন, তাতে আমি বেশ অভিভূত হই।'

আফসার মৃদু হেসে বারবার সেই মেসেজ পড়ত।

একমাত্র এই পাঠিকাই তাকে মাঝে মাঝে নতুন গল্প লিখতে বাধ্য করত। কখনও তারা ফোনেও কথা বলত। তাদের সম্পর্কটি দিদি ও ভাইয়ের মতো হয়ে গিয়েছিল।

তৃপ্তিদি হেসে বলতেন-

'তুমি এত চুপচাপ কেন? লেখকেরা তো সাধারণত বাচাল হয় শুনেছি।'

আফসার মৃদু উত্তরে বলত-

'আমি যে লেখকই নই দিদি! আপনারাই তৈরি করেছেন আমার লেখক-পরিচিতি। নইলে আমি এমন কী আর-।'

'তুমি খুব বিনয়ী। তোমার ফোনের রিংটোনে যে গানটি আছে, আমার ভালো লাগে। আসলে এসব থেকেও রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।'

বিনয়ী কথা। তাদের কথা খুব দীর্ঘ হত না, কিন্তু যতটুকু কথা হত, তা ছিল বেশ ভরাট-উৎসাহব্যঞ্জক।

কিন্তু সবকিছুই কি আগের মতো থাকে? থাকে না। পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে। এক একটি ঘটনায় সেই পরিবর্তনটা হঠাৎ করেই সামনে এসে যায়। উন্মুক্ত হয় নানা আবরণ। যেদিন এসআইআর ঘোষিত হল রাজ্যে, জনসাধারণের মধ্যে অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, সেদিন উপলব্ধি করল এই পরিবর্তনটা। রাষ্ট্রীয় নির্দেশ-নতুন করে বৈধ ভোটার কারা, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। তা হোক, হওয়াটা বেশ জরুরি মনে হল আফসারের।

সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলের স্বাভাবিক টান আছে আফসারের ভাষায়। একদিন তৃপ্তিদি ফোন করলেন।

টোনে একটা কাঁপুনি-যেন কিছু বলতে চাইছেন, কিন্তু

সাহস পাচ্ছেন না। তারপর জানতে চাইলেন-

'আচ্ছা, তুমি কতদিন হল এখানে আছো?'

আফসার স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিল-

'বছর পাঁচেক তো হবেই।'

'এখন তাহলে কী হবে তোমার? তুমি ফিরবে কী করে?'

'কেন, কী হয়েছে? কোনও সমস্যা?'

'আমি ইয়েদের কথা বলছি। এসআইআর। ২০০২ লিস্টে তো-।'

আফসার হাসল। বলল-

'আছে তো!'

'আছে মানে? কীভাবে আছে?'

'যেভাবে আপনার আছে, সেভাবেই আছে।'

'তুমি কি বাংলাদেশ থেকে আসনি, আফসার? মানে-তোমার গল্পে কিছু শব্দ, কিছু টোন দেখে আমার মনে হয়েছে তুমি বোধহয়-আমি ভুলও হতে পারি!'

আফসার প্রথমে বুঝতে পারল না। তারপর যেন বুকের ভেতর কোথাও ধাতুর ঠান্ডা আওয়াজ বাজল। সে ধীরে ধীরে বলল-

'না, আমি তো এখানকারই ছেলে। আমাদের চোদ্দপুরুষের বাস। যাকে বলে ভূমিপুত্র। কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

তৃপ্তি উত্তর দিলেন-

'না না, তেমন কিছু না। আজকাল পরিস্থিতি খারাপ! ফেসবুক, খবরে দেখছ না; অনেক কথা উঠছে। তাই ভাবলাম-।'

আরও কয়েকটা বাক্য যোগ হয়েছিল। আফসার ক্রমশই বধির হয়ে যাচ্ছিল। শেষ কথাটি শুনতে পেল-

'তুমি ভুল বুঝবে না আফসার, এটা শুধু আমার কৌতূহল ছিল।'

আফসার এমনিতেই কম কথা বলে। বারবার শেষ শব্দটা তার কানে বাজছে। কৌতূহল? কিসের কৌতূহল? তারপর তার বোধ জেগে ওঠে। না, ওটা কৌতূহল নয়-ওটা আসলে অবিশ্বাসের নরম ছুরি। যে ছুরি দিয়ে তৃপ্তিদি তাকে এক মুহূর্তের মধ্যে কেটে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। সে নিজের মনে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল-'তাহলে তুমিও?'

যে একমাত্র পাঠিকা তাকে মানুষ হিসেবে দেখেছিল, সেও নামের ওপর ধুলো জমতে দেখছে? কলেজ জীবনের বন্ধুদের কথা মনে পড়ল। 'তুই তো আলাদা রে, তুই কিন্তু ওদের মতো না।' আফসার তখন হাসত। আজ সেই হাসি কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আফসার ফর্ম ফিলআপ করার জন্য চলে গেল গ্রামে। আফসারের দাদা সমস্ত ডকুমেন্ট রেডি করে রেখেছিল। আফসারের সুন্দর হস্তাক্ষরের কারণে কেবল পরিবার নয়, তাদের প্রায় পুরো পাড়ারই ফর্ম ফিলআপ করতে হল তাকে। এগারো শো ভোটার। পাঁচশো তেইশজন হিন্দু ভোটার। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান বিষয়টা এখনও জাঁকিয়ে বসেনি। অন্তত শ'খানেক ফর্ম তাদেরও পূরণ করতে হয়েছে আফসারকে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও বারবার সেই শব্দ ভেসে আসছিল-কৌতূহল!

কাজ সেরে ফিরে এল হাওড়ার সেই বাসায়। অনেকদিন লেখা হয়নি। আজ লিখতে বসল। লিখতে বসলেও লেখা হচ্ছে না। কলম তুলে আবার রেখে দিল সে। লেখা আসছে না কেন? ক্রমশই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে লিখন-মেধা? আফসার খুবই বিরক্ত হচ্ছে। এই কদিন সে ফেসবুক অফ রেখেছিল। রাত দশটার দিকে তৃপ্তিদি ফোন করলেন।

'আফসার, কী খবর তোমার? একদম চুপচাপ!-কেমন আছো তুমি?'

আফসার ভাঙা গলায় বলল-

'তৃপ্তিদি, আমার গল্পে আপনি মানুষ খুঁজে পান, কিন্তু আমার মধ্যে কেন দাগ খুঁজলেন, সেটাই ভাবছি।'

ওপাশে দীর্ঘ নীরবতা।

তারপর তিনি বললেন-

'কিসের দাগ?'

'কলঙ্কের দাগ।'

'কলঙ্ক? কী সব বলছ তুমি? আমি বুঝতে পারছি না।'

'ভাবুন। সেদিন আপনি আমাকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভাবলেন? কৌতূহল?'

'ওহ! ওই কথাতে তুমি ব্যথা পেয়েছ? তোমরা যারা লেখালেখি করো, খুব সেন্সিটিভ। আচ্ছা, ক্ষমা চাইছি। ঠিক আছে, তোমার সম্পর্কে না হয় ভুল ধারণা পোষণ করে ফেলেছি। কিন্তু তোমাদের স্বজাতি কি এমন গিজগিজ করছে না কলকাতায়?'

'কী বলছেন আপনি? ইদানিং আপনি বোধহয় ফেসবুক বেশি দেখছেন, তাই না?'

তৃপ্তিদি এই প্রথম অতৃপ্তিসূচক শব্দে ফোনটা রেখে দিলেন। ফোনটা কেটে গিয়েছিল খুব ধীরে।

আফসার তারপরেও লেখালেখি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে গেল। পারল না। পরের দিন, তার পরের দিন।

না, কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না অবিশ্বাসের এই বাতাবরণ। আফসার লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিল।

মোবাইল থেকে সাহিত্যবন্ধুদের গ্রুপ মুছে ফেলল। ফেসবুক থেকেও সরিয়ে নিল নিজেকে।

ফাইনাল লিস্ট প্রকাশিত হবে আজ। আফসারের কোনও উদ্বেগ নেই। সন্ধ্যার পর তাদের বিএলওকে ফোন করে লিস্টটা পিডিএফ করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর অনুরোধ করল। রাতের দিকে হোয়াটসঅ্যাপ চেক করে আফসার অবাক হল। মোট তিনশো তিরাশি জন 'বিচারাধীন' হয়েছে। নামের মধ্যে দাগ। তাদের পরিবারের একজন বাদে সকলেই। গুনে গুনে দেখল, এর মধ্যে মাত্র তিনজন হিন্দু ভোটার! বাকি সকলেই মুসলমান। আফসারের পিতা, যার জন্ম স্বাধীনতার পূর্বে, তাকেও রাখা হয়েছে বিচারাধীন!

এও কি সম্ভব? কীভাবে সম্ভব?

বিএলওকে ফোন করল। তিনি তার অপারগতা জানালেন। সব নাকি ওপর মহলের খেলা। তার আর কিছুই করার নেই।

বুকের মধ্যে পাষাণ ভারী আবেগ কাজ করছে। নির্বাচন কমিশনের এ কেমন বিচার? ম্যাপিংয়ের সময় সবই ঠিকঠাক ছিল, আর ফাইনাল লিস্টে একি অবস্থা? এই বিচারাধীন ভোটারদের ভবিষ্যৎ কী?

ফেসবুক খুলল। নানা জনের নানান পোস্ট পড়ল, ভিডিও দেখল। অস্থির হল মন। অনিদ্রায় কাটল সারা রাত।

দিন কয়েক পরে সকালে ব্রেকফাস্ট করছে, ঠিক তখন ফোন বেজে উঠল। তৃপ্তিদি ফোন করেছে। আফসার ফোন রিসিভ করল না। করতে পারল না।

এক সুরে বেজে চলেছে রিংটোন-

"যদি বন্ধু হও, বাড়াও হাত-জেনো থামবে ঝড়।"

আফসারের রিংটোনটি ভারী সুন্দর। তারপরেও রিসিভ করতে পারল না তৃপ্তিদির ফোন। বেজেই চলল ফোনটা। রিংটোনটি বারবার শুনতে মন চাইছে।

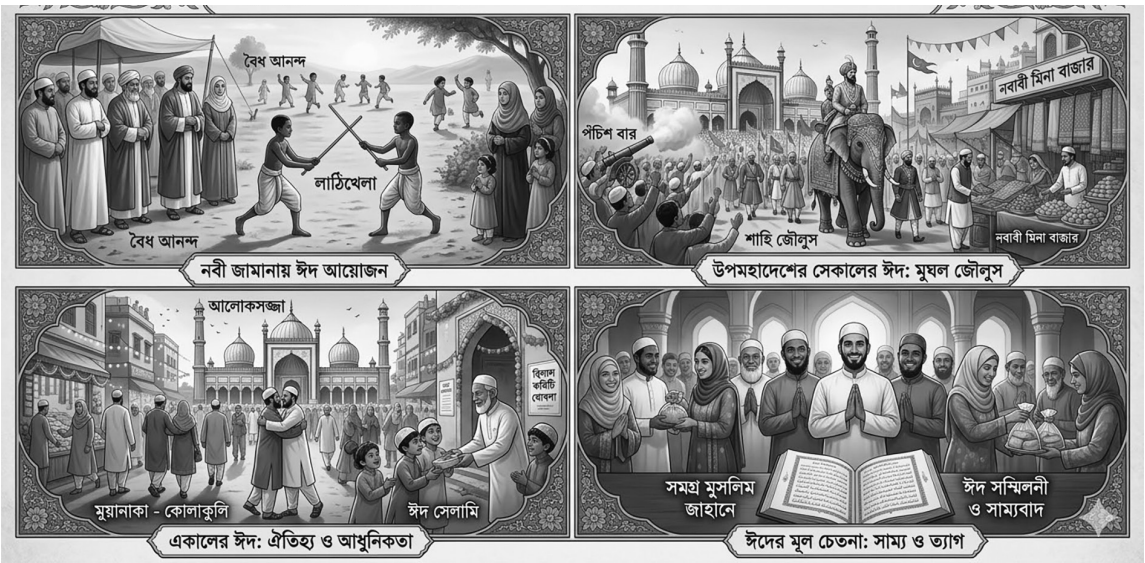

ঈদ: ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পরিবর্তনের গল্প

ওহিদ রেহমান

ঈদ শব্দের অভিধানিক অর্থ 'ফিরে ফিরে আসা'। ইসলামি ইতিহাস অনুসারে, ইসলামের শেষ পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পরপরই প্রথম ঈদ উদযাপন শুরু হয়। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই উদযাপন ইসলামের বিশেষ কোনো অর্জনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়নি। এই উৎসব হতে পারত নবীর জন্মদিন, নব্যুয়ত প্রাপ্তির দিন, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দিন কিংবা বদরের প্রান্তরে ঐতিহাসিক বিজয় দিবসের দিন-যে যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম রাসুল (সা.)-এর নেতৃত্বে এক অসম লড়াইয়ে লড়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে যা 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা হক ও বাতিলের পার্থক্যের দিন রূপে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু নবী (সা.) তেমন কোনো দিনকে উৎসবের জন্য নির্ধারণ করেননি। তৎকালীন সময়ে পৌত্তলিক আরবে 'মিহিরজান' ও 'নওরোজ' নামে দুটি উৎসব প্রচলিত ছিল, যা নব্য ইসলামের অনুসারীদের নিকট ছিল ভীষণরকম কুরুচিপূর্ণ। তাই নবী করিম (সা.) সেই প্রথার পরিবর্তে মুসলিমদের দুটি উপহার দিলেন, যার একটি ঈদুল ফিতর এবং অপরটি ঈদুল আজহা। এই দুই উৎসব মূলত ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনের সমাপনী পর্ব রূপে পালিত হয় সমগ্র মুসলিম জাহানে।

নবী জামানায় ঈদ আয়োজন:

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ঈদ পালন করা হয় হিজরি দ্বিতীয় বর্ষে বদর যুদ্ধে বিজয়ের ১৩ দিন পর, শাওয়াল মাসের এক তারিখে। এটি ছিল প্রথম ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন। সেই বছরই মদিনার ইহুদি গোত্র বনুকাইনুকাকে পরাজিত করার পর জিলহজ মাসের দশ তারিখে প্রথমবারের মতো ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ পালন করা হয়। আজকের মতো তৎকালীন সময়েও ঈদ উদযাপনে শিশুদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মহানবী (সা.) ঈদের দিন ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের আনন্দে শরিক হতেন। ছোটদের বৈধ আনন্দে তিনি কখনো বাধা দেননি। সহিহ বুখারি শরিফের হাদিসে (২৯০৬) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার ঈদের দিনে আয়েশা (রা.)-এর ঘরে দুটি বালিকা 'দফ' (একপাশ খোলা ঢোল বিশেষ) বাজিয়ে বুআস যুদ্ধের স্মৃতি নিয়ে গান গাইছিল। নবী করিম (সা.) ঘরে এসে অন্য পাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকলেন। এমতাবস্থায় সাহাবি আবু বকর (রা.) তার কন্যা আয়েশাকে ধমক দিয়ে বললেন, "এই শয়তানি বাজনা বন্ধ করো।" তখন রাসুল (সা.) তাঁর দিকে ফিরে

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ঈদের শাহি জৌলুস ছিল সারা দেশজুড়ে। বাহারি খাবার আর কেতাবি পোশাকে ম ম করত চারপাশ। রমজানের শেষাংশে শুরু হতো চাঁদ দেখার তোড়জোড়। উনত্রিশে রমজানের সন্ধ্যায় দিকে দিকে সম্রাটের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়তেন চাঁদ দেখার জন্য। সম্রাটের অনুচররা যখন চাঁদ দেখার খবর নিয়ে ফিরতেন, তখনই শুরু হতো অনাবিল আনন্দ। প্রাসাদের নাকারখানায় পঁচিশ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে ঈদের আগমনী বার্তা ঘোষণা করা হতো। তৎকালীন সময়ে মুঘল সম্রাটেরা শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লির জামে মসজিদে ঈদের নামাজে অংশ নিতেন।

বললেন, "ওদের বকো না।" অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী (সা.) বললেন, "হে আবু বকর, ওদের ছেড়ে দাও। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই বিশেষ উৎসবের দিন থাকে, আর আজ হলো আমাদের ঈদের দিন।" (বুখারি, হাদিস : ৩৯৩১)। আসলে নবী করিম (সা.) বলতে চেয়েছিলেন, ভিন্ন ধর্মের মানুষরা যেন জানতে পারে যে ইসলামে বৈধ আনন্দ-ফুর্তির অবকাশ আছে। আয়েশা (রা.) আরও বর্ণনা করেন, একদিন ঈদের দিন আবিসিনিয়ার কিছু লোক লাঠি খেলছিলেন। মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আয়েশা! তুমি কি লাঠিখেলা দেখতে চাও?" আমি সম্মতি জানালে তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করান। আমি আমার গাল রাসুলের গালের ওপর রেখে লাঠিখেলা দেখতে লাগলাম। আল্লাহর হাবিব এমনই কোমল হৃদয়ের ছিলেন। আবার সাহাবিদের ঈদ উদযাপনের পদ্ধতি ছিল আলাদা; তারা একে অপরের জন্য দোয়ার মাধ্যমে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতেন। এই উদযাপন নি:সন্দেহে অনন্য।

উপমহাদেশের সেকালের ঈদ:

অবিভক্ত ভারতবর্ষে ঈদের শাহি জৌলুস ছিল সারা দেশজুড়ে। বাহারি খাবার আর কেতাবি পোশাকে ম ম করত চারপাশ। রমজানের শেষাংশে শুরু হতো চাঁদ দেখার তোড়জোড়। উনত্রিশে রমজানের সন্ধ্যায় দিকে দিকে সম্রাটের প্রতিনিধিরা ছড়িয়ে পড়তেন চাঁদ দেখার জন্য। সম্রাটের অনুচররা যখন চাঁদ দেখার খবর নিয়ে ফিরতেন, তখনই শুরু হতো অনাবিল আনন্দ। প্রাসাদের নাকারখানায় পঁচিশ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে ঈদের আগমনী বার্তা ঘোষণা করা হতো। তৎকালীন সময়ে মুঘল সম্রাটেরা শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লির জামে মসজিদে ঈদের নামাজে অংশ নিতেন। ঈদ উপলক্ষে প্রতিটি মসজিদ ও ঈদগাহ ময়দান বর্ণিল সাজে সাজানো হতো। সম্রাটকে বহনকারী হাতিকে জাঁকজমকভাবে সাজানো হতো। ঈদের সকালে সম্রাট প্রথমে আসতেন 'দেওয়ান-ই-আম' দরবারে, সেখানে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। সম্রাট ঈদগাহে পৌঁছালে তোপধ্বনি করা হতো। তাঁর জায়নামাজ বিছানো হতো ইমাম সাহেবের ঠিক পেছনে। ইমাম সাহেব যখন খুতবা পাঠ করতেন, তখন প্রথা অনুযায়ী তাঁর কোমরে একটি তলোয়ার ঝুলিয়ে দিতেন 'দারোগা-ই-কুর' বা অস্ত্রাগারের তত্ত্বাবধায়ক। ঈদের নামাজ শেষে সম্রাট 'দেওয়ান-ই-খাস'-এ অভিজাতদের সঙ্গে সভায় বসতেন, উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং তাদের ফুলের মালা ও পাগড়ি উপহার দিতেন। মুঘল আমলে দুই ঈদ ছিল জাতীয় উৎসব। শাহিখানার আলোকিত দরবারে সকলের প্রবেশ ছিল অবাধ। উৎসব উপলক্ষে নবাবী মিনা বাজার বসত। আর জাকাত, ফিতরা, সাদকা প্রভৃতি বিতরণের মাধ্যমে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে জনগণের আর্থ সামাজিক বৈষম্য কমানোর চেষ্টা চলত। ইসলাম ধর্মের রীতি অনুযায়ী সাদাকাতুল ফিতর ঈদের জামাতে অংশগ্রহণের আগেই দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করা অবশ্য কর্তব্য। স্বচ্ছল পরিবারগুলো সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত। কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, হুমায়ুন, আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ঈদুল আজহার সময় উপমহাদেশে গরু জবাইয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ছিল। যদিও অন্যান্য পশু জবাইয়ে ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের অভিমত, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত না করার প্রয়াস থেকেই এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

একালের ঈদ:

সময়ের সাথে সাথে যাপনরীতির পরিবর্তন হলেও ঈদের মূল ভাবনা আজও একই রয়ে গেছে। ঈদ আজও আট থেকে আশির মনে আলাদা অনুভূতি ফেরি করে। রমজানের শুরু থেকেই ঈদের দিন গণনা আরম্ভ হয়। নতুন প্রজন্ম পাড়া-মহল্লায় আলোকসজ্জার জন্য উদ্যোগী হয়, আর প্রবীণরা তাদের উৎসাহ দেন। রমজান শেষে যখন 'হিলাল' বা নতুন চাঁদ দেখা যায়, তখন আনন্দ উপচে পড়ে। আমাদের রাজ্যে চাঁদ দেখার জন্য 'হিলাল কমিটি' রয়েছে, যাদের ঘোষণার অপেক্ষায় প্রহর গোনে সাধারণ মানুষ। এ প্রজন্মের ঈদ আয়োজনের নতুন সংযোজন হলো 'চাঁদ রাত'। ঈদকে কেন্দ্র করে চলে কেনাকাটা। স্বচ্ছল পরিবারগুলো আত্মীয়-পরিজনদের পোশাক ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে। এর মাধ্যমে পারিবারিক সম্পর্কগুলোও নতুন প্রাণ ফিরে পায়। নবীজির সময় থেকেই ঈদের দিন কোলাকুলি বা 'মুয়ানাকা' একটি পরিচিত দৃশ্য, যা আজও সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে টিকে আছে। একসময় ঈদ কার্ডের খুব প্রচলন ছিল, যা আজ ডিজিটাল শুভেচ্ছার ভিড়ে অনেকটা হারিয়ে গেছে। ঈদের নামাজ শেষে এখন অনেকের ঠিকানা হয় রেস্তোরাঁ কিংবা অ্যামিউজমেন্ট পার্ক। তবে ঈদ সেলামি এখনো বহাল আছে। ছোটরা সার বেঁধে বড়দের কাছ থেকে ঈদ সেলামি আদায় করে।। ঈদ পরবর্তী 'ঈদ সম্মিলনী'ও আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঈদকে কেন্দ্র করে ঈদের পরের দিন থেকে ঈদ সম্মিলনীর নামে বিভিন্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বাচ্চা বুড়ো সকলেই সেইসকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু সেই সনাতনী ধারাকে বজায় রাখার আহ্বান জানান বহরমপুরের এক সভায় ১৯৬২ সালে। উৎসাহিত করেন দল-মত নির্বিশেষে 'ঈদ সম্মিলনী' আয়োজনের। সময় বদলে গেছে। তোষনের রাজনীতি আজ বড় বালাই। কালের অমোঘ নিয়মে আজ শূন্য প্রাসাদ। অধিকাংশ ভারতীয় মুসলিমদের জীবন ও শূনতায় ভরা।

উপসংহার:

ঈদ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় উৎসব। পৃথিবীর প্রায় ১৮০ কোটি মানুষ এই উৎসবে সামিল হন। তারা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন ইসলামের সুমহান সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং ত্যাগের বাণী। ঈদের জামাতে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার এক কাতারে দাঁড়িয়ে পড়া, শুভেচ্ছা বিনিময় করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজখবর নেওয়া, ইসলামের হাজার হাজার বছরের সাম্যবাদের চর্চার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। উৎসবের নামে নৈতিকতা বিবর্জিত বেলেল্লাপনা আয়োজনের অবকাশ ইসালামে কোনকালেই ছিল না, আজো নেই। কারণ ঈদ শুধু উৎসবই নয়, এটি একটি ইবাদত। তাই, আসুন ইসলামের দুই ঈদের চিরায়ত আহকাম আরকানকে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরতে আমরা সকলেই সচেষ্ট হই।

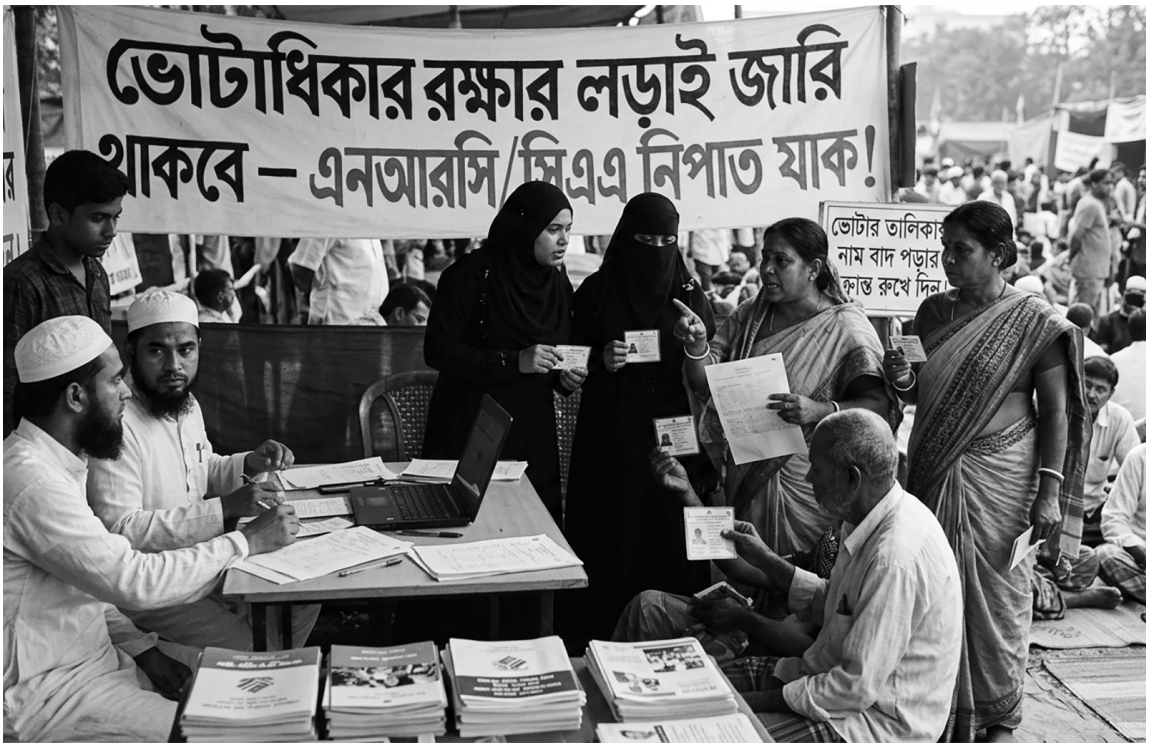

এসআইআর: যখন গণতান্ত্রিক অধিকার অস্তিত্বের সংকটে

মিরাজুল ইসলাম

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হলো ভোটাধিকার। এই অধিকার কেবল একটি রাজনৈতিক অধিকার নয়; বরং এটি নাগরিকের মর্যাদা, রাষ্ট্রের প্রতি তার অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর বৈধতার অন্যতম ভিত্তি। ভোটাধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সেই কারণে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধনের প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যক্রম। এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, নির্ভুলতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্র গণতন্ত্রের সুস্থ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গে পরিচালিত বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে বিতর্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, তা কেবল প্রশাসনিক একটি বিষয় নয়; বরং এটি নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রের নীতি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ এবং রাজনৈতিক বিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপট

নির্বাচন কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো একটি নির্ভুল ও আপডেটেড ভোটার তালিকা

তৈরি করা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৃত্যু, স্থানান্তর, বয়সজনিত পরিবর্তন বা অন্যান্য কারণে ভোটার তালিকায় সংশোধন করা প্রয়োজন হয়। এই প্রেক্ষাপটেই বিভিন্ন সময়ে বিশেষ যাচাই বা পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসআইআর প্রক্রিয়াও মূলত সেই ধরনের একটি প্রশাসনিক উদ্যোগ হিসেবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে তা অনেককেই বিস্মিত করেছে। দাবি করা হচ্ছে যে প্রায় এক কোটি চব্বিশ লক্ষ মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু সংখ্যক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন। কেউ মৃত্যুবরণ করেন, কেউ অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যার সম্ভাবনা অনেকের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। ফলে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে।

প্রশাসনিক অসঙ্গতি ও লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সির প্রশ্ন

এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনায় এসেছে তা হলো "লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি" নামক একটি ধারণা। এই ধারণার ভিত্তিতে বহু ভোটারের তথ্যকে সন্দেহের আওতায় আনা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নামের বানান, পারিবারিক সম্পর্কের তথ্য, ঠিকানার সামান্য অসঙ্গতি বা নথিপত্রের ছোটখাটো ভুলকে ভিত্তি করে অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের তথ্য পুনরায় যাচাইয়ের আওতায় আনা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে সাধারণ মানুষের কাছে এই ধারণা সম্পর্কে তেমন কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে বিস্তৃত ও সহজবোধ্য নির্দেশিকা আগে থেকে প্রচার করা হয়নি-এমন অভিযোগ অনেকের। ফলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় যখন অধিকাংশ মানুষ নিজেদের নাম তালিকায় দেখতে পান, তখন তারা নিশ্চিন্ত বোধ করেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে হঠাৎ করে "লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি" বিষয়টি সামনে আসায় বহু মানুষের ভোটাধিকার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। এমনকি অভিযোগ রয়েছে যে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম "বিচারাধীন" অবস্থায় রেখে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের নামের পাশে বিশেষ চিহ্ন যুক্ত করা হয়েছে, যা প্রশাসনিকভাবে যাচাইয়ের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে পৌঁছে না যাওয়ায় বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। এর ফলে 'বিবেচনাধীন' থাকা ভোটাররা জানেন না তারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কি না।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় 'বিবেচনাধীন' তালিকার রহস্য

চলমান এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকার পরিসংখ্যানে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বৈষম্যমূলক চিত্র ফুটে উঠেছে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত জেলাভিত্তিক তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে বর্তমানে ৬০ লক্ষের সামান্য বেশি ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয়টি হলো, এই বিশাল সংখ্যক নাম উঠে এসেছে মাত্র তিনটি জেলা থেকে, যার সবকটিই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এবং রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কেবল মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুর - এই তিনটি জেলাতেই বিবেচনাধীন ভোটারের সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬১৩। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিবেচনাধীন রয়েছে ১১ লক্ষ ১ হাজার ১৪৫, মালদহে ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৭, উত্তর দিনাজপুরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩৪১ জনের নাম। এই সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক বিন্যাস প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় সীমান্ত সংলগ্ন এবং সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলোতে 'বিবেচনাধীন' ভোটারের এই অস্বাভাবিক হার কেন? প্রশ্ন উঠছে, যথেষ্ট নথিগত প্রমাণ দিতে না পারা বা ভোটারের তথ্যের অসংগতি কি কেবল এই নির্দিষ্ট জেলাগুলোতেই সীমাবদ্ধ? নাকি এর পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা জনতাত্ত্বিক ছক কাজ করছে? যখন একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের ভোটাধিকারকে এভাবে অনিশ্চয়তার সুতোয় ঝুলিয়ে রাখা হয়, তখন তা গণতান্ত্রিক সাম্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। 'বিবেচনাধীন' থাকা মানে হলো, একজন নাগরিকের নাম তালিকায় থাকলেও তার ভোটাধিকার বর্তমানে চূড়ান্ত নয়। 'লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি'-র কারণে এই ভোটারদের তথ্য পুনরায় যাচাই করা হবে। ফলে সংখ্যালঘু মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই এই আতঙ্ক ও প্রশ্ন জাগছে, কেন তাদের পরিচয়কেই বারবার নথিপত্রের অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে?

এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো নাগরিকত্বের প্রশ্ন। সাম্প্রতিক দশকে দেশে নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি নিয়ে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব বর্তমান পরিস্থিতিতেও দেখা যাচ্ছে। ২০১৯-২০ সালে নাগরিকপঞ্জি প্রশ্নে দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার পর নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। যদিও প্রশাসনিকভাবে এসআইআর এবং এনআরসি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া, তবুও অনেকের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে।

কেন তাদের নাগরিক সত্তাকেই বারবার প্রশাসনিক সন্দেহের তালিকায় বন্দি রাখা হচ্ছে?

নির্দেশিকা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রশ্ন

যেকোনো বৃহৎ প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশিকা এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যখন সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিক অধিকার জড়িত থাকে, তখন জনগণের কাছে পরিষ্কারভাবে নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা প্রশাসনের দায়িত্ব। এসআইআর প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেকের অভিযোগ যে এই ধরনের সুস্পষ্ট নির্দেশিকা শুরু থেকেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশ জারি হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে প্রচারও করা হয়নি। কখনও কখনও হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছে অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠানোর কথাও শোনা গেছে। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের জন্ম দেয়। গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকগুলো দুর্বল হলে নাগরিকদের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হতে পারে।

নাগরিকত্ব বিতর্ক ও এনআরসি প্রসঙ্গ

এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলো নাগরিকত্বের প্রশ্ন। সাম্প্রতিক দশকে দেশে নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি নিয়ে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব বর্তমান পরিস্থিতিতেও দেখা যাচ্ছে। ২০১৯-২০ সালে নাগরিকপঞ্জি প্রশ্নে দেশজুড়ে ব্যাপক আন্দোলন ও প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছিল।সেই অভিজ্ঞতার পর নাগরিকত্ব যাচাইয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। যদিও প্রশাসনিকভাবে এসআইআর এবং এনআরসি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া, তবুও অনেকের মনে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ভবিষ্যতে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে। এই আশঙ্কা বাস্তব হোক বা না হোক, সমাজে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করেছে। গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের মধ্যে এই ধরনের উদ্বেগ দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান দায়িত্ব হলো অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা। সেই সঙ্গে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। এই কারণে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া এমনভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যাতে একদিকে যেমন জালিয়াতি বা অনিয়ম রোধ করা যায়, অন্যদিকে তেমনি প্রকৃত নাগরিকদের অধিকারও সুরক্ষিত থাকে। এই দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রশাসনিক দক্ষতার একটি বড় পরীক্ষা। যদি কোনো প্রক্রিয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন, তাহলে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া এবং মানুষের আস্থা পুনর্গঠন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। নাগরিক সমাজের প্রতিক্রিয়া ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বর্তমান পরিস্থিতিতে নাগরিক

সমাজের একটি অংশ এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ। এই কারণে বিভিন্ন নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রশ্নে আলোচনা, মতবিনিময় এবং সচেতনতা তৈরির চেষ্টা চলছে। এই প্রেক্ষাপটে কিছু নাগরিক একত্রিত হয়ে একটি মঞ্চ গঠন করেছেন, যার লক্ষ্য ভোটাধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিজেদের মত প্রকাশ করা। তাদের উদ্যোগে পদযাত্রা, দাবিপত্র পেশ এবং অন্যান্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে।বর্তমানে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন মানুষ এসে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করছেন। নাগরিক সমাজের এই ধরনের উদ্যোগ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

গণতন্ত্রে নাগরিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। নির্বাচন, জনমত, গণআলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণ নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। এই কারণেই নাগরিক অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে সচেতনতা তৈরি করা, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাধানের দাবি জানানো-এই সবই গণতান্ত্রিক চর্চার অংশ। একই সঙ্গে প্রশাসনের পক্ষেও নাগরিকদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়ে স্বচ্ছতা ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, ভোটাধিকার কেবল একটি প্রশাসনিক তালিকার বিষয় নয়; এটি গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ভোটার তালিকার নির্ভুলতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখা।এস আই আর প্রক্রিয়াকে ঘিরে যে বিতর্ক ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা গেলে নাগরিকদের আস্থা আরও দৃঢ় হবে এবং গণতান্ত্রিক কাঠামো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে জনগণের বিশ্বাস ও অংশগ্রহণের উপর। সেই কারণে ভোটাধিকার রক্ষা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের সকলের যৌথ দায়িত্ব।

ছোটগল্প

গোলকধাঁধা

রক্তিম ইসলাম

রেলমাঠে আজ ফাইনাল ফুটবল। আট দলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল গত সপ্তাহে। ওদিনই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল শেষ হয়েছে। দু'দল ফাইনালে উঠে আছে-গ্রে আর গ্রিন। গত রোববারের মতো আজও দিনটা সেই রোববার।

কখন থেকে যে লোকজন রেলমাঠ-মুখো হতে শুরু করেছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই। বহুদূর গ্রাম থেকে লোক আসছে; কেউ স্নান করেছে বা না করেই ছুটেছে। তখনো গরম ভাত হয়নি বলে বাসি পান্তা ভাত খেয়ে দু'পায়ে চটি গলিয়ে যাত্রা শুরু করেছে। খেলার মাঠের চারপাশ জুড়ে দুপুরের মধ্যেই লোক ভরে গেছে। মুশকিলে পড়েছে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা। যাই-যাই করে বিলম্ব করেছে, আর মাঠের কোথাও দাঁড়াবার জায়গা, বলা যায় তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রচুর মানুষ শেষ পর্যন্ত ঢুকতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে। গত সপ্তাহেও মাঠে প্রচুর দর্শক ছিল বটে, তবে এমন নয় যে খেলাটা দেখতে না পেয়ে ফেরত চলে গেছে।

আজও নাইন সাইড গেম, গতদিনও তাই ছিল। রেফারি ছিল, যথারীতি লাইনসম্যান ছিল দুজন। মাঠের বাইরে মাঝ-বরাবর সাইড লাইনের পাশে বাঁশ-খুঁটির তৈরি একটি প্যান্ডেল বাঁধা ছিল; ওখানেই বসে ছিল খেলার কর্মকর্তারা। আর ছিল একটা পুরনো ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে মাইক। মাইক্রোফোন হাতে ধরে চলছিল খেলার রিলে। একজন কিছু কথা বলার পর মাইক্রোফোন চলে যাচ্ছিল অন্য জনের হাতে। তার দু-তিন মিনিট বলার পর আবার দর্শকরা শুনতে পাচ্ছিল অন্যজনের কণ্ঠ।

কিন্তু রিলের মজার ব্যাপার-স্যাপার ছিল অন্যরকম। খেলোয়াড়দের নাম অন্যরকম, এমন সব নাম দর্শকরা কখনো শোনেনি। কোত্থেকে প্লেয়াররা যে এসেছে, তাও

কেউ জানে না। রিলেতে খেলোয়াড়দের নামের সঙ্গে জার্সির রং ও নম্বর বলা হচ্ছিল। কিন্তু দর্শকদের মাথা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। যে ছেলেটি হেড দিল, যার জার্সি নম্বর দর্শকরা দেখল সাত, রিলেতে উল্লেখ করা হচ্ছে নয়। বাংলাও না, ইংরেজিও না-প্লেয়ারদের নামের উচ্চারণ অজানা, তাই কার নাম কী তা দর্শকদের কাছে কোনো বিষয় ছিল না। কিন্তু জার্সির রংটাও তাদের চেনার কথা। সাদা জার্সির যে ছেলেটি হেড করে বল গোলে ঢোকালো, তার নাকি জার্সির রং নীল! বল নিয়ে দৌড়াচ্ছিল হলুদ জার্সির ছেলেটি, তার জার্সি নম্বর যেমন পাল্টে যাচ্ছিল, তেমনি জার্সির রংটাও পাল্টে যাচ্ছিল।

দর্শকের গোলকধাঁধা শুধু এইটুকুতে শেষ ছিল না। দর্শকরা দেখতে পাচ্ছিল দিব্যি বার উঁচিয়ে যে বলটি চলে গেল, রেফারি সেই বলটিতে গোলের হুইসেল দিল। সঙ্গে সঙ্গে বলটি সেন্টারে নিয়ে এল; সেন্টার থেকে দিব্যি খেলা শুরু। কিছুই ঢুকছিল না দর্শকদের মাথায়। দর্শক দেখল হঠাৎ লাইনসম্যান ফ্ল্যাগ ওঠাল, রেফারি বাঁশি দিলেন-থ্রো-র বাঁশি; অথচ লাইনের নিকটবর্তী দর্শকরা দিব্যি দেখছিল হলুদ রঙের খেলোয়াড়টি লাইনের ভেতর দিয়েই দ্রুত নিয়ে যাচ্ছিল বলটি।

একবার পেনাল্টি এরিয়ায় উপভোগ্য খেলাটি চলছিল, হঠাৎ লাইনসম্যানের পতাকা উঠল। রেফারি দৌড়ে ছুটে গেল লাইনসম্যানের কাছে, তারপর রেফারির পেনাল্টির নির্দেশ। পেনাল্টি থেকে সোজাসুজি বলটি গোলে ঢুকে গেল। কিন্তু লাইনসম্যানের নির্দেশে রেফারি কেন যে গোল নাকচ করল, তার সঠিক কারণ বিশ্লেষণে মাইক্রোফোন-ম্যান ব্যর্থ হলো; বরং মাইকে বেজে উঠল কিছুক্ষণের জন্য বৃন্দসংগীত।

গতদিন খেলা শেষ হবার পর মাঠে ঘটেনি কিছুই, কিন্তু দু-একদিন পর থেকে মাঠের বাইরে অনেক কিছুই ঘটে চলেছে। আর তা কেবল সেদিনের দর্শকদের মধ্যে। তর্কাতর্কি, ঠেলাঠেলি, এমনকি মারপিট পর্যন্ত গড়িয়েছে। যারা সেদিনের খেলায় দর্শক হিসেবে উপস্থিত হতে পারেনি, তারা ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়েছে। এবং এতখানি বিস্মিত যে মারপিট শুরু হলেও তারা ঠেকাতে পর্যন্ত যায়নি। বুঝতেই পারছে না কে বা কারা সত্যি বলছে, মিথ্যে বলছেই বা কারা! ফুটবল খেলায় এমন ঘটনা হয় কখনো, না হয়েছে কখনো!

দর্শকরা খেলার মাঠ থেকে ফিরে কিছুতেই তাদের বিস্ময় কাটাতে পারেনি। এত উল্টোপাল্টা ব্যাপার-স্যাপার কিছুতেই যেন তাদের মাথায় ঢুকছে না, বরং সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সাদা জার্সি প্লেয়ারের পায়ে বল অথচ রিলেতে বলা হচ্ছে নীল জার্সি! তাছাড়া রেফারি, লাইনসম্যান কি গাঁজা-টাজা খেয়ে মাঠে নেমেছিল?

এ সমস্ত আজেবাজে কথাবার্তা যখন সহ্যশক্তির বাইরে চলে যাচ্ছিল, তখন তাদের মধ্যে শুরু হলো প্রথমে হাতাহাতি, তারপর মারপিট। বিষয়টির চারপাশে এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে কমবেশি এই দুর্ঘটনা ঘটেনি। বকপোতা থেকে খবর এসেছে, ওখানে মারপিট করে ক'জনকে দানামা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। মগনা থেকে কমবেশি একই খবর এসেছে। সামুন্দা গ্রামে পেটাপিটি হয়েছে বাপ-ছেলের মধ্যে; বাড়ির লোকজন ঠেকাতে না এলে বুড়ো বাপ নাকি শেষ হয়ে যেত!

চলছিল ছিলামা রেলগেটের ঘটনা। হঠাৎ মারপিট শুরু, দেখার জন্য বেশ কিছু লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয় সেই গত রোববারের ফুটবল। এই দুজনের মধ্যে একজন খেলার মাঠে উপস্থিত ছিল, আর একজন মাঠেই ছিল না। এই দুজনের মধ্যে হাডুডু খেলার মতো রাস্তার ওপর ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। যখন ঠেঙাঠেঙি জমে উঠেছে, ঠিক তখনই রেলগেট পার হয়ে একটা দ্রুত গতির পুলিশ ভ্যান ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো রাইফেলধারী পুলিশ ভ্যান থেকে নামল। নেমে কিছু বক্তব্য শোনার আগেই দুজনকে দুদিক করে দিল। রাস্তার ওপরে এসব কী হচ্ছে এবং যা হচ্ছে-তা যেন তাদের জানা। দুজনকে হালকা করে ক'ঘা ব্যাটন কষিয়ে দিল। তারপর মজা দেখা লোকদের উদ্দেশ্যে একজন পুলিশ বলল, "সেদিনের খেলাধুলো নিয়ে যদি তোমাদের এলাকায় কোনো গন্ডগোল বেধে যায়, আমাদের খবর দেবে। যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা আমরা নেব-সোজা থানার লকারে ভরে দিয়ে পরদিন চালান করে দেব কোর্টে। খবরদার, মনে থাকে যেন কথাটা!"

পুলিশ ভ্যানটা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না, সাইলেন্সারের তীব্র শব্দে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ করে পুলিশের গাড়িটা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল-বিষয়টা তা নয়। এই যে থানা জুড়ে গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায় নিজেদের মধ্যে যে অশান্তি শুরু হয়েছে, সে খবর পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। উপরওয়ালাদের নির্দেশে লোকাল থানা যেন অবিলম্বে

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। গত পরশু বিকেল থেকে বিভিন্ন গ্রামের লোকজন এই পুলিশ ভ্যানটাকে টহল দিতে দেখেছে।

গত রোববারের খেলার বাকি অংশ অর্থাৎ শেষ অংশ তথা ফাইনালটা হবে আজ। আর তারই জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন দুপুরের আগেই মাঠ ভর্তি করে ফেলেছে। আসলে এই যে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন, ছেলে-বুড়ো রেলমাঠে ছুটে এসেছে-উদ্দেশ্য কি একটাই, ফুটবল ফাইনাল দেখা? না না, আদৌ তা নয়। তরুণ ছেলেরা খেলার মাঠে বেশি করে আসবে, খেলা দেখবে-এটাই তো ছিল দস্তুর। কিন্তু এই ফাইনাল দেখতে বয়স্করা বলা যায় একটাও আর ঘরে নেই, সবাই ছুটে এসেছে। গতদিন যারা খেলা দেখেছে, বয়স্কদের শুনিয়েছে সে খেলার অভিজ্ঞতা। তাদের জীবনে কি তারা এমন খেলা দেখেছে? নিয়মমতো থ্রো-র সিদ্ধান্ত লাইনসম্যানের; ফাউল, পেনাল্টি, গোল-সবই সিদ্ধান্ত নেবে রেফারি। কিন্তু তা তো নয়, কর্নারের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নিচ্ছে রেফারি!

গতদিনের খেলা যেমন হয়েছে, আজকেও খেলাটা সেই রকমই হবে-এটাই ছিল দর্শকদের প্রত্যাশা। গতদিন তো ফুটবল হয়নি, বলটা পায়ে-পায়ে ঘুরেছে বটে। আজকে খেলা যেমন মনোযোগ দিয়ে দেখবে, তেমনি ধাঁধায় পড়ে আজগুবি সিদ্ধান্তগুলো দর্শকরা অতিরিক্ত উপভোগ করবে।

কিন্তু আজ খেলা শুরু থেকেই যেন উলটপুরাণ। মাঠে কোথায় রেফারি, কোথায় পতাকা হাতে লাইনসম্যান, আর কোথায় তারা-সেই গতদিনের যারা কর্মকর্তা? আজ যে খেলাটা শুরু হলো, তা মাঝমাঠ থেকেই শুরু হলো না। শুরু হলো একটা সাইড থেকে। তবে রীতিমতো বল দেওয়া-নেওয়া করে এগোচ্ছে। কিন্তু একি! গ্রিন জার্সির খেলোয়াড় বল দিচ্ছে গ্রে জার্সির প্লেয়ারের পায়ে, এবং উল্টোটা হচ্ছে একই রকমে-ফাঁকায় দাঁড়ানো গ্রে জার্সির প্লেয়ার বল তুলে দিচ্ছে গ্রিন জার্সিকে।

একটু আগে তো একটা কর্নার হয়ে গেল। নিজেরাই নির্ণয় করল কর্নার। এরপর কিক থেকে নিখুঁত হেড; হেডের পর ক্রসবারের কোণ দিয়ে একটা দর্শনীয় গোল ঢুকে গেল ভেতরে। যেদিক থেকে কর্নারটা করা হয়েছে, সেদিকের কিছু মানুষ হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠল-গোল! গোল! কিন্তু মাঠের অন্য প্রান্ত থেকে হাততালির শব্দ শোনা গেল না। তাহলে দুদিকের দর্শকরা দুদিক থেকে দুরকম দেখল? না কি দুদিকের দর্শক দুরকম ধাঁধায় পড়ল!

এই তো ক'মিনিট আগে পেনাল্টি এরিয়ায় খেলাটা চলছিল। দেওয়া-নেওয়া করে খুব সুন্দর একটা গঠনমূলক খেলা। মনে হচ্ছিল যেকোনো মুহূর্তেই গোলকিপার বুঝতে না-বুঝতেই বল ঢুকে যাবে গোলে। তবে গোলপোস্টের পেছনে যে ঘেরা জালের ব্যবস্থা থাকে, সে ব্যবস্থা এখানে নেই। দূর থেকে দর্শকদের কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। গোলকধাঁধায় সব বিভ্রম হচ্ছে নাকি!

হ্যাঁ, দর্শক এবার কিন্তু ভুল দেখল না। পেনাল্টি কিকটা সেভের জন্য গোলকিপার বাম দিকে পজিশন নিল, কিন্তু বলটা গোলকিপারের ডান দিক দিয়ে ঢুকে গেল গোলে। সমস্ত মাঠের দর্শকদের তালিতে মুখরিত হলো চতুর্দিক। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তালি থেমে গেল। এবং এমনভাবে থেমে গেল যেন মুহূর্তেই মাঠে পিন পতনের শব্দ নেই। গোলের পর বলটা তখন ফ্রি কিকের পজিশনে বসানো হলো এবং গোল হলো কি হলো না বোঝার আগেই ফ্রি কিক পজিশন থেকে খেলা শুরু হয়ে গেল।

এটা কি সত্যি সত্যি কোনো ফুটবল খেলা না অন্য কিছু? যেন সব ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা! না, এ খেলা আর দেখা যায় না। অনর্থক সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। এখনই মাঠ ত্যাগ করে ফেরা উচিত, অন্তত সন্ধ্যার মধ্যে যদি ঘরে ফেরা যায়! হিড়িক শুরু হয়ে গেল মাঠ ছাড়ার। দলে দলে সবাই মাঠ ছাড়তে শুরু করল। পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে দর্শক খালি হয়ে গেল। তখনও সূর্য পশ্চিম দিগন্তে। খেলা শেষ পর্যন্ত কী হলো-মানে রেজাল্ট-তা দেখতে মনে হয় কোনো দর্শক আর অবশিষ্ট থাকল না।

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে থানায় খবর ছিল-গত রোববারের পর এ সপ্তাহের খেলায় ধস্তাধস্তি, মারপিট বাড়বে বই কমবে না। মারদাঙ্গা আরও চূড়ান্ত আকার ধারণ করতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে নির্দেশ আসার পর থানার আইসি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। বলা যায় প্রায় দুদিন তিনি পুলিশ ভ্যান রেডি রেখে মারদাঙ্গার খবর পেতে থানার চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি।

দু-দুটো দিন এভাবেই পার হলো, কিন্তু অবাক করার কথা-এরিয়ার কোথাও থেকেও কোনো খবর এল না। এমনকি হাটে-ঘাটে কিংবা সন্ধ্যার পর চায়ের দোকানে ফাইনাল খেলা প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে,

তেমন খবরও থানায় এল না। কিন্তু নিয়মমতো থানা থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে। আইসি ভুবন জোয়ারদার তাই আর থানায় বসে থাকলেন না; তিনি সরজমিনে তদন্ত করতে পুলিশ ভ্যানে তিনজন কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঘণ্টা তিনেক ঘোরাঘুরির পরেও কোথাও থেকেও কোনো নেগেটিভ রিপোর্ট পেলেন না। হঠাৎ মনে হলো রেলমাঠ, যেখানে খেলা হয়েছে-অর্থাৎ স্পট ইনকোয়ারি করা দরকার। তিনি ড্রাইভারকে রেলমাঠে নিয়ে যেতে বললেন পুলিশ ভ্যানটা। সমস্ত মাঠ উদোম হয়ে পড়ে আছে-শান্ত, নিঃশব্দ। তবে মাঠের ওপাশে ক'জন মাঝবয়সী লোক সুতো জড়ানো ডাংগুলি হাতে আর কিছু বাঁশ-বাখারি নিয়ে মাপামাপি করছিল।

কৌতূহলবশত মিস্টার জোয়ারদার পা বাড়ালেন সেদিকে, যেখানে মানুষজনগুলো দাঁড়িয়ে কিছু একটা মাপামাপি করছিল। হ্যাঁ, ওরা জমি মাপামাপি করছিল ক'জন-ফুটবল মাঠের জমি। ফুটবল মাঠের সাইডের যে জমি, তা বিভিন্ন মালিকের আওতাধীন ভেবে নিয়ে লোকগুলো প্রতি বছর একটু একটু করে মাঠের মাটি কেটে নিজের এখতিয়ারে নিয়ে চাষবাস করেছে। মাঠ ক্রমশ ছোট হয়েছে। তাছাড়া খেলার মাঠের জমি সরকারি, কোনো অংশ তো তাদের পাওয়ার কথা না। গত দু'রোববার খেলার পর তারা বুঝতে পেরেছে খেলার মাঠের জমি আরও বড় হলে ভালো হয়। এ পর্যন্ত খেলার মাঠ থেকে যে জমি নিজেদের আওতায় নিজেরা অধিকার করে নিয়েছে, সেই জমি খেলার মাঠকেই আবার ফিরিয়ে দিতে চায়। তাই ফিরিয়ে দেবে বলে সকাল থেকেই তারা মাপজোখ শুরু করেছে।

কথাগুলো শুনতে শুনতে মিস্টার জোয়ারদারের হাসি পেল। বললেন, "বাহ, বেশ তো!" তারপর বললেন, "সবাই যদি এভাবে সমাজের সমস্যাগুলো নিজেরা বন্দোবস্ত করে নেয়, তাহলে তো পুলিশদের চাকরিটা থাকবে না।" হাসতে হাসতে তিনি পা বাড়ালেন।

মাপজোখের মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, "আপনাদের চাকরিটা না থাকলে রাজাদের রাজ্যগুলো যে থাকবে না, তাই না?" মিস্টার জোয়ারদারের কানে কিছু শব্দ এলেও পুরো বাক্যটা ঠিক বুঝতে পারেননি হয়তো। জোয়ারদার একটু ঘাড় ঘোরালেন, তারপর চলতে শুরু করলেন যেদিকে তাঁর ভ্যান গাড়িটা দাঁড়িয়ে।

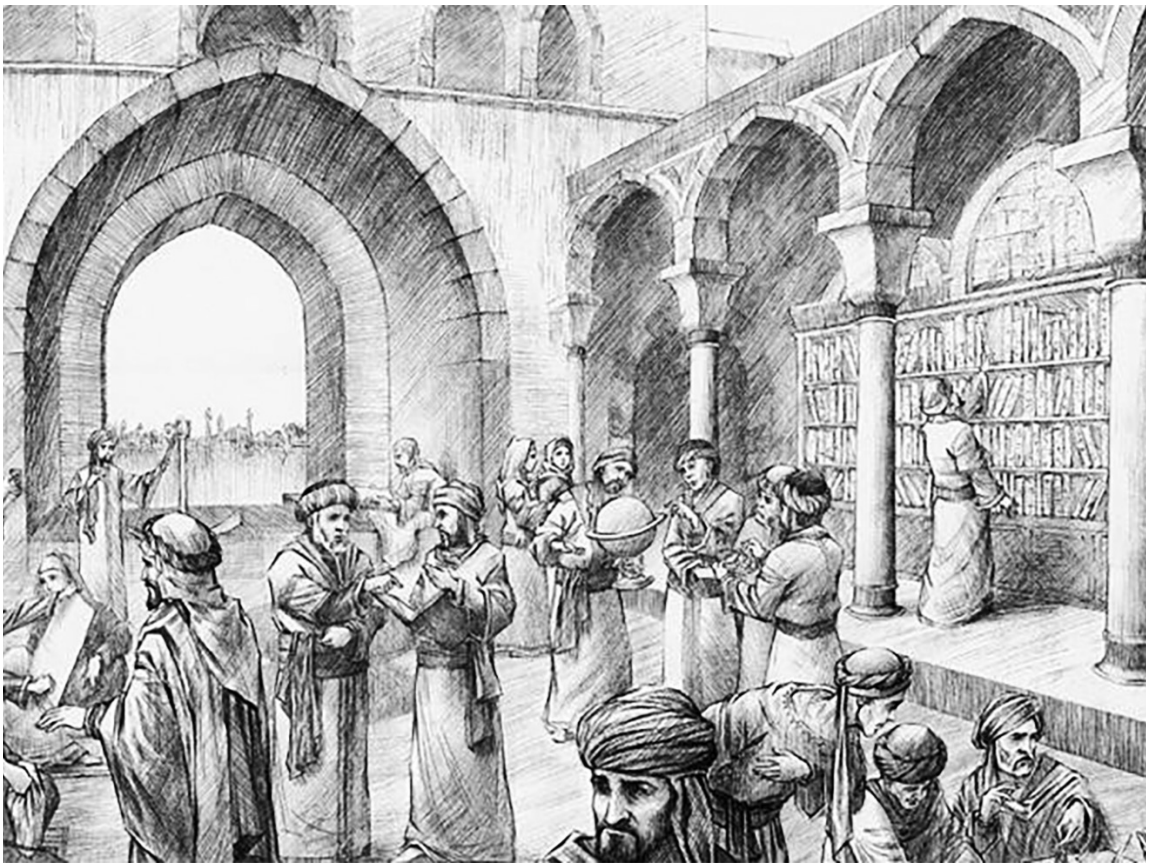

হারানো জাগরণের পুনরীক্ষণ: মুসলিম সভ্যতার বীরত্বগাথা

মহম্মদ কাজাফি

মুসলিম জ্ঞানদীপ্তির যুগ ছিল ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের একটি সময়কাল। মুসলিম সভ্যতা মহান সব অর্জন এবং এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তরাধিকার তৈরি করেছিল, যা বিশ্বকে বদলে দিয়েছিল। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে এশিয়ার এক বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত এই সভ্যতা মানব ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাবের এক অনন্য মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল। একে প্রায়শই 'ইসলামের স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে বলা বাহুল্য যে, এই ধারণাটি মূলত পশ্চিমা ঔপনিবেশিক মানসিকতার একটি ফসল, যা তৈরি হয়েছে 'ওরিয়েন্টালিজম' বা প্রাচ্যতত্ত্বের আদলে। এর লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যকে শাসন করা, পুনর্গঠন করা এবং এর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখা।

পাশ্চাত্যের দেশগুলো কেবল বস্তুগত মাপকাঠিতেই ইসলামি সভ্যতাকে বিচার করেছে। তারা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, স্থাপত্য এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বীকৃতি দিয়েছে; কিন্তু একই সাথে ইসলামি নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতার মতো মানবিক ভিত্তিগুলোকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। অথচ বাস্তবে, ইসলামের

প্রকৃত স্বর্ণযুগ ছিল মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরবর্তী খলিফাদের সময়কাল। সেই সময়েই ইহকাল ও পরকালের চূড়ান্ত সফলতা ও সুখের দিশারি হিসেবে ইসলামের প্রতিটি দিক সবচেয়ে নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মগুলো তার বস্তুগত প্রকাশকে যেভাবে বা যে নামেই সংজ্ঞায়িত করুক না কেন। তা সত্ত্বেও, এই নিবন্ধে আমরা মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সমৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করব। তবে একে সরাসরি "ইসলামের স্বর্ণযুগ" না বলে বরং স্রেফ একটি জাগরণ বা জ্ঞানদীপ্তির কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

সময়কাল এবং ব্যাপ্তি

পণ্ডিতগণ মোটামুটি একমত যে, মধ্যযুগের একটি দীর্ঘ সময় জুড়ে ইসলামি সমাজগুলো প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক জোয়ারের পেছনের কারণগুলো নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এর সময়কাল সম্পর্কে বেশ স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের উত্থান থেকে শুরু করে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা পর্যন্ত, প্রাথমিক ইসলামি বিশ্বে বৈজ্ঞানিক উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। তবে সাধারণভাবে একে একটি নির্দিষ্ট বছরের শুরু বা শেষ হিসেবে না দেখে বরং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আলোকপাত করেন, তবে এই জয়যাত্রা অন্তত সাড়ে সাত শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তাঁদের মতে, জ্ঞানদীপ্তির এই সময়কাল ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাগদাদে 'বাইতুল হিকমাহ' (জ্ঞানের গৃহ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা পূর্ণতা পায়; যা ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ নগরী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এই সময়কালকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত বর্ধিত করেন এবং কেউ কেউ এর মধ্যে মুঘল ও অটোমান (উসমানীয়) সাম্রাজ্যকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এই সময়সীমাকে অতিশয়য়ক্তি বলে মনে করেন এবং তাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক অর্জনের মূল সময়কাল হিসেবে আগের যুগগুলোতেই ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত দেন।

জ্ঞানদীপ্তির ইসলামি রাজবংশসমূহ

ইসলামি রেনেসাঁ বা জ্ঞানদীপ্তির এই জয়যাত্রায় বহু সংস্কৃতি ও সমাজের অবদান ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল পারস্যের জনগোষ্ঠী (বর্তমান ইরানের পূর্বসূরি)। আব্বাসীয় খিলাফত (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ - ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) প্রতিষ্ঠায় পারস্যের অধিবাসীরাই ছিল মূল শক্তি; যা ছিল সেই সময়ের অন্যতম সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষমণ্ডিত একটি সমাজ। উত্তর আফ্রিকার অনারব জনগোষ্ঠী 'বারবার'রা ইসলামের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঠিক তেমনি আব্বাসীয়দের সমসাময়িক ফাতিমীয় রাজবংশও (৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ) অনন্য অবদান রাখে। এছাড়া আইবেরীয় উপদ্বীপের (স্পেন ও পর্তুগাল) আন্দালুসীয় রাজবংশসমূহ (৭১১ খ্রিষ্টাব্দ - ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ) এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, আন্দালুসীয় রাজবংশগুলোর স্থাপত্যশৈলী আজও ইসলামি সভ্যতার অন্যতম স্মরণীয়, দীর্ঘস্থায়ী এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অবদান হিসেবে টিকে আছে। এই রাজবংশগুলোর প্রত্যেকের অবদানই ছিল অপরিসীম। আব্বাসীয় খিলাফত মূলত উমাইয়াদের সামরিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। তবে তারা রাজনৈতিকভাবে আরও পরিপক্ক ছিল এবং সামরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হওয়ার কারণে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পূর্ণ মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়েছিল।

বাইতুল হিকমাহ বা জ্ঞানের গৃহ

খলিফা আল-মামুন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করা 'বাইতুল হিকমাহ'-এর জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এই গাম্ভীর্যপূর্ণ সভা বা 'মজলিস' গণিত বা অধিবিদ্যার সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হতো। একে প্রায়শই একটি 'বিজ্ঞান একাডেমি' হিসেবে চিত্রিত করা হয়, যেখানে রাজকীয় উদার সহায়তায় বিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতগণ কোনো বাধা ছাড়াই মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যেতে পারতেন। বাইতুল হিকমাহ ছিল সেই বিপ্লবের সূচনাবিন্দু, যেখানে বিদ্যমান সমস্ত জ্ঞানকে একটি একক ব্যবস্থার অধীনে আনা হয়েছিল। সেই জ্ঞানকে প্রথমে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং পরবর্তীতে সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে এটি সমস্ত ইসলামি অঞ্চলের জন্য একটি অনুকরণীয় মডেলে পরিণত হয়, যা পরবর্তীকালে ইউরোপীয়রাও অনুসরণ করেছিল। দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো, ফেজ,

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউক্লিড, আর্কিমিডিস এবং অ্যাপোলোনিয়াসের মতো গ্রীক বিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সাথে আর্যভট্টের মতো ভারতীয় উৎসগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল। এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মিলন গুরুত্বপূর্ণ সব উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে, যেমন - দশমিক ভগ্নাংশসহ 'ডেসিমাল প্লেস-ভ্যালু' সিস্টেম এবং বীজগণিতের প্রথম সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন। উল্লেখ্য যে, 'অ্যালজেব্রা' নামটি বাগদাদের বাইতুল হিকমাহর পণ্ডিত আল-খাওয়ারিজমির কাজের নামানুসারে রাখা হয়েছে। এছাড়া জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রেও অনেক অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

সমরকন্দ, বুখারা, কর্ডোভা এবং গ্রানাডার মতো প্রধান শহরগুলো আইনশাস্ত্র, শিক্ষা, ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং স্থাপত্যবিদ্যার মতো বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে আরবি ভাষা পাণ্ডিত্য এবং ধর্মীয় উপাসনার প্রধান ভাষায় পরিণত হয়। প্রথম সহস্রাব্দের শেষ শতাব্দীগুলো থেকে আরবি ভাষা বিজ্ঞানের গবেষণার বাহন হয়ে ওঠে এবং তৎকালীন সময়ের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' (সর্বজনীন ভাষা) হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ: আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের পণ্ডিতগণ সাধারণত জ্ঞানের কেবল একটি নির্দিষ্ট শাখায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। এর বিপরীতে, মুসলিম সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিত্বই ছিলেন এক একজন 'পলিম্যাথ' বা বহুবিদ. এমন এক ব্যক্তি যাঁর জ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং গণিত থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার মতো বহুবিধ বিষয়ে বিস্তৃত ছিল।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে নবম ও দশম শতাব্দীতে ইউক্লিড, আর্কিমিডিস এবং অ্যাপোলোনিয়াসের মতো গ্রীক বিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সাথে আর্যভট্টের মতো ভারতীয় উৎসগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়েছিল। এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মিলন গুরুত্বপূর্ণ সব উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে, যেমন - দশমিক ভগ্নাংশসহ 'ডেসিমাল প্লেস-ভ্যালু' সিস্টেম এবং বীজগণিতের প্রথম সুশৃঙ্খল অধ্যয়ন। উল্লেখ্য যে, 'অ্যালজেব্রা' নামটি বাগদাদের বাইতুল হিকমাহর পণ্ডিত আল-খাওয়ারিজমির কাজের নামানুসারে রাখা হয়েছে। এছাড়া জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতির ক্ষেত্রেও অনেক অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

৭৭০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয়রা দশমিক পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং 'আরবীয়' সংখ্যা তৈরি করে। তারা 'শূন্য' (সিফর: শূন্য বা খালি) ব্যবহার শুরু করে, যা রোমান সংখ্যা পদ্ধতির তুলনায় গাণিতিক হিসাবকে অত্যন্ত সহজ করে তুলেছিল। আধুনিক 'অ্যালগরিদম' শব্দটি মূলত মহান গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমির নাম থেকেই এসেছে, যিনি ৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ভারতীয় গণনা পদ্ধতির ওপর তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন (যা লাতিন নাম Algorithmide numero Indorum হিসেবে পরিচিত)। এরপর তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাব আল-জবর" প্রকাশ করেন, যা তাঁকে "বীজগণিতের জনক" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এই বইটিতে তিনি দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান প্রদান করেন। এই আবিষ্কারগুলোর সরাসরি ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল। আল-খাওয়ারিজমি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন যে, জমির ক্ষেত্রফল পরিমাপ, নদীর গতিপথ নির্ধারণ, ভবনের নকশা তৈরি এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবহারিক প্রয়োজনে মানুষের এই ধারণাগুলো প্রয়োজন।

তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী খলিফা আল-মামুন 'বাইতুল হিকমাহ'-এর অধীনে একটি মানমন্দির (Observatory) নির্মাণ করেছিলেন।পরবর্তীতে ইসলামি জ্যোতির্বিদ্যা বাইজেন্টাইন, ইউরোপীয় এবং এমনকি চীনা জ্যোতির্বিদ্যার ওপরও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীরা আলোকবিজ্ঞান এবং বলবিদ্যার ক্ষেত্রেও অসামান্য উন্নতি করেছিলেন।

যেমন, ইবনে আল-হাইথাম (যিনি লাতিন ভাষায় আল-হাজেন নামে পরিচিত), আলোকবিজ্ঞানের ওপর একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন যা পরবর্তী প্রজন্মের পণ্ডিতদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি আলোর প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, মহাজাগতিক বস্তুগুলো নিজস্ব তাপ বিকিরণ করে।

মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে গ্ল্যামারাস বা আকর্ষণীয় অধ্যায়টি সম্ভবত তার চিকিৎসাবিজ্ঞান। আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগেও বিশ্বজুড়ে মেডিকেল স্কুলগুলোর পাঠ্যক্রমে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করত মুসলিম মনীষীদের আবিষ্কৃত চিকিৎসাপদ্ধতি ও কলাকৌশল। এই অঙ্গনের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন ইবনে সিনা, পশ্চিমা বিশ্ব যাঁকে 'আভিসেনা' নামে চেনে। রাজনৈতিক অস্থিরতার উত্তাল সময়েও মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে হাতেখড়ি। ১৬ বছর বয়সেই তিনি পুরোদস্তুর চিকিৎসক! তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি কীর্তি আজও বিস্ময় জাগায় - 'দ্য বুক অফ হিলিং' এবং 'দ্য কানুন অফ মেডিসিন'। প্রথমটি আসলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিশাল এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষ, যেখানে যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও সংগীতসহ নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্বাধিক খ্যাতিমান একক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

বৌদ্ধিক চর্চার এই মিছিলে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন আল-ফারাবি। জ্ঞানের নানা শাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ থাকলেও দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও সমাজতত্ত্বের আঙিনায় তিনি আজও অনন্য। মধ্যযুগের সেই আবহে আল-ফারাবিই ছিলেন প্রথম পণ্ডিত, যিনি সাহসিকতার সাথে দর্শনকে ধর্মতত্ত্বের প্রভাব থেকে আলাদা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি 'সর্বোচ্চ সত্তা' রয়েছে, যিনি সুসমন্বিত বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও বলেন, মানুষের মধ্যে যুক্তিবোধই একমাত্র অমর অংশ; তাই মানুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই যুক্তিবোধের বিকাশ সাধন। আল-ফারাবির রাজনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল 'সুখ' বা পরিতৃপ্তির ধারণা। যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা খুঁজে পায়। জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টেমোলজিতেও তিনি রেখে গেছেন অ্যারিস্টটলীয় ও নব্য-প্লেটোনীয় ঘরানার এক চমৎকার মিশেল। তাঁর 'কিতাব ইহসা আল-উলুম' কিংবা সংগীতের ওপর লেখা 'কিতাব আল-মুসিকা' আজও গবেষকদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিক আভিজাত্যের স্মারক।

মধ্যযুগীয় পশ্চিমা বিশ্বের কাছে যিনি 'আলগাজেল' নামে পরিচিত ছিলেন, সেই আবু হামিদ আল-গাজ্জালি ছিলেন একাধারে কিংবদন্তি ধর্মতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ, দার্শনিক এবং মরমী সাধক। সুন্নি ইসলামি চিন্তাধারায় ঐতিহাসিকরা তাঁকে ইসলামের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করেন। তাঁকে বলা হয় 'মুজাদ্দিদ' বা বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনকারী এবং 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের অকাট্য প্রমাণ। দর্শনের ইতিহাসে তাঁর কালজয়ী অবদান হলো 'তাহাফুত আল-ফালাসিফা' বা 'দার্শনিকদের অসংলগ্নতা'। এই গ্রন্থে তিনি সমকালীন দর্শনের বিশটি মৌলিক অবস্থানের কঠোর ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন, যা আজও দর্শনের ইতিহাসে এক বড় মোড় হিসেবে স্বীকৃত। যদিও ইবনে রুশদের মতো পরবর্তী সময়ের অনেক পণ্ডিত মনে করেন, দর্শনের নির্দিষ্ট কিছু ধারার প্রতি গাজ্জালির এই তীব্র বিরোধিতা ইসলামি বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে কিছুটা মন্থর করে দিয়েছিল। মন্টগোমারির (১৯৫৩) মতে, গাজ্জালি নব্য-প্লেটোনীয়বাদেরমূলে এতটাই সফলভাবে আঘাত হেনেছিলেন যে, ইসলামি সমাজে দর্শনশাস্ত্র আর আগের মতো ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল ইসলামের প্রথাগত রীতিনীতির সঙ্গে সুফিবাদের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটানো।

মনন আর কাব্যের জগতকেও এক সুতোয় গেঁথেছিলেন ওমর খৈয়াম। তিনি কেবল কালজয়ী কবিই ছিলেন না, ছিলেন এক অসামান্য গণিত প্রতিভা। তিনি মানবজীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা নিয়ে দার্শনিক ভাবনায় মগ্ন ছিলেন এবং উচ্ছ্বাস ও আনন্দময় জীবনের এক অনুরাগী হিসেবে পরিচিত। সংগীতের গাণিতিক কাঠামো নিয়ে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'শারহ-ই মুশকিল মিন কিতাব আল-মুসিকা' আজও সংগীততাত্ত্বিকদের কাছে এক বিস্ময়।

অন্যদিকে, মুসলিম পরিব্রাজক ও ভূগোলবিদদের হাত ধরে বিশ্ব-মানচিত্র পেয়েছিল নতুন মাত্রা। ইয়াকুত আল-হামাউই, আল-বিরুনি, ইবনে বতুতা কিংবা ইতিহাসের জনক ইবনে খালদুন তাঁদের বর্ণনায় উঠে এসেছিল সুদূর অঞ্চলের নিখুঁত ভৌগোলিক ও সামাজিক চালচিত্র। আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে 'বালখি

স্কুল অফ ম্যাপিং' প্রতিষ্ঠা করে মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যায় বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন আল-বালখি। আর ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর মানচিত্র এঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ মাহমুদ আল-কাশগারি।

পতনের মেঘ ও এক হারানো ঐতিহ্যের দীর্ঘশ্বাস

ক্রুসেডার এবং মঙ্গোলদের মুহুর্মুহু বহিঃআক্রমণ, রাজনৈতিক অব্যবস্থাপনা আর আর্থ-সামাজিক নানাবিধ সংকট সব মিলিয়ে একসময়ের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বহুত্ববাদী ইসলামি সভ্যতার পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল নেতা হালাকু খাঁ যখন বাগদাদ নগরী এবং জ্ঞানের আধার 'বাইতুল হিকমাহ' ধ্বংস করলেন, অনেক ঐতিহাসিক সেটাকেই এই সোনালি যুগের সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। তবে ইবনে খালদুনের কাজকে অনুসরণ করে আল-হাসানের মতো গবেষকরা মনে করেন, এই জ্ঞানদীপ্তির কাল ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড তখনও সচল ছিল। অন্যদিকে, কোনো কোনো পণ্ডিত তো পতনের এই তত্ত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেন; তাঁদের মতে মধ্যযুগে বিজ্ঞানের চাকা থামেনি, বরং এর আসল বিনাশ ঘটিয়েছে পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিকতাবাদ বা কলোনিয়ালিজম।

মুসলিম সভ্যতার সাফল্যের জয়তিলক হিসেবে ওপরে যা বর্ণিত হয়েছে, তা আসলে সমুদ্রের একবিন্দু জলমাত্র। ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়ের কুরি একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমরা আন্দালুসিয়া থেকে আমাদের হাতে থাকা মাত্র ত্রিশটি বইয়ের সাহায্যে পরমাণুকে ভেঙেছি। যদি হুলাগু খানের দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা লক্ষ লক্ষ বই পরীক্ষা করার সুযোগ পেতাম, তবে আজ আমরা গ্যালাক্সিগুলোর মাঝে ফুটবল খেলতাম।"

ইসলামের এই বিস্মৃত 'এনলাইটেনমেন্ট' বা জাগরণ ছিল এক আদ্যোপান্ত খাঁটি এবং বৈপ্লবিক অধ্যায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিটি স্তরেই এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সেটা ন্যায়বিচার ও সহনশীলতাই হোক কিংবা শিল্পকলা, মানবিকতা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, স্থাপত্য, আইনশাস্ত্র, দর্শন, গণিত বা চিকিৎসাবিজ্ঞান। মানব উন্নয়নের এই অতুলনীয় শতাব্দীগুলো সংঘটিত হয়েছিল এমন সময়ে, যখন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জাতিগুলো অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংঘাত এবং প্রাচীন ও বিদেশি সব কিছুর ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত ছিল। ইসলামের এই হারানো বৌদ্ধিক উত্তরাধিকার আজও আমাদের যাপিত জীবনের পরতে পরতে মিশে আছে; যদিও আজ সেই সব উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের জন্য ইসলামি পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীদের প্রাপ্য কৃতিত্বটুকু খুব সামান্যই দেওয়া হয়। তাই আজ সেই হারানো ঐতিহ্যের রোমন্থন করা প্রতিটি নিষ্ঠাবান মুসলিমের ওপর এক বড় দায়িত্ব বর্তায়। সেই দায়িত্ব হলো ইহকাল ও পরকাল - উভয় জগতের প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ করা, যা আবারও এক নতুন 'মুসলিম রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

১. আহমেদ এসা: স্টাডিজ ইন ইসলামিক সিভিলাইজেশন: দ্য মুসলিম কন্ট্রিবিউশন টু দ্য রেনেসাঁ

২. আহমেদ রেনিমা: দ্য ইসলামিক গোল্ডেন এজেস: এ স্টোরি অফ দ্য ট্রায়াম্ফ অফ দ্য ইসলামিক সিভিলাইজেশন

৩. এরিক চ্যানি: রিলিজিওন অ্যান্ড দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ ইসলামিক সায়েন্সেস

৪. ফ্র্যাঙ্ক গ্রিফেল: স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ফিলোসফি

৫. ফ্রেডরিক স্টার: দ্য লস্ট এনলাইটেনমেন্ট

৬. জর্জ সালিবা: ইসলামিক সায়েন্স অ্যান্ড দ্য মেকিং অফ দ্য ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ

৭. এম. এইচ. মরগান: লস্ট হিস্ট্রি: দ্য এনডুরিং লেগাসি অফ মুসলিম সায়েন্টিস্টস, থিঙ্কারস অ্যান্ড আর্টিস্টস

ফেরেশতার ডানা

সেখ আসাদ আলি

এখানে একটা আস্ত মাঠ ছিল। নাম সদাগরী মাঠ। এর পূব দিকে ছিল বাঁশগাছ বেয়ে ঝুপ করে সন্ধে নামা একটা সুন্দর গ্রাম-মাদারবাটি। গুটিকয় বাড়ি আয়মাদারি; বাকি সব খুদকস্তা চাষি।

মাদারবাটির পূবে ছিল এমনি আর-একটা মাঠ; মাঠের নামটি ছিল খুব মায়ামাখা-বাঁশিপুকুরের মাঠ! খুব বেশিজন জানে না কেন এমন নাম। একজন নবতিপর বৃদ্ধা শুধু বলতে পারে-এখানে রাতের বেলায় কিসের গায়েবি বাঁশি বাজত। কেন বাজত, কে বাজাত-এটা জানে শুধুমাত্র একজন, শাকিলা বিবি। সে ছাড়া কেউ জানে না। বলতে পারে না। জানার কথাও নয়।

শাকিলা বিবির যখন বিয়ে হয়, তখন তার বয়স মোটে পাঁচ। বিয়ে হয়ে এসেছিল মাদারবাটিতে। মাদারবাটির কাজীদের গুষ্টিতে। পূবের দুটো মাঠ পেরিয়ে একটা গাঁ আছে। নাম মিরজুপুর। ওই মিরজুপুরের মেয়ে সে।

মিরজুপুরের মিঞাদের তখন খুব নামডাক। বড় বড় আয়মাদার-মুকাদ্দিমের ঘরের লোকেরা মিরজুপুরের মিঞাদের ঘরের মেয়ের খোঁজ নিত আগে; বাড়ির ছেলে বিয়ের নওশা যোগ্য হলে।

মাদারবাটির কাজীদের মধ্যে আবার সাতইভায়ের গুষ্টির আলাদা নামডাক। গুষ্টির মধ্যে যেন আর-একটা গুষ্টি! খোদাবখশ কাজী ছিল সাতভাইয়ের গুষ্টির মুরুব্বি। তার কথায় গোটা কাজী-গুষ্টি চলত। যেন বেতাজ কাজী-উল-কাজাত! সেই খোদাবখশ কাজীর সেজলে ব্যাটার বউ হয়ে এসেছিল শাকিলা। স্বামীর নাম ছিল আনোয়ার। আনোয়ার কাজী।

খোদাবখশ কাজীর চার পিড়ি ঘাঁটলে জানা যায় ওরা কাজী খানদান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে খোদাবখশের দাদার সময়ে। তার আগে ওদের খানদান ছিল শেখ। শাইখুল শরিফাবাদী আল্লামা আব্দুল্লাহিল আজিজ নামে নামজাদা এক পূর্বপুরুষের নামে ওরা শেখ খানদান নামে পরিচিত ছিল। তার আগের কথা কেউ জানে না। অত পুরনো কথা অবশ্য জানার কথাও নয়।

আব্দুল্লাহিল আজিজ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে স্পষ্ট তিনি ছিলেন তৎকালীন শরিফাবাদের নামী মুহাদ্দিস। এ ছাড়া সবার পরিচিত মুফাসসিরে-কুরআন ছিলেন তিনি। পরবর্তী প্রজন্মের এতটা নামডাক না থাকলেও চেষ্টা করেছে ইলমের পথেই থাকতে। গুষ্টির ছেলেদের জন্য একটা মক্তব চলত। ফজর ওয়াক্তে গুষ্টির ছেলেদের তেলাওয়াত-কিরআতে যেন

চারপাশের গাছগাছালির ঘুম ভাঙত।

শাকিলা বিবি স্মৃতি থেকে তুলে আনে এসব। সেই সব মায়াভরা কিরআতের প্রাণবন্ত কম্পন যেন আজও তার কানে বাজে! ছোটবেলায় নিজের কানে শুনেছে যে! কোনো কোনো তালিবুল ইলমের কণ্ঠে এতই সুর- যেন মনে হতো খোদ জান্নাতি কোনো শিশু নিবিষ্ট মনে কিরআত-মগ্ন; ঊষাকালের আকাশ থেকে নেমে আসছে কণ্ঠস্বর।

শাকিলা এখনও যখন-তখন স্পষ্ট শুনতে পায়, 'আস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদ...'। এই আয়াত মনে পড়লে শাকিলার স্মৃতির আসমান-জমিন এখনও উথালপাথাল করে। এর কী মানে তা শাকিলাকে বলে দিয়েছিল তার স্বামী-আনোয়ার।

আনোয়ারের সঙ্গে যখন তার বিয়ে হয়, তখন সে ছিল তেরো বছরের বালক। ঠোঁটের ওপরে সবেমাত্র একটা হালকা রেখা। যেন জান্নাতি ফেরেশতা। তার তেলাওয়াত-কিরআতের কণ্ঠ ছিল শোনার মতো। এই একটা কারণেই তার দিকে শাকিলার আকর্ষণ ছিল- চাঁদ আর জোয়ারের মতো আকর্ষণ। জোয়ারের পানির মতো ফুলে ফুলে উঠত হৃদয়। যখন-তখন!

যদিও বিয়ের পর প্রথম কয় বছর আনোয়ার এবং শাকিলার মাঝে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব; মাঝে দাদির চোখ সচল থাকত সর্বক্ষণ। ইচ্ছে থাকলেও শাকিলা আনোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত পারত না। সে সুযোগও ছিল না। যদিও তার খুব ইচ্ছে হতো-একটু একসঙ্গে খেলতে, মনের কথা বলতে, গল্প করতে। এমন একটা সুন্দর বালকের সঙ্গে কে না ভাব করতে চাইবে?

শাকিলা চোখের সামনে দেখেছে একটা বালকের সুন্দর মিহি গলা হঠাৎ কীভাবে ভেঙে যায়। প্রথম প্রথম অদ্ভুত শুনতে লাগলেও ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠেই আবার কখন যেন মাদকতা গুলে যায়। তা শোনার জন্য বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে থাকে। কর্ণকুহর দিয়ে গেলাসে গেলাসে শরবতের মতো পান করতে ইচ্ছে হয়। তবুও যেন তৃষ্ণা মেটে না! শাকিলা খুব কাছ থেকে দেখেছে, কীভাবে ধীরে ধীরে একটা মোলায়েম বালক থেকে আনোয়ার একজন প্রাণবন্ত আরবি ঘোড়ার মতো যুবক হয়ে ওঠে। অফুরন্ত প্রাণশক্তি তখন তার।

আনোয়ার ছিল একেবারে অন্য ধাতের একজন মানুষ- এই বংশের মধ্যে। একেবারেই ব্যতিক্রমী। তার কোনো ঠিক-ঠিকানা ছিল না; কোথায় কখন থাকে, কোথায় যায়, কখন আসে। প্রায়ই বাড়িতে থাকত না। মাঝে মাঝেই না বলে-কয়ে উধাও হয়ে যেত। যখন-তখন। ফিরে এসে শাকিলাকে গল্প শোনাত কোথায় গিয়েছিল, রাতে কোথায় ছিল। সেসব রোমহর্ষক গল্প শোনাত। দূর-দূরান্তের গাঁয়ে-গঞ্জে যেত। মক্তবে উঠত। ফিরতে না পারলে কারও দলিজে থেকে যেত। প্রতিষ্ঠিত বনেদি বাড়ির সন্তান হয়েও তার ছিল মুসাফিরের জীবন; বেছে নিয়েছিল এমনই জীবন। শাকিলা এসব নিয়ে রাগারাগি করত।

এই নব্বই বছর বয়সেও শাকিলার মনে পড়ছে স্পষ্ট, একবার 'কোথায় গিয়েছিলেন' জিজ্ঞেস করতেই হেসে হেসে বলল, 'আলহামদু লিল্লাহি ফাতিরিস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি জাইলিল মালাইকাতি রুসুলান উলি আজনিহাতিম মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা; ইয়াজিদু ফিল খালকি মা ইয়াশা; ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির...'

এও স্পষ্ট মনে করতে পারে, শাকিলা স্বামীর মুখের পানে চেয়ে আছে। বুঝতে পারেনি কী বলছে। তা দেখে আনোয়ার মৃদু হাসে। এমন জান ঠান্ডা করা হাসি সে আর কারও দেখেনি। ধবধবে সাদা বকফুলের মতো দাঁত। এমন যুবক যার স্বামী, সে কি স্বামীর ওপরে রাগ করে থাকতে পারে নাকি! সারা জাহান তার কাছে মূল্যহীন। এক পাল্লায় স্বামী আরেক পাল্লায় বাকি জাহান! সে বিভোর হয়ে থাকে। এমন অবস্থায় অতীত-বর্তমান গুলিয়ে যায় তার। দূর অতীত মনে হয় এই তো কালকের, এই তো ওবেলার, এই তো দুই মিনিট আগের কথা। অথচ মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে দরিয়ার পানির মতো সময়!

বুকের ভিতরে সব সময় একটা ভয় জমা থাকে। মাঝে মাঝেই তার মনে হয়, 'এমন কপাল সইবে তো?' মুহূর্তে তার বুকের ভিতরে কথা জন্ম নেয়, 'কোনো একটা বদ হাওয়া লেগে পাখি উড়ে যাবে না তো?' নিজেকেই জিজ্ঞেস করে। এমন ভাবনা এলেই সঙ্গে সঙ্গে 'তওবা তওবা' বলে নাকে-কানে হাত দেয়।

তার চৈতন্য ফেরে যখন শুনতে পায়, 'কী দেখছ? এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, তিনি আসমান-জমিন তৈরি করেছেন। ফেরেশতাদের তৈরি করেছেন। তাঁর পয়গাম বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করেছেন; ডানা দিয়েছেন। যত খুশি। তিনিই সর্বশক্তিমান...'

এই আয়াতের অর্থ শুনে শাকিলার বুক কেঁপে ওঠে, 'এর মানে কী? কেন বললেন এমন কথা-যার মাথামুণ্ডু

নাই। ফেরেশতার ডানা থাকে, পাখিরও ডানা থাকে। তাহলে কি...'

বহু বছর তো হলো; তবুও এই আয়াত শুনলে এখনও তার বুক কেঁপে ওঠে। আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যায় ফেরেশতা। তার জন্য তাদের ডানা থাকে, যাতে দ্রুত যেতে পারে। তাহলে কি তার স্বামী ফেরেশতা? হতেও পারে; এমন সুন্দর লোক তার ভাগ্যেও লেখা ছিল! ডানা আছে? হতেও পারে...

শাকিলা ভুলে যেত আসল প্রশ্ন; অবাক হয়ে স্বামীর কথা শুনত। এত সুন্দর করে কথা বলতে-কুরআনের কথা বলতে কাউকে দেখেনি। জানাশোনার মধ্যে অন্তত কাউকে দেখেনি। প্রত্যেকটা শব্দে শব্দে যেন মায়া মাখা আছে। সহজ করেই বলে; কিন্তু কী অতল গভীর কথা-থই মেলে না!

মাগরিবের সময়। শাকিলার মোনাজাত শেষ হয়েছে কি হয়নি-ঠিক সেই সময়ে তার মনে পড়ে স্বামীর কথা। তিনি বলছেন, 'মালাইকা কী জানো? মালাইকা মানে ফেরেশতা। আল্লাহ তাঁদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সেই জন্য আল্লাহ তাঁদের ডানা দিয়েছেন।'

শাকিলার সামনে ভেসে ওঠে আনোয়ারের মুখ! মনের কোন অতল থেকে উঠে আসে। মুহূর্তে তা আবার মিলিয়েও যায়।

শাকিলার চোখের সামনে একটা ঘোড়া হাজির হয়েছে এখন! ধবধবে সাদা। ডানা আছে। খুব সুন্দর। ঘোড়াটার মুখের ওপরে হুবহু একটা মানুষের মুখ! যুবা পুরুষের মুখ। শাকিলা জানে এমন ঘোড়াকে বলে বোরাক; নবীজিকে সাত আসমানে নিয়ে গিয়েছিল-সবে-মেরাজের দিনে!

লাল-করবী ফুলের মতো রঞ্জিত বোরাকের রাঙা নাক। তৈলসিক্ত কালো বাবরী চুল-কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। রেশমের মতো হালকা দাড়ি; ময়ূর পুচ্ছের মতো চকচক করছে। যবের মতো গালের চামড়ার রঙ। পাতলা চামড়ার ভিতর থেকে প্রত্যেকটা টগবগে অনুভূতি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শাকিলা অবাক হয়ে দেখে, মুখটা তার স্বামী আনোয়ারের মুখের আদলে হুবহু!

শাকিলা নামাজ পাটি ছেড়ে উঠতে পারে না; ঠায় বসে থাকে। তার মনে পড়ে আরেকটা ঘোড়ার কথা-দুলদুল। কারবালার প্রান্তরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সারা শরীরে তির গেঁথে গেছে। সে কেঁদে ফেলে। হৃদয়ে বাষ্প জমতে শুরু করেছে। মনে পড়ে নবীজির আদরের নাতি ফাতিমা-তনয় ইমাম হুসাইনকে। ধুধু কারবালা প্রান্তরে নিথর দেহ পড়ে আছে তাঁর। শাকিলা সহজে মোনাজাত শেষ করতে পারে না। দুই হাতের তালু মুখমণ্ডল ঢেকে আছে।

শাকিলা বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ, আমার পরওয়ারদিগার, জালিমের জুলুম থেকে সারা জাহানকে তুমি মুক্ত করো। মজলুমদের পক্ষে যারা-তাদের দুলদুলকে তুমি রক্ষা করো-হে আসমান-জমিনের মালিক আল্লাহ, তুমি তো রহমানুর রহিম... তুমি আলেমুল গায়েব...'

মোনাজাত শেষ হয়েছে। হাত নেমে গেছে মুখমণ্ডল থেকে; কিন্তু দৃষ্টি অস্পষ্ট। দুই চোখে ঝরে পড়ছে পবিত্র ফুরাতের পানি-বয়েই চলেছে; কখন ফুরোবে সে জানে না।

এত পানি কোথায় ছিল এতদিন, কোন অতলে জমা ছিল সে জানে না! এই অবস্থায় তার বারবার মনে পড়ছে আনোয়ারের বিভিন্ন স্মৃতি! একটা শেষ হতে আর-একটা এসে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষঙ্গসহ হাজির হচ্ছে। আনোয়ার দেখা দিয়েছেন। তিনি শাকিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে তোমার?' শাকিলা নিরুত্তর। চলচ্ছক্তিহীন হয়ে বসে আছে। শাকিলা কোনো কথা বলছে না দেখে তিনিই বলতে শুরু করলেন, 'আচ্ছা বুঝেছি। রাগ? কোথায় ছিলাম এই ক'দিন? আরে শোনো, গিয়েছিলাম পূবের এক গাঁয়ে। অনেক দূরের এক গাঁয়ে। পয়গাম ছিল। পৌঁছে দিয়ে এলাম...'

শাকিলা ভিতরে ভিতরেই অস্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে, 'কিসের পয়গাম? কার পয়গাম?' শাকিলা স্পষ্ট শুনতে পায় আনোয়ার বলছেন, 'আল্লাহর পয়গাম...'

শাকিলা আনমনা হয়। বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে তার স্বামী আনোয়ার একজন ফেরেশতা। শাকিলা চলচ্ছবির মতো দেখে, আনোয়ার ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে! সাত আসমান ভেদ করে! অনেক ওপরে ওপরে। বোরাক হয়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড দুধসাদা ফেনার মতো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। চারধারে মেঘ আর মেঘ...

এতদিন তার এমনই বিশ্বাস ছিল। কখনও ভেবেছে তার স্বামী বালিহাঁসের মতো করে উড়ে যায় বহু দূরে, দূরের কোনো দেশে, দেশ-দেশান্তরে। কখনও ভেবেছে তার স্বামী সাদা পায়রার মতো। কখনও-বা মনে হতো

বোরাকের মতো। এবারে তা পোক্ত হয়। কিন্তু একটা জিনিস বুঝে উঠতে পারে না-পয়গামটা কিসের? কার? কার কাছ থেকে কার কাছে নিয়ে যায় তার স্বামী?

স্বামীকে জিজ্ঞেস করে ফেলে, 'আপনার সঙ্গে আল্লাহর দেখা হয়েছিল? তিনি তো গায়েবি। তাহলে তাঁর পয়গাম পেলেন কীভাবে?' আনোয়ার হাসে, 'না তা হয়নি; তবে একরকম দেখা হওয়ার মতোই...'।

শাকিলার জিজ্ঞাসাপূর্ণ চাহনি লক্ষ করে আবার বলা শুরু করেন, 'আল্লাহ বলেছেন, "এই আসমান-জমিনের মালিক আমি। আমিই সৃষ্টি করেছি সবকিছু। আমার সৃষ্টিকে দেখো তাহলেই আমার অস্তিত্ব দেখতে পাবে...'

শাকিলা বুঝতে পারে না এসব কথার মানে। আনোয়ার আবার বলে, 'আল্লাহর পয়গাম আছে পাক-কুরআনে। সেই পয়গাম হলো-তোমরা মজলুমের পক্ষে এবং জুলুমকারীর বিপক্ষে অবস্থান করো। এজন্যই তোমরা আমার পক্ষ থেকে নিযুক্ত...'

শাকিলা চুপ করে শোনে। আনোয়ারের মৃদু বাক্য এবং মায়াভরা চোখের ভিতরে জমে থাকা গভীর কথা বোঝার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না; তবুও শুনতে ভালো লাগে তার। আনোয়ার বোঝে-শাকিলা বুঝতে পারছে না। সামনে এগিয়ে আসে। নামাজের তাশাহুদ ভঙ্গিতে সামনে এসে বসে।

শাকিলা এবং আনোয়ার এখন মুখোমুখি। শাকিলার চোখের পাতা নেমে আসে। আনোয়ার খুব ধীরে তার ডান হাতের তালুকে স্থাপন করে শাকিলার কণ্ঠনালীর ঠিক নিচে; কলবের ওপরে। ঊর্ধ্ববক্ষে। তারপর আত্মগত নিচু স্বরে বলে, 'রব্বি জিদনি ইলমা... রব্বি জিদনি ইলমা... রব্বি জিদনি ইলমা... ও আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন... ও আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন... ও আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।' তারপর শাকিলার চোখের পাতায় ঠোঁট স্পর্শ করে। কপালেও আলতো করে ঠোঁট স্পর্শ করে। শাকিলা এই স্পর্শে বর্তমান ভুলে যায়, অতীত ভুলে যায়; শুধু একটা অনাদি-অনন্ত নিঃসীম শূন্যে ডানা মেলে স্থির হয়ে থাকে!

এরই মধ্যে কখন সন্ধে গড়িয়ে এশার সময় হয়ে গেছে খেয়াল নেই। নিজের মধ্যেই বিভোর ছিল এতক্ষণ। কখনও আত্মকথন, কখনও পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন, কখনও বা অতল থেকে উঠে আসা ভারী দীর্ঘশ্বাস তাকে পাথরের মতো করে রেখেছিল। খেয়াল হয় তখন-যখন বউমার গলা শুনতে পায়, 'আমু সেই বসেছেন মাগরিবে, আর এখন এশার ওয়াক্ত হয়ে গেল। কতবার বলেছি কিছু একটা দাঁতে কেটে তারপর তসবিহ করবেন। শেষে শরীর খারাপ করবে দেখবেন...'

শাকিলা সাড়া দেয়, 'আচ্ছা রে বাবা উঠছি। একবারেই উঠব নে। থাম, এশাটা পড়ে নিই তাহলে। উঠে একবারে ভাত খাব।' এশার নামাজে বার কয়েক নিয়ত ভুল হলো। বিতর নামাজ তিন রাকাত পেরিয়ে চার হয়ে গেল! মোনাজাত দেরি হচ্ছে দেখে বউমা গলা ঝাড়া দিতেই অগত্যা উঠতেই হলো।

রাতের খাওয়া তো নয়; মোটে দুই লোকমা গ্রাস। তার ওপর আবার আজ তার মন ভালো নেই। খাওয়ার মতো মন নেই, ইচ্ছে নেই। কোনো রকমে নেড়েচেড়ে উঠে পড়ে। শুতে চলে যায়।

অন্যদিন ঘুম চলে আসে সহজেই; কিন্তু আজকে আসছে না। বিছানার একপাশ থেকে আরেক পাশে গড়াগড়ি দেয়। এই খাটের গায়ে লেগে আছে বহু স্মৃতির প্রলেপ। সেই সব ভাবনা মাথার চারপাশে ঘুরছে এখন। শাকিলা মনে করতে পারছে, বাবাজান অনেক শখ করে এই বাঘপাঞ্জা-ময়ূরপঙ্খি খাটটা বানিয়ে দিয়েছিল। কালো জর্দা কাঠের।

খাটের ঘাড়িতে লেগে আছে আনোয়ারের চুলের সুগন্ধ-এখনও। শুধু শাকিলা টের পায়। শাকিলার নাক ঠিক টের পায়। এই ঘাড়িতে হেলান দিয়ে কোলবালিশ নিয়ে শাহী কায়দায় বসে বসে দুনিয়ার গল্প শোনাত শাকিলাকে। মাঝে মাঝে ছেলেমানুষের মতো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গল্প করত। সমস্ত আগল খুলে গল্প করত। ঠিক এখানেই বসে বসে একদিন বলেছিল, 'তুমি কি জানো আমি বাঁশি বাজাতে জানি?' শাকিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কীরকম! আপনি বাঁশি বাজাতে পারেন! আপনার বাঁশি কই?'

আনোয়ার খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। তার দাঁতগুলো দেখে মনে হয়েছিল-সবে মাড়ি ভেদ করে উঠে এসেছে-দুধদাঁতের মতো লাগছে দেখতে; এত সুন্দর! হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে শখের ছড়িটা নিয়ে এসে দেখিয়েছিল। এসব মনে পড়েছে এখন শাকিলার। স্পষ্ট দেখতে পায়, আনোয়ার তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হাতের ছড়িটা নিয়ে এসে তার হাতে তুলে দিয়ে বলে, 'এই হলো আমার বাঁশি...'

শাকিলা অবাক হয়ে দেখে-ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে

ছড়িটাকে। বুঝতে পারে না ছড়িটা কীভাবে বাঁশি হয়! হতেও পারে; সে নিজের মনে মনে বিশ্বাস করে তার স্বামীর একটা অলৌকিক মোজেজা আছে-যেমন মুসা নবীর ছিল। যদিও আনোয়ার জানে না শাকিলার এমন বিশ্বাসের কথা।

খাট থেকে তড়াক করে নেমে আনোয়ার অলৌকিক দেবশিশুর মতো দাঁড়িয়ে পড়ে নিমেষে। বাঁ পা সোজা এবং ডান পা বাঁ পায়ে পেঁচিয়ে দাঁড়ায়। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল বাঁ পায়ের ওপরে রেখে ছড়িটাকে এমনভাবে ঠোঁটের ওপরে ধরে দেখে মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। শাকিলা চোখ জুড়িয়ে দেখে তার স্বামীর এমন রূপ।

এমন মোহন-বিভঙ্গ মুক্ত হয়ে বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণ শাকিলার পাশে বসে গাল স্পর্শ করে বলে, 'এই দেখো, আমার রাধিকারতন-এই হলো বাঁশি। দেখো...'

শাকিলা দেখতে থাকে অবাক বিস্ময়ে। অবাক বিস্ময়ে দেখে তার স্বামীর এমন কাণ্ডকারখানা। দেখে, ছড়িতে লাগানো তামার আংটাগুলোকে আনোয়ার খুব দ্রুত খুলে নিচ্ছে একটা একটা করে; প্রত্যেকটা আংটা-ঢাকা স্থান উন্মুক্ত হলেই বেরিয়ে আসছে একটা একটা করে ছিদ্র। পরপর বেরিয়ে এল সাতটা ছিদ্র। শখের ছড়িটা নিমেষে পরিণত হলো মোহন বাঁশিতে! সত্যিই ছড়িটা আসলে বাঁশি!

এমন মুহূর্তে শাকিলা তার স্বভাববিরুদ্ধ প্রগলভতায় বলে, 'বাজিয়ে দেখান...' আনোয়ার আজ আরও দিলখোলা; কল্পতরু-যা চাইবে তাই দেবে-আজ এমন আগলখোলা হয়ে গেছে সে শাকিলার কাছে।

-'আচ্ছা শোনাব তোমাকে। আমি কেমন বাঁশি বাজাই তা তোমাকে শোনাতে না পারলে বাজিয়ে কী লাভ... আজই শোনাব তোমাকে... তবে ঠিক রাতদুপুরে; ঘরে বাজানো যাবে না। বাজাব ওই মাঠে।'

শাকিলার বুঝতে আর বাকি নেই। সব সময় মৃদু ভাবগম্ভীর-স্মিতমুখে থাকে বটে; তবে এক-একে দুই করে ফেলে সে। জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে এখুনি যখন রাতদুপুরে ঘরে এলেন ঠিক তার কিছু আগে যে বাঁশির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল তা কি আপনিই বাজাচ্ছিলেন! কী যে ভালো লাগছিল তা বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে... একবারে আলাদা রকমের সুর!'

আনোয়ার মৃদু মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসে। তৃপ্তি এজন্য যে তার বাঁশি বাজানো শাকিলার ভালো লেগেছে। এমন কোনো পুরুষ আছে নাকি এই দুনিয়ায় যে তার কোনো কাজ স্ত্রীর পছন্দ হয়েছে জানতে পারলে তৃপ্ত হয় না? আনোয়ারও এর ব্যতিক্রম নয়। আনোয়ারের তৃপ্ত মুখের মৃদু হাসি দেখে শাকিলা জিজ্ঞেস করে, 'কী বাজাচ্ছিলেন? পুরোটাই অন্যরকম!'

আনোয়ার আজ আত্মহারা। সব দোর খুলে গেছে আজ। সব বলে দেবে আজ। স্ত্রীর কাছে গোপন রাখবে না কিছুই-'বাঁশি দিয়ে কিরআত করছিলাম; বাঁশি দিয়ে কুরআনের আয়াত তুলেছি অনেক অনেক চেষ্টা করে-সেগুলোই বাজাই। বাজাচ্ছিলাম "ইন্না ফিরাউনা আলা ফিল আরদি ওয়া জাআলা আহলাহা শিয়াআন..."

শাকিলার গর্বে বুক ভরে যায়। এমন বাঁশি বাজানোর কথা কেউ কোনো দিন শুনেছে? আনোয়ার আবার বলতে শুরু করে, "আসলে এইটাই আল্লাহর পয়গাম। আর একটা সুবিধা হলো আমার বাঁশির আওয়াজ শুনলে-বাঁশিতে কুরআন কিরআত করলে সুরটা সম্পূর্ণ অচেনা অচেনা লাগে তো-তাই লোকে অবাক হয়। ভাবে গায়েবি আওয়াজ। রাতে শুনলে লোকের গা ছমছম করে... এই সুর শুনলে লোকেরা সেদিকের পথ এড়িয়ে যায়।"

আনোয়ারের আন্দাজ যে সঠিক তা শাকিলা নিশ্চিত জানে। বেশ কিছুদিন হলো বাইরে এই বাঁশির গায়েবি আওয়াজ নিয়ে লোকরা মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও নিজেদের ঘরের মধ্যে বেশ কথাবার্তা চলছে; খোদ আনোয়ারের বাড়িতেই কথাবার্তা হয় এই নিয়ে।

শাকিলা শুনছে। আনোয়ার বলছে, 'এই বাঁশি শিখেছিলাম কাকদ্বীপ সুন্দরবনের এক গ্রামে। আলহাজ কিফায়েতউল্লাহর দলিজে ছিলাম ক'দিন। সেখানেই। হাজি সাহেব আমাকে বলেছিলেন, তিনি বাঁশিতে কিরআত করতে দেখছিলেন ওখানের এক পাহাড়ি গাঁয়ের ঢালে এক মেষপালককে। তার সুর শুনলে মনে হয় স্বয়ং জিব্রাইল আসমান থেকে নেমে এসে কুরআন তেলাওয়াত করছেন! সেই চারণকে আমি দেখতে পাই।'

শাকিলা জানে না এর মধ্যে কখন আবার কাকদ্বীপ-সুন্দরবন গিয়েছিল আনোয়ার। আনোয়ার বলে চলেছে একনাগাড়ে, 'এই বাঁশিকে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম। ইনসানিয়তের কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। কাজেও দিয়েছিল খুব। গভীর রাত্রে বাঁশির শব্দে আমরা জড়ো হতাম। জড়ো হয়ে পয়গাম আদান-প্রদান করতাম

আমরা। আমাদের বুকে তখন ওই জালিম ফিরাউনের মতো লোকগুলোর ওপরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বাঁধভাঙা ক্রোধ-প্লাবনের পানিতে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ফিরাউনদের। ওরাই তো মানুষকে শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে; শোষণ করছে যত পারছে। আমরা শোষিত শ্রেণির পক্ষে-আল্লাহর পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি বাঁশির আওয়াজে। রাত্রিবেলায় পৌঁছে দিচ্ছি গোপন ডেরায়। বলছি ধৈর্য ধরতে; জয় নিশ্চিত।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের। আমরা রাত্রির অন্ধকারে আজরাইল হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছি ডানা মেলে।

একদিন বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে কুরআনের কিরআত করছি আর দ্রুত হাঁটছি-পৌঁছে দিতে হবে পয়গাম-সামনের আশ্বিনে হবে সব ফিরাউনের সলিল সমাধি; কিন্তু সেদিন আর বাঁশি কাজ করল না। ওরা বাঁশির খবর জেনে গিয়েছিল। হঠাৎ সামনে দেখি সাক্ষাৎ চারজন জালিমের চর।

তারা আমার কাঁধের ঝোলা কেড়ে নিল। ঝোলায় যা কিছু ছিল ঝেড়ে ফেলে দিল মাটিতে। মার্ক্স সাহেবের মজলুমের পক্ষে পয়গাম লেখা ইশতেহার দেখেই জালিমের এক দালাল বলল, 'শালা মজলুমের মুক্তি? লে মুক্তি... জীবনের শেষ মুক্তি'। কলবের ওপরে শিমারের মতো করে খঞ্জর হাতে চেপে বসে একজন। এই দেখো গলায় দাগ দাগ।'

শাকিলা বুঝে যায়। তার ভয় ভয় করে। বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে সাদা বিছানায় জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে কখন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বিছানা ফাঁকা। একটা ধবধবে সাদা বিড়াল এসে বসেছে কখন। ভারী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভেতর থেকে।

শব্দার্থঃ

১। খুদকস্তা= যে স্বহস্তে চাষ করে। ২। গায়েবী= অদৃশ্য। ৩। নও'শা= বিয়ের বর। ৪। মুহাদ্দিস= হাদিস বিশেষজ্ঞ। ৫। মুফাসশিরে-কুরআন=কুরানের ভাষ্যকার। ৬। কিরাত= আবৃত্তি করা। ৭। তালেবিল'ইল্ম= ছাত্র। ৮। দলিজ= বৈঠকখানা। ৯। শাকিলা= এই নামের অর্থ বাহ্যিক এবং আত্মিক দিক দিয়ে সুন্দর। ১০। আয়াত= শ্লোক। ১১। মুনাজাত= মুক্তি প্রার্থনা। ১২। মালাইকা= ফেরেশতা। ১৩। পয়গাম= বার্তা। ১৪। সবে-মিরাজ= ইসলামী বিশ্বাস মতে এই দিন হজরত মুহাম্মদের আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছেছিলেন। ১৫। আলেমুল গায়েব= অদৃশ্য/ আতিপ্রাকৃত সম্পর্কে যিনি জানেন। ১৬। ফুরাত= ইউফ্রেতিস। ইসলামী ঐতিহ্যে ফুরাত একটা পবিত্র নদী। ১৭। মজলুম= অত্যাচারিত। ১৮। তাশাহুদ ভঙ্গী= নামাজের সময়ে সামনে দুই হাঁটু রেখে দুই পায়ের পাতার ওপরে বসে থাকার ভঙ্গী। ১৯। কলব= হৃদয়। ইসলামী বিশ্বাসে এই কলব থেকে জ্ঞানের উদয় হয়। ২০। মাগরিব= সন্ধে। ২১। তসবিহ্= ইষ্ট নাম জপ করা। ২২। নিয়ত= সংকল্প। ২৩। বিতর নামাজ= বিজোড় নামাজ। ২৪। মোজেজা= অতিলৌকিক ক্ষমতা। ২৫। আলহাজ্ব= যিনি হজ করেছেন। ২৬। জিব্রাইল= ইসলামী বিস্বাসে ইনি খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাঞ্জেল; এঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ কোরান পাঠিয়েছিলেন। ২৭। ফিরাউন= মিসরীয় ফ্যারাও; কোরান মতে ইনি যারপরনাই অত্যাচারী ছিলেন। তার মৃত্যু হয়েছিল নীল নদের পানিতে ডুবে। ২৮। সীমার= ইমাম হুসেইনের কণ্ঠনালী কেটে যে লোকটা তাঁকে হত্যা করেছিল তার নাম ছিল সীমার।

কাশ্মীরের সংস্কৃতি
অনিন্দ্য আনন্দের সম্মিলন

সীমান্ত আকরাম

কাশ্মীরের সংস্কৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী কাশ্মীরি জনগণের ভাষা, সাহিত্য, রন্ধনশৈলী, স্থাপত্য, ঐতিহ্য এবং ইতিহাস নিয়ে গঠিত। একসময় কাশ্মীরের সংস্কৃতি পারস্যের পাশাপাশি মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কাশ্মীরি সংস্কৃতি হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধ এবং পরবর্তীতে ইসলাম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। ইসলাম কাশ্মীরের প্রধান ধর্ম। ২০১৪ সালের হিসাবে, এই অঞ্চলের জনসংখ্যার ৯৭.১৬% মুসলিম। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মধ্য এশিয়া এবং পারস্য থেকে আগত মুসলিম সুফি প্রচারক মীর সাঈদ আলি শাহ হামদানির আগমনের সাথে সাথে এই অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটে। কাশ্মীরি মুসলমানদের বেশির ভাগই সুন্নি মুসলমান এবং শিয়ারা মুসলিম জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও কম। তারা নিজেদের মাতৃভাষাকে 'কোশুর' বলে উল্লেখ করে। কাশ্মীরে মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে- আধা-যাযাবর গোপালক এবং রাখাল, যারা গুজ্জার এবং বাকারওয়াল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

ভারত নাট্যশাস্ত্র, যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৃত্য, সঙ্গীত এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করে। যা শিল্পকলার একটি প্রাচীন বিশ্বকোষীয় গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখযোগ্য, এটির উৎপত্তি কাশ্মীরে। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখক পতঞ্জলি কাশ্মীরে যোগব্যায়ামের উপর তার সংকলন রচনা করেছিলেন। পঞ্চতন্ত্রের উদ্ভবও এই অঞ্চলেই বলে কথিত আছে। যে সময়ে পালি ছিল ভারতের বাকি অংশে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাথমিক ভাষা। কাশ্মীরে উৎপাদিত সব বৌদ্ধ সাহিত্য ছিল সংস্কৃত। কাশ্মীরি নারীরা সমাজে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কারণ বিলহানা উল্লেখ করেছে যে, কাশ্মীরি নারীরা সংস্কৃত এবং পালি উভয় ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। কামসূত্রের পর দ্বিতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ কোষশাস্ত্র যৌনবিজ্ঞানের উপর একটি রচনা যা কাশ্মীরে বিকশিত হয়েছিল। কাশ্মীরে উদ্ভূত প্রধান গ্রন্থগুলোর আরো কিছু উদাহরণ হলো - বিজ্ঞান ভৈরব তন্ত্র, যোগসূত্র, স্পন্দ কারিকা, তন্ত্র লোক এবং পর-ত্রিশিকা-বিবরণ। 'কোশুর' কাশ্মীরের প্রধান ভাষা। প্রতিবেশী পাকিস্তানি ভূখণ্ড আজাদ কাশ্মীরের কিছু অংশেও এই ভাষাভাষী রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি ভাষাগুলো হলো-

কাশ্মীরের বিখ্যাত উৎসবগুলি কাশ্মীরের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। প্রতিটি জনপদের প্রথা, ঐতিহ্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ, যা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। লোহরির সময় ঢোলের স্পন্দিত বাজনা, শীতের সমাপ্তি চিহ্নিত করে আগুনের আভা, ঈদ ও নওরোজে প্রাণবন্ত শোভাযাত্রাগুলো নিছক উৎসব নয় বরং ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। এই উৎসবগুলো যেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা জীবনের আনন্দ উদযাপনে একত্রিত হয়, যা জম্মু ও কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উন্মোচিত হয়।

কোশুর, ডোগরি, হিন্দি, উর্দু এবং ইংরেজি। কোশুর কাশ্মীরি রাজ্যের একটি আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃত এবং ভারতের ২২টি তফসিলি ভাষার মধ্যেও এ ভাষার স্থান রয়েছে। কাশ্মীরি ভাষা ঐতিহ্যগতভাবে শারদা লিপিতে লেখা হতো, তবে বর্তমানে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত এটি তেমন প্রচলিত নয়। বর্তমানে এটি ফারসি-আরবি এবং দেবনাগরী লিপিতে লেখা হয়। পার্সো-আরবি লিপি জম্মু ও কাশ্মীর সরকার এবং জম্মু ও কাশ্মীর শিল্প, সংস্কৃতি ও ভাষা একাডেমি কর্তৃক কাশ্মীরি ভাষার সরকারি লিপি হিসাবে স্বীকৃত। আজকাল পার্সো-আরবি লিপি কাশ্মীরি মুসলমানদের সাথে যুক্ত হয়েছে, অন্যদিকে দেবনাগরী লিপি কাশ্মীরি হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত রয়েছে।

কাশ্মীরের সঙ্গীত ও নৃত্য

কাশ্মীরের সঙ্গীত এবং নৃত্য কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক কাঠামোতে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। চক্রী এবং সুফিয়ানা কালামের মতো ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের ফর্মগুলি উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হয়, যখন রউফ এবং হাফিজা নৃত্যের মতো লোকনৃত্যগুলো প্রাণবন্ত হয়ে অনুরণিত হয়। ভারত নাট্যশাস্ত্র শিল্পকলার একটি প্রাচীন বিশ্বকোষীয় গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখযোগ্য যা ভারতে নৃত্য, সঙ্গীত এবং সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে প্রভাবিত করেছে, এটির উৎপত্তি কাশ্মীরে। কাশ্মীরি সঙ্গীত প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- চাকরি, হেনজা, রউফ বা ওয়ানওন, লাদিশাহ, সুফিয়ানা কালাম (কাশ্মীরি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত)। কাশ্মীরের নৃত্য হলো এই অঞ্চলের প্রাণবন্ত সংস্কৃতির একটি অন্যতম উপাদান। কাশ্মীরের নৃত্যের ফর্মগুলো, দলবদ্ধভাবে পরিবেশিত, একতা, সম্প্রীতি এবং এই অঞ্চলের উৎসবের প্রতীক। জম্মু ও কাশ্মীরে নৃত্য শুধুমাত্র ছন্দময় গতিবিধি নয়; এটি এমন একটি ভাষা যা অতীতের গল্প এবং ভবিষ্যতের জন্য আকাঙ্ক্ষাকে যোগ করে। নৃত্যগুলো এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং ঐতিহ্যকে তুলে আনে, যা এর মনোমুগ্ধকর আকর্ষণকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের অভিজ্ঞ শিল্পী ও শিল্প প্রেমীরা সেখানকার সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেখানে বসবাসরত নতুন প্রজন্মকে তারা পল্লী থিয়েটারে নানা প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছে জি নিউজ। জানা যায়, থিয়েটারে সবার আগ্রহ ফেরাতে এবং কাশ্মীরের সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিতের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

কাশ্মীরের উৎসব

কাশ্মীরের বিখ্যাত উৎসবগুলি কাশ্মীরের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে। প্রতিটি জনপদের প্রথা, ঐতিহ্য এবং আচার-অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ, যা এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। লোহরির সময় ঢোলের স্পন্দিত বাজনা, শীতের সমাপ্তি চিহ্নিত করে আগুনের আভা, ঈদ ও নওরোজে প্রাণবন্ত শোভাযাত্রাগুলো নিছক উৎসব নয় বরং ভ্রাতৃত্ব ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। এই উৎসবগুলো যেখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা জীবনের আনন্দ উদযাপনে একত্রিত হয়, যা জম্মু ও কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উন্মোচিত হয়। এখানে বৈশাখী অনেক ধুমধাম করে পালিত হয়। ফসল কাটার ঋতু এই অঞ্চলের কৃষিকাজকে আচ্ছন্ন করে। এসব উৎসবগুলো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে। কাশ্মীরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

অনুভব করতে হলে আপনাকে এই উৎসবগুলোর সাথে পরিচিত হতে হবে। লাদাখে হেমিস ফেস্টিভ্যাল, শ্রীনগরে টিউলিপ উৎসব, জম্মুতে লোহরি উদযাপন, জম্মু ও কাশ্মিরজুড়ে ঈদ উদযাপন, সাম্প্রদায়িক উৎসব, পাবলিক মিছিল, ঐতিহ্যবাহী নাচ, লোক সঙ্গীত পরিবেশনা, জাফরান উৎসব ইত্যাদি। কাশ্মীরি মুসলমানদের প্রাথমিক উৎসবের মধ্যে রয়েছে - ঈদুল-আজহা, ঈদুল ফিতর, শবেবরাত, শবেমেরাজ, ঈদে মিলাদুন্নবী, নওরোজ। আর হিন্দুদের উৎসবের মধ্যে রয়েছে - হেরাথ (শিবরাত্রি), খেচমাভাস, নবরেহ, জায়েথ আথম, টিকি সোরাম, পান, গাদ বাত ইত্যাদি।

কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী পোশাক

কাশ্মীরের সমৃদ্ধ পোশাক কাশ্মীরের ঐতিহ্যকে বহন করে। নান্দনিক নকশা ও দৃষ্টিনন্দন কারুকাজখচিত ঐতিহ্যবাহী পোশাক এই অঞ্চলের উত্তরাধিকারকে প্রতিফলিত করে। ফেরানের উষ্ণতা, পশমিনা শালের কমনীয়তা এবং কুর্তার সূক্ষ্ম সূচিকর্ম সবই একটি প্রাণবন্ত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী পোশাক এই অঞ্চলের নান্দনিক সংবেদনশীলতা এবং গভীর-মূল সাংস্কৃতিক আদর্শকে চিত্রিত করে। কাশ্মীরি পোশাক ঐতিহ্যের সাথে আধুনিকতা, সরলতা এবং মহিমার একটি নিখুঁত মিশ্রণ। কাশ্মীরীদের রাজকীয় আভিজাত্য প্রকাশ পায় তাদের পোশাকে। পুরুষেরা এক জাতীয় লম্বা কুর্তা পরিধান করে আর মহিলারা কারুকাজখচিত লম্বা জামা পরিধান করে থাকে, যা অনেকটাই আরবীয় ঢঙের।

কাশ্মীরি শাল

কাশ্মীরকে ভুবনজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে কাশ্মীরি শাল। শাহতুশ আর পশমিনা নামে এগুলো পুরো বিশ্বের মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল। উষ্ণতা, হালকা ওজন এবং বিশিষ্ট নকশার জন্য এর ব্যবসা ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উচ্চবিত্তের চমকদার পোশাক হিসেবে এর প্রকাশ ঘটে এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল ও ইরানি সম্রাটদের ব্যক্তিগত এবং দরবারের সদস্যদের খিলাত প্রদানপূর্বক সম্মানিত করতে এটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটি ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে পৌঁছে এবং রাণী ভিক্টোরিয়া ও মহারাণী জোসেফিনের বিলাসিতার বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবে বিশ্বব্যাপী এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীর অঞ্চলে শালকলা অর্থাৎ যাকে আমরা শালের বুনন কৌশল বলতে পারি তার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। মহাভারতে বর্ণিত আছে, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের অভিমত নিয়ে কৌরবদের কাছে গিয়েছিলেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাকে অন্য উপঢৌকনের সাথে পার্বত্য প্রদেশে বুনন হওয়া এক ধরনের শাল উপহারস্বরূপ দিতে চেয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায়, এ শাল পশমিনা শালকে নির্দেশ করে।

কাশ্মীরি টুপি :

কাশ্মীরের জনগণের ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী টুপিটি স্থানীয় ভাষায় 'কারাকুল' নামে পরিচিত। কারাকুল শব্দটি এসেছে ভেড়ার 'কারাকুল' জাত থেকে। যার আদি উৎপত্তি মধ্য বা পশ্চিম এশিয়ায়। নাম থেকেই বোঝা যায়, এই ক্যাপটি ভেড়ার উল থেকে তৈরি করা হয়েছে। কারাকুল ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি এই টুপিটি কাশ্মীরে খুবই জনপ্রিয়।

হস্ত ও কারুশিল্প

শৈল্পিক সৃজনশীলতা জম্মু ও কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক নীতির প্রাণ, যা মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভা এবং সৃজনশীলতাকে প্রতিফলিত করে। বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত পশমিনা শালসহ জম্মু ও কাশ্মীরের হস্তশিল্পগুলি দক্ষ কারিগরদের সুনাম বহন করে। তারা যারা এ সব কাজে তাদের হৃদয় ও আত্মা ঢেলে দেয়। কাঠের খোদাই, পেপিয়ার-মাশে প্রত্নবস্তু এবং জটিলভাবে বোনা কার্পেটগুলো এই অঞ্চলের নান্দনিক শিল্পকর্মের প্রকাশ ঘটায়। কাশ্মীরের প্রতি সৌন্দর্যপ্রেমীদের মুগ্ধতার কোনো শেষ নেই। অঞ্চলটিতে ঐতিহ্যবাহী ও লাজবাব বহু হস্তশিল্পের সমাহার রয়েছে। রঙ-বেরঙের সাঙপাথর, সেসব পাথরের ওপর করা বিচিত্র অলঙ্করণ, গালিচা, কম্বল, আখরোট কাঠের কাজ, শাহতুশ ও পশমিনা শাল, পাপিয়ার-মাশে প্রভৃতি এর উল্লেখযোগ্য হস্তশিল্প। এগুলোর প্রতিটি কাশ্মীরিদের ইতিহাসের মতোই লোহুর রঙে রঞ্জিত এবং দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত। বুনন কৌশল, সৌন্দর্য, প্রকরণ ও রঙের জন্য এগুলোর মধ্যে শাহতুশ ও পশমিনা শাল বিশ্বজুড়ে কদর পেয়েছে। মেটালওয়্যার, সূক্ষ্ম যন্ত্র, খেলার সামগ্রী, আসবাবপত্র, ম্যাচ, রজন এবং টারপেনটাইন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধান উৎপাদনকারী, যেখানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বেশির ভাগ উৎপাদন কার্যক্রম শ্রীনগরে অবস্থিত। স্থানীয় রেশম, তুলা এবং উলের তাঁত বয়নসহ গ্রামীণ কারুশিল্প থেকে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে। এই ধরনের শিল্প - একসাথে রূপালী কাজ, তামার কাজ এবং গহনা

কাশ্মীরে রন্ধনশৈলীতে নানান বৈচিত্র্য রয়েছে। উৎসবের সময় তৈরি মিষ্টি শুফতার স্বাদ উষ্ণ স্মৃতির মতো লেগে থাকে। তবে ভাত কাশ্মীরিদের প্রধান খাদ্য এবং প্রাচীনকাল থেকেই তাই হয়ে আসছে। ভাতের সাথে গোশত হলো কাশ্মীরে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও, বেশির ভাগ কাশ্মিরি হিন্দুরা মাংসাহারী। কাশ্মীরি পানীয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নুন চা বা শির চা এবং কাহওয়া বা কেহেউ। কাশ্মীর উপত্যকা বেকারি ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। বেকাররা তিল এবং পোস্ত বীজের সাথে সোনালি বাদামি ক্রাস্টসহ বিভিন্ন ধরনের রুটি বিক্রি করে।

তৈরি ইত্যাদি প্রথমে রাজদরবারের উপস্থিতি এবং পরে পর্যটকদের আকর্ষণ দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিল। কাশ্মীরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, শিল্প ও হস্তশিল্পের প্রদর্শনী 'বিতস্তা-দ্য ফেস্টিভ্যাল অফ কাশ্মীর'-এর প্রশংসার দাবিদার। ২০২৩ সালে কাশ্মীরের সমৃদ্ধ শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, হস্তশিল্প ও রন্ধনশৈলী তুলে ধরার লক্ষ্যে বিতস্তা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

কাশ্মীরের খাবার ও রন্ধনশৈলী

কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী রন্ধনশৈলী কাশ্মীরের সংস্কৃতিকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে তোলে। বিখ্যাত কিছু খাবারের বৈচিত্র্য তুলে ধরছি-

ওয়াজওয়ান : রাজকীয় একটি ভোজ যা এই অঞ্চলের রাজকীয় অতীতের জানান দেয়। এর জটিল প্রস্তুতি এবং নান্দনিক উপস্থাপনার রন্ধনশৈলী ঐতিহ্যের মতোই একটি শিল্প ফর্ম।

রোগ্যান জোশ : ভারতে মুঘল শাসকেরা আসার পর রোগ্যান জোশের সঙ্গে পরিচিত হয় কাশ্মীরবাসী। সাধারণত মুরগির গোশত দিয়ে এটি তৈরি হয়। তবে অনেকে গরু বা খাসির গোশত দিয়েও এটি তৈরি করতে পারেন। বাদামি পেঁয়াজ ও অন্যান্য মসলার সমন্বয়ে তৈরি করা হয়।

মোদুর পোলুভ : কাশ্মীরের মিষ্টিজাতীয় খাবারগুলোর মধ্যে মোদুর পোলুভ অন্যতম জনপ্রিয়। সেখানকার এক ধরনের বিশেষ চাল দিয়ে তৈরি হয় মসলাদার খাবারটি। দারুচিনি, জাফরান, দুধ ও ঘি দিয়ে তৈরি খাবারটি খেতে সুস্বাদু।

ম্যাটসগ্যান্ড : গরু বা খাসির গোশত দিয়ে তৈরি হয় ম্যাটসগ্যান্ড। এটি আসলে গোশতের বল। ঝালজাতীয় খাবার হিসেবে অনেকের পছন্দের তালিকায় এর নাম রয়েছে।

ইয়াকনি : কাশ্মীরের আরেকটি বিচিত্র খাবারের নাম ইয়াকনি। দেখতে অনেকটা হালিমের মতো। দারুচিনি, পেঁয়াজ, সবজি ও গোশত দিয়ে এটি তৈরি হয়।

ডাম ওলাভ : ডাম ওলাভকে আসলে বাংলাদেশের আলুর দম বললেও ভুল হবে না। কাশ্মীরের এ ঐতিহ্যবাহী খাবার স্বাদে বৈচিত্র্যপূর্ণ। রান্নার সময় বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহৃত হয়।

মুজি গাদ : কাশ্মীরের অন্যতম জনপ্রিয় খাবার মুজি গাদ। একে ফিশ ফ্রাইও বলা যায়। খেতে সুস্বাদু। উৎসব-পার্বণে কাশ্মীরি মুজি গাদ খাওয়া হয়। নিরামিষ বা আমিষভোজী- যে কেউই এটি পছন্দ করে থাকেন।

আব গোশত : কাশ্মীরের বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার আব গোশত। খাসির গোশত দিয়ে তৈরি আব গোশত সেখানকার ঐতিহ্যবাহী খাবার। এটি ইরানি বা কাশ্মিরি উভয় রীতিতেই তৈরি হয়।

গোশতাবা : কাশ্মীরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খাবারের নাম গোশতাবা। এটি খাসির গোশত দিয়ে তৈরি হয়। স্বাদে অসামান্য। উৎসবের সময়ে খাবারটি সেখানকার মানুষকে খেতে দেখা যায়।।

লিওদুর স্যাম্যান : নিরামিষভোজীদের পছন্দের খাবার লিওদুর স্যাম্যান। দেখতে অনেকটা ডালের মতো হলেও আলু দিয়ে তৈরি হয় এটি। কাশ্মীরের মানুষ প্রতিদিন এ খাবার খান।

মোমো: কাশ্মীরের জনপ্রিয় খাবার মোমো। গোশত, সবজি বা পনির দিয়ে এটি তৈরি হয়। কাশ্মিরের মোমোর নাম শুনলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষেরও জিভে পানি আসে।

কাশ্মীরে রন্ধনশৈলীতে নানান বৈচিত্র্য রয়েছে। উৎসবের সময় তৈরি মিষ্টি শুফতার স্বাদ উষ্ণ স্মৃতির মতো লেগে থাকে। তবে ভাত কাশ্মীরিদের প্রধান খাদ্য

এবং প্রাচীনকাল থেকেই তাই হয়ে আসছে। ভাতের সাথে গোশত হলো কাশ্মীরে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও, বেশির ভাগ কাশ্মিরি হিন্দুরা মাংসাহারী। কাশ্মীরি পানীয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নুন চা বা শির চা এবং কাহওয়া বা কেহেউ। কাশ্মীর উপত্যকা বেকারি ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। বেকাররা তিল এবং পোস্ত বীজের সাথে সোনালি বাদামি ক্রাস্টসহ বিভিন্ন ধরনের রুটি বিক্রি করে। সোত এবং সোচভর হলো ছোট গোলাকার রুটি যার উপরে পোস্ত এবং তিল থাকে; শেরমাল, বাকরখানি, লাউয়া (খামিহীন রুটি) এবং কুলচাও জনপ্রিয়। গির্দা এবং লাউয়া মাখন দিয়ে পরিবেশন করা হয়। কাশ্মীরি খাবারে কাশ্মীরি বাকরখানির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি দেখতে গোলাকার নানের মতো, তবে স্তরযুক্ত এবং তিলের বীজ দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি উপাদান, প্রতিটি মশলা এবং প্রস্তুতির প্রতিটি পদ্ধতি প্রতিফলিত করে কাশ্মিরের বিখ্যাত খাবারগুলোর রং, স্বাদ ও গন্ধ যেকোনো ভোজনপ্রেয়সীর কাছে রুচির নির্মলতার পরশ ভুলিয়ে দেবে।

কাশ্মীরের আতিথেয়তা

আতিথেয়তা যেন কাশ্মীরে সংস্কৃতি ও ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। আধুনিক বিশ্বে ব্যস্ততার চাপে পাশের মানুষের জন্যেও আমাদের কাছে সময় থাকে না। কিন্তু কাশ্মীরের মানুষগুলো যুগ যুগ ধরে মানবতার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন। তাদের অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ সবাই। যে পর্যটকেরা একবার হলেও কাশ্মীরে গেছেন, তারা সারাজীবন এখানকার সুখময় স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্য এবং সংস্কৃতির প্রশংসা করে না এমন মানুষ খুব কমই আছে। তবে এবার তাদের অতিথিপরায়ণতা মুগ্ধ করেছে সবাইকে। যে পর্যটকেরা থাকার জন্য হোটেলকক্ষ কিংবা আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন না, তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন স্থানীয় লোকেরা। তাদের সঙ্গে গড়ে তোলেন এক সুন্দর পারিবারিক সম্পর্ক। এমনকি কোন ধরনের টাকা ছাড়াই এমন পর্যটকদের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দেন স্থানীয়রা। তাদের লক্ষ্য একমাত্র মানবজাতির সেবা করা এবং অতিথিরা যেন নিরাপদে কয়েকটা দিন কাশ্মীরে কাটাতে পারে, তা নিশ্চিত করা। কাশ্মীরের এ আতিথেয়তার জন্যে অনেক পর্যটক উপত্যকার তুষারপাত থেকে রক্ষা পান। পূর্বেও তুষারঝড়ে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধার করতে নিজের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে এসেছিলেন এখানকার গাইড এবং স্থানীয় লোকেরা। এদের মনে কোনো ছলচাতুরী নেই। এরা সর্বদায় সরল, সোজাসাপ্টা ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে। এখানকার প্রতিটি ইভেন্ট-এর লোকজনের মধ্যে সহযোগিতার মনমানসিকতা বিদ্যমান। এগুলোর মাধ্যমেই বোঝা যায় কাশ্মীরের মানুষদের মন ঠিক কতটা পবিত্র।

কাশ্মীরের আদিবাসী সম্প্রদায় এবং ঐতিহ্য

জম্মু ও কাশ্মীর অনন্য রীতিনীতি, ঐতিহ্য এবং ভাষাসহ বেশ কয়েকটি উপজাতির আবাসস্থল। এই উপজাতিগুলো, তাদের স্বতন্ত্র জীবনধারা এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সাথে, উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। গুজ্জর, বাকেরওয়াল, গাদ্দিস এবং বোটারা এই অঞ্চলে বসবাসকারী কিছু উপজাতি। তাদের প্রাণবন্ত লোকগীতি, নৃত্য এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে এসেছে, যা এই অঞ্চলের আদিবাসী ঐতিহ্যের আভাস পাওয়া যায়। তাদের অনন্য সাংস্কৃতিক অনুশীলন, দৈনন্দিন জীবনপ্রণালী, যা এই অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে ওঠে।

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বিত প্রয়াস কাশ্মীরকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এর প্রাণবন্ত উৎসবের স্পন্দন থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী ভাষা, সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীতের সুর, রন্ধনশৈলীর সমৃদ্ধি থেকে এর ঐতিহ্যবাহী পোশাকের কমনীয়তা, প্রতিটি দিকই এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি মনোমুগ্ধকর পাটাতন। স্থানীয় উপজাতিদের বর্ণনার প্রতিধ্বনি এবং নৈসর্গিক পর্যটন আকর্ষণ; যা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মনোমুগ্ধকর অঞ্চল হিসাবে সমৃদ্ধ। কাশ্মীর নিছক একটি গন্তব্য নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক যাত্রা, যা জীবন্ত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির এক অনিন্দ্য আনন্দের সম্মিলন।

ছোটগল্প

কোন এক মানুষের তরে

আব্দুল বারী

হসপিটালের বেডে শুয়ে আছেন রহিম সাহেব। তিন দিন হলো কোনো জ্ঞান নেই। হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন ঘরের মধ্যেই। বয়স হয়েছে। খুব যে বয়স হয়েছে তাও বলা যায় না। এই তো বছর দুই হলো রিটায়ার্ড করেছেন। শরীরের মধ্যে তেমন কোনো জটিল রোগও বাসা বাঁধেনি। বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত ছিল। হঠাৎ যে কী হলো লোকটার, দুম করে পড়ে গেল।

সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গ্রাউন্ড ফ্লোরে পুরুষ বিভাগের আট নম্বর রুমে শুয়ে আছেন। এখন সরকারি হসপিটালগুলোয় চিকিৎসা হয় বটে, তবে করিয়ে নিতে হয়। ডাক্তারবাবু যখন রাউন্ডে আসেন, একজন বাড়ির লোক থাকা দরকার। ভালো করে সব কথা না বললে ঠিকমতো ওষুধ লেখেন না। বাড়ির লোক বেশি কথা বললে ডাক্তাররা আবার ধমক দেন- "আপনি যদি ডাক্তার, তাহলে এখানে কেন এনেছেন?" কিন্তু রোগীর বাড়ির লোককে কথা তো বলতেই হবে। একটা মানুষ জীবন-মরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে জীবনের দিকে টেনে আনতে কথা বলা জরুরি। সরকারি হসপিটালে ডাক্তারবাবুরা রোগীর বাড়ির লোকের মানসিক অবস্থা বুঝতে চান না। আবার সেই ডাক্তার নার্সিংহোম কিংবা চেম্বারে বসে রোগের আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করেন। গুচ্ছের ওষুধ লেখেন- অবশ্য কয়েকটা নির্দিষ্ট কোম্পানির।

হসপিটালে ওয়ার্ড বয় থেকে শুরু করে আয়া-মাসিদের অত্যাচারেরও সীমা নেই। মানুষের অসুবিধার সুযোগ নিয়ে অর্থ আদায় করে ছাড়ে। একটা স্যালাইন চেঞ্জ করতে গেলেও পয়সা চেয়ে বসে। তবে মন্দের ভালো, এর মধ্যেই রহিম সাহেবকে একটি নার্স বারবার এসে দেখে যাচ্ছেন। আর একজন ডাক্তার

ম্যাডাম তো বেশ কয়েকবার এসেছেন রহিম সাহেবের বেডের পাশে।

শাহিন বেশ কয়েকবার ডাক্তার ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলেছে। প্রতিবারই ম্যাডাম খুব ভালো করে শাহিনকে রোগীর অবস্থা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আশ্বস্ত করেছেন। বলেছেন, খুব শীঘ্রই জ্ঞান ফিরে আসবে, ভালো হয়ে যাবেন রহিম সাহেব। কিন্তু শাহিন কিছুটা স্বস্তি-অস্বস্তির দোলাচলের মধ্যে দুলছে। তিন দিন হয়ে গেল মানুষটার জ্ঞান নেই। জ্ঞান ফিরবে তো? বাড়ি ফিরবেন তো? মনের মধ্যে কত কথা ঘুরপাক খাচ্ছে শাহিনের।

শাহিনরা দুই ভাই এক বোন। বোন ফোনে বলেছিল আব্বাকে নার্সিংহোমে ভর্তি করানোর কথা। কিন্তু শাহিন তা করতে পারেনি। এই মুহূর্তে শাহিনের হাত ফাঁকা। খুব বেশি অর্থ নেই। এখনো কোনো চাকরি-বাকরি বা মোটা রোজগার করার মতো কাজ করে উঠতে পারেনি সে। এই তো কয়েক বছর হলো বি.এসসি পাস করেছে। অবশ্য সেই ফাঁকে ফাঁকে নিট পরীক্ষাও দিয়েছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। যে ধরনের কোচিং দরকার ছিল, তা নিতে পারেনি শাহিন। বাবা সামান্য প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বড়ো ভাইয়ের পিছনে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। সে এখন একটা সরকারি স্কুলে চাকরি নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে গেছে। বাড়ির দিকে খুব একটা ফিরে তাকায় না। বাবা নিজের উপার্জন থেকে তিন ভাই-বোনকে মানুষ করেছেন। বোনের বিয়ে দিয়েছেন। তাই শাহিনের ওপর বেশি পয়সা খরচ করতে পারেননি রহিম সাহেব।

নিটে সাফল্য না পাওয়ায় যেকোনো সরকারি চাকরিতে ঢোকার চেষ্টা করেছিল শাহিন। সরকারি চাকরি তো এখন বড়ো মূল্যবান- একগাদা 'গান্ধী মার্কা' নোট দিয়ে কিনতে হয়। সব দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। সেখানে ঠাঁই পায় না শাহিন। কোথাও ঠাঁই নাই- সরকারি চাকরি সে যেন রবি ঠাকুরের 'সোনার তরী'।

বাবার পেনশন আর টিউশনির টাকায় সংসার চালাচ্ছিল শাহিন। মায়ের জন্য মাসে বেশ অনেক টাকার ওষুধ কিনতে হয়। আব্বার ওষুধ লাগত না, সেটাই বাঁচোয়া ছিল। নিজের ক্যারিয়ারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম ফিলাপ, বই কেনা, টিউশনির পর নিজের পড়াশোনা- এ নিয়েই দিন কাটছিল তার।

সন্ধ্যাবেলায় শাহিনের ফোনটা বেজে ওঠে, একটা অচেনা নম্বর। ফোনটা রিসিভ করতেই একটা মেয়ের গলা ভেসে আসে-

"আমি কি শাহিনের সঙ্গে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ, বলুন?"

"আপনি এখন কোথায়? হসপিটালে আছেন তো?"

"হ্যাঁ, আছি।"

"একবার হসপিটালের বাইরে জনতা হোটেলের কাছে আসতে পারবেন? হসপিটালের গেট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে।"

"আপনি কে বলছেন, ঠিক বুঝলাম না।"

"আপনার সঙ্গে আমি কয়েকবার কথা বলেছি। আপনি আসুন, দেখলে চিনতে পারবেন। আমি জানি আপনার বাবা অসুস্থ, আপনি মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। তবু আসতে বলছি।"

"ঠিক আছে, আসছি।"

আজ দুপুরে শাহিনের ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। এই তিন দিন স্নান-খাওয়া হয়নি বললেই চলে। দিনে একবার এক মুঠো খাচ্ছে কি খাচ্ছে না, হসপিটালের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে। কখনো বা ভেতরে গিয়ে আব্বার মাথায় হাত বুলিয়েছে। খিদের প্রকোপ এই তিন দিন বুঝতে পারেনি সে। এ সময় খিদেরা বুঝি মরে যায়। মাথার ভেতর হাজারো চিন্তা ও ভয় ডালপালা মেলে। কিন্তু শরীর টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু খাবার তো খেতেই হবে। এই খাওয়ার জন্যই রাতে একবার বাইরে যেতে হতো শাহিনকে। তাই সে বাইরে বের হয়।

হোটেলের সামনে ডাক্তার ম্যাডাম দাঁড়িয়ে। একটু চমকে যায় শাহিন। ডাক্তার ম্যাডাম কি তাকে ডেকেছেন নাকি? না অন্য কোনো মেয়ে? ডাক্তার ম্যাডাম কেন তাকে ডাকবেন? নিশ্চয়ই অন্য কোনো মেয়ে। কে হতে পারে, ধারণা নেই। হসপিটালে এসে অনেক অপরিচিত মানুষ পরিচিত হয়ে যায়। এই কয়েক দিন অনেকের সঙ্গেই তো কথা বলেছে শাহিন।

হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে খুঁজতে থাকে। তখনই ডাক্তার ম্যাডাম হাত ইশারা করে শাহিনকে কাছে ডাকেন। ডাক্তার ম্যাডাম যে তাকে এখানে দেখা করার জন্য ডাকতে পারেন, তা ভাবতে পারেনি সে। একমুখ হাসি নিয়ে বলেন, "শাহিন বাবু, আমি ডেকেছি। এসো ভেতরে এসো। খাওয়া-দাওয়া করো।"

শাহিন বলে ওঠে, "না ম্যাডাম, এখন খাব না। পরে খাব। আরেকটু রাত হোক।"

ডাক্তার ম্যাডাম বলেন, "চিন্তা নেই, আজকে রাতের মধ্যেই রহিম সাহেবের জ্ঞান ফিরে আসবে। তুমি যে চিন্তার ঘোরপাকে আবর্তিত হচ্ছো, আকাশ-পাতাল ভাবছো, তোমার সেই মানসিক জায়গাটা আমি বুঝতে পারছি। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে তোমাকে আশ্বস্ত করছি- বিপদ কেটে গেছে। এবার তুমি একটু আশ্বস্ত হও। খাওয়া-দাওয়া করো, নয়তো তুমিই অসুস্থ হয়ে পড়বে।"

"ঠিক বলছেন তো ম্যাডাম, আজকে রাতেই আব্বার জ্ঞান ফিরবে?" গলাটা কেমন গদগদ হয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসে শাহিনের।

"হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। এসো, ভেতরে এসো।"

খাবারের থেকে বড়ো শান্তি পায় ডাক্তার ম্যাডামের কথা শুনে। শাহিনের মনে হয় বুক থেকে যেন একটা পাষাণ নেমে গেল। অনেকটা স্বস্তি অনুভব করে। ডাক্তারদের কথা মানেই ঈশ্বরের কথা। ডাক্তাররা তো জগতের ঈশ্বর।

ডাক্তার ম্যাডামের কথাই ঠিক হয়। হোটেল থেকে আসার পর রাত্রি নয়টার দিকে আব্বার কাছে আসে শাহিন। দেখে রহিম সাহেব চোখ খুলেছেন। বুকটা আনন্দে ভরে যায়। মুখ নিচু করে আব্বার সাথে কথা বলতে চায় শাহিন। তার চোখে-মুখে বাবুই পাখির নাচ। আব্বা আবার বাড়ি ফিরে যাবেন। দখিনের বারান্দায় বসবেন, যেমন রোজ বসতেন। পুবদিকে সূর্য উঠবে। বাড়ির উঠোনে সকালের বাতাস এলোমেলো দামাল পায়ে খেলবে।

সকালবেলা ডাক্তার ম্যাডাম রাউন্ডে আসেন। অন্যান্য রোগীদের দেখে রহিম সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ান। শাহিন তখন রহিম সাহেবের মাথার পাশে বসে। একমুখ স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে রহিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী, এখন কেমন লাগছে? ভালো তো? আরে, এই তো ঠিক হয়ে গেছেন।" তারপর আরও কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বলেন, "আমায় চিনতে পারেন চাচা?"

রহিম সাহেব ডাক্তার ম্যাডামের মুখের দিকে ঘোলা চোখে একটু তাকিয়ে থাকেন। চোখের দৃষ্টি যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করেন। সুদূর অতীতের দিকে সার্চলাইটের আলো ফেলে মুখটা খোঁজেন। হয়তো খুঁজে পান না, তাই না-সূচক ঘাড় নাড়েন।

ডাক্তার ম্যাডাম সেই তেমনি মিষ্টি হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে বলেন, "ভালো করে দেখুন চাচা। চিনতে পারলেও পারতে পারেন। তবে না পারার সম্ভাবনাই বেশি। একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেটা মাত্র একদিন, কয়েক মিনিটের জন্য।"

রহিম সাহেব আবার পূর্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তার ম্যাডামের মুখের দিকে তাকান। অনেক করে এই মুখটিকে মনের মাঝে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজে পান না। অনেক মুখের ভিড়ে এই মুখ ঠিক মিলছে না। কবে, কখন, কোথায় দেখেছেন বুঝে উঠতে পারছেন না। ক্রমশ রহিম সাহেবের চোখে-মুখে কেমন এক অসহায়তা ফুটে ওঠে।

ডাক্তার ম্যাডাম এবার বলেন, "কয়েক বছর আগে বহরমপুরে নিট পরীক্ষা দিতে গিয়ে হল থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আসে। পরীক্ষা শুরু হতে আর চল্লিশ মিনিট বাকি। গেট ক্লোজ হবে দশ মিনিট পরেই। ফটো নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল সেই মেয়েটি। বাইরে তার বাবা দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু বাবা গেটের কাছে নেই। কোথায় সরে গিয়েছেন। খুব রোদ্দুর ছিল গেটের সামনে, দাঁড়ানোর জায়গাও কম। আর মানুষের ভিড় সে তো বলার নয়! প্রবল গরম। তাই তার বাবা কোথাও সরে গিয়েছেন। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে মেয়েটি। মানুষের অরণ্যে বাবাকে কী করে খুঁজে পাবে, সেটাই ভাবছে সে। অত মানুষের ভিড় থেকে আপনি তখন এগিয়ে যান। বলেন- 'কী হয়েছে মা তোমার?' মেয়েটার অবস্থা জেনে আপনি সাথে করে নিয়ে গিয়ে মেয়েটির বাবাকে খুঁজতে থাকেন। হলে ঢোকার আগে যে জায়গায় সেই মেয়েটি তার বাবাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেই জায়গায় নিয়ে আসেন। কিন্তু সেখানেও মেয়েটির বাবা নেই। আর এদিকে হলের গেট বন্ধ করার সময় হয়ে আসছে। উদ্বেগ বাড়ে। আপনার ফোন থেকে বাবার ফোন নম্বরে চেষ্টা করতে থাকে মেয়েটি। তার বাবার ফোন বন্ধ। একটা ধাতব আওয়াজ বারবার বেজেই চলে। মেয়েটির মাথার মধ্যে সেই আওয়াজ যেন হাতুড়ির আঘাত হানে। মেয়েটির উদ্বেগ বাড়ে, ভেতর ভেতর ঘামতে থাকে। সারা বছর ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি কি এভাবে বৃথা যাবে? ভাবতে পারে না সে।

এদিকে সময় কমে আসছে। সেই চরম সময়ে মেয়েটিকে বারবার সান্ত্বনা দিতে থাকেন আপনি। বলেন- 'এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই মা, ঠিক খুঁজে পাবো। তুমি শান্ত থাকো।' মেয়েটিকে পরীক্ষার সেন্টার থেকে একটু দূরে নিয়ে আসেন। চারিদিকে রাস্তা, এখানে-ওখানে মানুষের জটলা। বৈশাখের তীব্র দহন। তখন বেলা একটা পঁচিশ। আর পাঁচ মিনিট পরেই গেট ক্লোজ হয়ে যাবে। একবার গেট ক্লোজ করলে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। সবটা জানে মেয়েটি, জানতেন আপনিও। তবু সান্ত্বনা দেন, বলেন- 'কিছু হবে না, একটু শান্ত হও মা। ঠিক খুঁজে পাবো।' আপনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করেন মেয়েটির বাবা কোন দিকে যেতে পারেন। সেই রোদের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করেন। খানিকটা খোঁজার পর তার বাবাকে খুঁজে পান। বাবার ব্যাগ থেকে ফটো নিয়ে এসে মেয়েটিকে পরীক্ষার হলে ঢুকিয়ে দেন। আসার পথে মেয়েটির মাথায় ছাতা মেলে ধরেন। এক বোতল জল কিনে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন- 'চোখে-মুখে ঠান্ডা জলের ছাট দাও মা, মনটা শান্ত হবে।' তারপর হলের গেটের কাছে নিয়ে এসে পুলিশসহ অন্য গার্ডদের কাছে বলেন- 'স্যার চার মিনিট লেট হয়েছে, মেয়েটি এই হল থেকেই একটি প্রয়োজনে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গিয়েছিল। আপনারা জানেন। একটু ঢুকতে দিন প্লিজ।'"

গার্ড থাকা মানুষগুলো একবার ঘড়ি দেখে। একটা চৌত্রিশ। বেলা দুইটায় পরীক্ষা শুরু হবে। একটুখানি মেয়েটির দিকে তাকায়। তারপর বলে, "ঠিক আছে যাও।"

রহিম সাহেব আবার একটুখানি ডাক্তার ম্যাডামের মুখের দিকে তাকান। খুঁটিয়ে দেখেন। নাকের পাশে একটা তিল দেখতে পান, যেটা রহিম সাহেবের মায়েরও ছিল। তারপর বলেন, "ও, তুমি তো আফরোজা! এবার চিনতে পেরেছি মা। তোমাকে হলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর আমি তোমার আব্বার কাছে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। তোমাদের বাড়ি তো ফরাক্কার ওদিকে।"

"হ্যাঁ চাচা, সেই দিন ওই সময় আপনার মতো ফেরেশতার দেখা না পেলে হয়তো আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। আপনার কোনো ঠিকানা নেওয়া হয়নি। কিন্তু উপরওয়ালার কী কাজ দেখুন, আপনার সঙ্গে ঠিক দেখা করিয়ে দিলেন। এখন আমি বহরমপুর গোরা বাজারে থাকি। আব্বা-মাও থাকেন। এই তো সেই শাহিন, যাকে পরীক্ষা দেওয়াতে সেদিন আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন। ওর এক কপি ছবি আপনি ভুল করে আব্বার কাছে ফেলে এসেছিলেন। ছবিটা আমার কাছেই আছে। খুব ভালো ছেলে। আপনার ওপর অসীম ভক্তি ওর। এই কদিন যেন ওর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। সেটাই স্বাভাবিক।"

ডাক্তার ম্যাডাম রহিম সাহেবের কাছে বেশ অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন। রহিম সাহেবই ছিলেন আজকে সকালের রাউন্ডের শেষ রোগী।

এবার শাহিনের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী শাহিন বাবু, এখন নিশ্চিন্ত তো? আর দুই-এক দিনের মধ্যেই চাচা বাড়ি ফিরবেন। মুখটা আর গম্ভীর করে থাকবে না। একটু হাসো।" বলে ডাক্তার ম্যাডাম নিজেই একটা অদ্ভুত হাসি ঠোঁটের ডগায় এনে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ান। রহিম সাহেবকে বলেন, "চাচা আসছি এখন। সন্ধ্যায় আবার আসবো। কোনো রকম চিন্তা করবেন না। আপনার চিন্তা থেকেই এই অসুখ বেঁধেছে। মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে ফেলার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করবো।"

সন্ধ্যাবেলায় আফরোজা আসে। আজ তার ডিউটি ছিল না। সঙ্গে আব্বা-মাও। মাথায় ওড়না দেওয়া। রহিম সাহেবের বেডের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। রহিম সাহেবের সঙ্গে আফরোজার আব্বা কথা বলতে থাকেন। এদিকে চোরা দৃষ্টিতে শাহিনের দিকে বারবার তাকায় আফরোজা। শাহিন কেমন বোকা বোকা হাসে। আফরোজার ঠোঁটে কিন্তু অন্য হাসি ঝিলিক মারে।

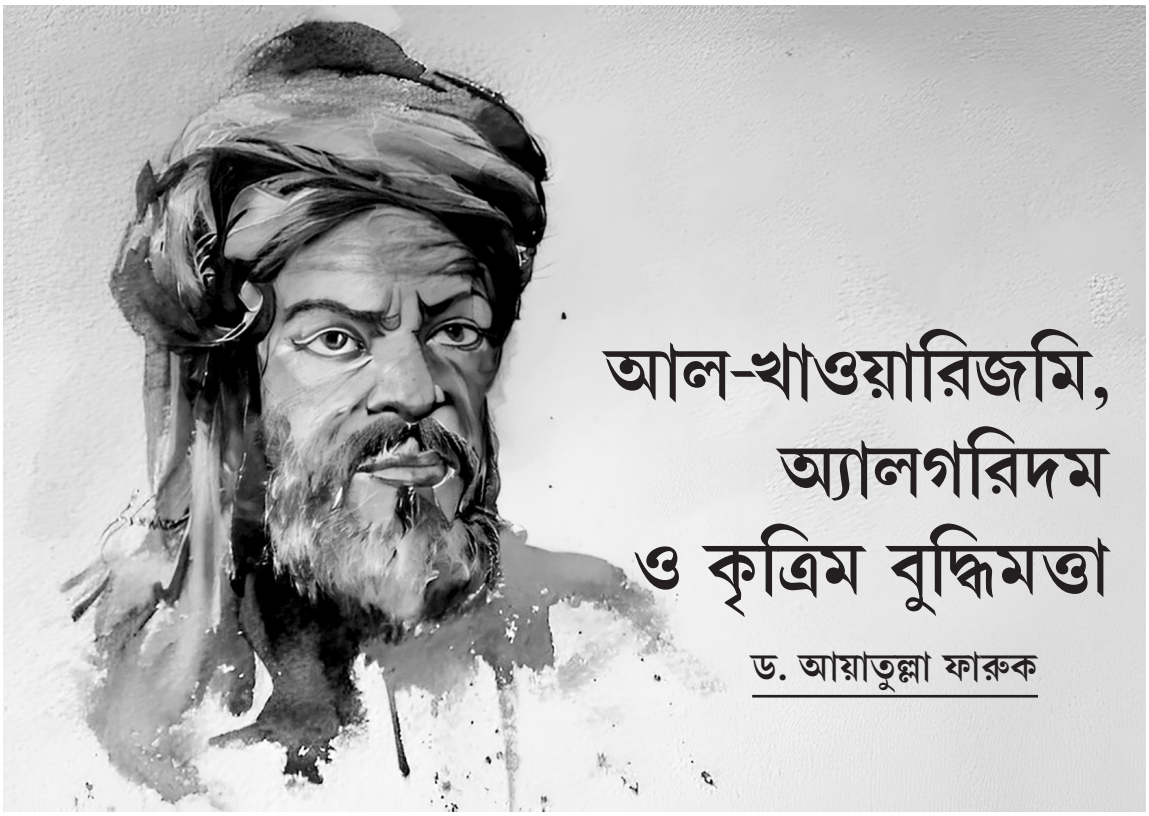

আল-খাওয়ারিজমি, অ্যালগরিদম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

ড. আয়াতুল্লা ফারুক

সভ্যতার ইতিহাসে এমন কিছু নাম থাকে যাদের অবদান যুগ যুগ ধরে প্রাসঙ্গিক থেকে যায়। নবম শতাব্দীর পারস্যের মহান গণিতবিদ মুহাম্মদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিজমি তাঁদের অন্যতম। তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনার প্রভাব আজকের ডিজিটাল যুগের সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিশেষত অ্যালগরিদম শব্দটির উৎপত্তি তাঁর নাম থেকেই। আর সেই অ্যালগরিদমই আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর মূল ভিত্তি। আল-খাওয়ারিজমির গণিতচিন্তা ও আধুনিক এআই-এর মধ্যে রয়েছে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সেতুবন্ধ।

আল-খাওয়ারিজমি থেকে অ্যালগরিদম:

আল-খাওয়ারিজমি ছিলেন আব্বাসীয় খিলাফতের সময়কার একজন প্রখ্যাত গণিতবিদ। বীজগণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ত্রিকোণমিতিতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বাগদাদের "বাইতুল হিকমাহ" (House of Wisdom)-এ কাজ করতেন। এটি ছিল তৎকালীন বিশ্বের জ্ঞানচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কেন্দ্র। তিনি ইন্দো-আরবিক (Indo-Arabic) সংখ্যা পদ্ধতি (০ থেকে ৯), দশমিক পদ্ধতি ও গণনার নিয়ম নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ "Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala" পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এখানে উল্লিখিত al-Jabr শব্দ থেকেই আলজেব্রা (algebra) শব্দটির উৎপত্তি হয়। সেই সাথে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত তাঁর নামের ল্যাটিন ফর্ম Algoritmi থেকেই 'algorism' এবং পরে 'al-gorithm' শব্দের উদ্ভব। অর্থাৎ, অ্যালগরিদম শব্দটি মূলত আল-খাওয়ারিজমির নামের ল্যাটিন রূপান্তর যা সময়ের সাথে একটি সাধারণ গণিতিক ও যৌক্তিক প্রক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

অ্যালগরিদম শব্দের প্রাথমিক ও পরবর্তী ধারণা:

অ্যালগরিদম হলো কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য ধাপে ধাপে সাজানো সুস্পষ্ট নির্দেশনা। প্রথমদিকে অ্যালগরিদম বলতে বোঝানো হত নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে গণনা করার পদ্ধতি। বিশেষ করে ইন্দো-আরবী সংখ্যাপদ্ধতির মাধ্যমে অঙ্ক করার কৌশল। যেমন, একটি সংখ্যাকে গুণ করার নিয়ম, কোনো তালিকা

সাজানোর পদ্ধতি, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার যৌক্তিক কাঠামো প্রভৃতি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শব্দটির অর্থ বিস্তৃত হয়েছে। এখন অ্যালগরিদম বলতে বোঝায় - কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সুসংগঠিত ধাপসমূহ, যৌক্তিক ও সীমাবদ্ধ নির্দেশনার সমষ্টি অথবা এমন একটি পদ্ধতি যা পুনরাবৃত্তিযোগ্য এবং নির্ভুল।

কম্পিউটার বিজ্ঞানের ভাষায়, প্রোগ্রাম হলো অ্যালগরিদমের কম্পিউটার দ্বারা অনুধাবনযোগ্য রূপ। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং মূলত অসংখ্য অ্যালগরিদমের সমষ্টি। একটি সফটওয়্যার নির্দিষ্ট ধাপ-নির্দেশনা (algorithmic steps) অনুসরণ করেই কাজ করে।

অ্যালগরিদম থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা:

আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসলে উন্নত ও জটিল অ্যালগরিদমের ফসল। এআই এমন এক প্রযুক্তি, যেখানে কম্পিউটারকে শেখানো হয়, তথ্য বিশ্লেষণ করতে, সিদ্ধান্ত নিতে, মানুষের ভাষা বুঝতে, ছবি চিনতে এবং মানুষের মতো প্রতিক্রিয়া জানাতে। এআই-এর গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি, যেমন মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং ইত্যাদি, সবই অ্যালগরিদমের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। পার্থক্য শুধু এই যে, আধুনিক অ্যালগরিদম নিজে নিজে তথ্য থেকে শিখতে পারে এবং উন্নত হতে পারে।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা:

আল-খাওয়ারিজমির সময়ে অ্যালগরিদম ছিল মূলত গণিতের নিয়ম। আজ তা রূপ নিয়েছে জটিল গাণিতিক মডেল ও নিউরাল নেটওয়ার্কে। কিন্তু মূল ধারণাটি একই - সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ধাপ অবলম্বন করে সমাধান প্রাপ্তি। এই ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে, নবম শতকের গণিতচিন্তা আজ একবিংশ শতাব্দীর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভীত গড়ে দিয়েছে। বর্তমানে এআই প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে - চিকিৎসাবিদ্যা থেকে শুরু করে স্বয়ংচালিত গাড়ি, ভাষান্তর, শনাক্তকরণ, আর্থিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি। এই সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে অসংখ্য অ্যালগরিদম। আর অ্যালগরিদম শব্দটির শিকড় পৌঁছে যায় নবম শতাব্দীর এক পারস্য বিজ্ঞানীর কাছে। তাই, আল-খাওয়ারিজমির নাম শুধু ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা প্রতিদিনের প্রযুক্তিগত বাস্তবতায় জীবন্ত। আমরা যখন অ্যালগরিদম শব্দটি ব্যবহার করি বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো সেবা গ্রহণ করি, তখন অজান্তেই তাঁর ঐতিহাসিক অবদানই প্রস্ফুটিত হয়।

আল-খাওয়ারিজমির সময়ে অ্যালগরিদম ছিল মূলত গণিতের নিয়ম। আজ তা রূপ নিয়েছে জটিল গাণিতিক মডেল ও নিউরাল নেটওয়ার্কে। কিন্তু মূল ধারণাটি একই - সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ধাপ অবলম্বন করে সমাধান প্রাপ্তি। এই ধারাবাহিকতাই প্রমাণ করে, নবম শতকের গণিতচিন্তা আজ একবিংশ শতাব্দীর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভীত গড়ে দিয়েছে। বর্তমানে এআই প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হচ্ছে - চিকিৎসাবিদ্যা থেকে শুরু করে স্বয়ংচালিত গাড়ি, ভাষান্তর, শনাক্তকরণ, আর্থিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি। এই সমস্ত কিছুর পেছনে রয়েছে অসংখ্য অ্যালগরিদম।

শিয়া-সুন্নি বিভাজন: আকিদার দ্বন্দ্ব নাকি ক্ষমতার রাজনীতি?

মাফিকুল ইসলাম

তেহরানের এক স্কুলে সাম্প্রতিক হামলায় যখন নিষ্পাপ শিশুদের রক্তে শ্রেণিকক্ষ ভেসে গেল, তখন প্রশ্নটা নতুন করে সামনে এলো-এই রক্ত কি শিয়া না সুন্নির? গত এক দশকে শুধু ইয়েমেনের যুদ্ধে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৩ লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সিরিয়ার সংঘাতে প্রাণ গেছে ৫ লক্ষের বেশি মানুষের। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ সালের ইরাক-ইরান যুদ্ধেই নিহত হয়েছিল আনুমানিক ৫ থেকে ১০ লাখ মানুষ। এসব সংখ্যার পেছনে যে কান্না, তা কোনো মাজহাবের নয়, তা মুসলমানের। তাহলে প্রশ্ন উঠবেই-শিয়া-সুন্নি বিভাজন কি সত্যিই আকিদার প্রশ্ন, নাকি এটি ক্ষমতার রাজনীতির নির্মম ব্যবহার? আকিদাগত পার্থক্য যে নেই, তা নয়। কিন্তু সেই পার্থক্যকে চিরস্থায়ী ঘৃণায় রূপ দেওয়া কি কোরআনের নির্দেশনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আরও বিস্ময় জাগে যখন দেখি, মুসলিম বিশ্বের বহু রাষ্ট্র নির্দ্বিধায় আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তোলে-যাদের সঙ্গে আকিদাগত দূরত্ব অসীম, কিন্তু নিজেদের ঘরের ভেতর শিয়াদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করে। ইতিহাস সাক্ষী-কারবালার বেদনা থেকে শুরু করে আধুনিক ভূরাজনীতি, অধিকাংশ সংঘাতের মূলে ছিল রাষ্ট্রীয় আধিপত্য ও প্রভাব বিস্তারের লড়াই। যদি তা-ই সত্য হয়, তবে মুসলিম উম্মাহ কি চিরকাল এই রাজনৈতিক ব্যবহারের শিকার হয়ে বিভক্ত থাকবে? নাকি আমরা ঘৃণার বদলে শর্তসাপেক্ষ ঐক্য, ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতা এবং কৌশলগত সমন্বয়ের পথ বেছে নেব? যেখানে আকিদা থাকবে, কিন্তু বিদ্বেষ নয়; মতপার্থক্য থাকবে, কিন্তু রক্তপাত নয়।

আকিদাগত পার্থক্য: বাস্তব স্বীকৃতি, অন্ধ ঘৃণা নয়

শিয়া ও সুন্নির মধ্যে ইমামত, খিলাফত, কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও ফিকহি পদ্ধতি নিয়ে মৌলিক আকিদাগত পার্থক্য আছে-এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ৮৫-৯০ শতাংশ সুন্নি এবং ১০-১৫ শতাংশ শিয়া। অর্থাৎ প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি শিয়া মুসলমান এই উম্মাহরই

অংশ। মতভেদ থাকবে, তর্ক থাকবে; কিন্তু পার্থক্য মানেই কি চিরস্থায়ী ঘৃণা? ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক বা কৌশলগত সম্পর্ক রাখলেই তা আকিদা বিসর্জন-এমন সরল সমীকরণ বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক সুন্নি রাষ্ট্র প্রতিবছর বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রচুক্তি করে আমেরিকার সঙ্গে, একই সঙ্গে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি সহযোগিতায় ঘনিষ্ঠ থাকে রাশিয়ার সঙ্গেও। যাদের সঙ্গে ধর্মীয় দূরত্ব অসীম, তাদের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক বৈধ-কিন্তু মুসলিম প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে কেন শুধু বিদ্বেষের ভাষা? আকিদার পার্থক্য স্বীকার করেও কি শর্তসাপেক্ষ সহযোগিতা সম্ভব নয়? ঘৃণার বদলে বাস্তববাদী সমন্বয়ই কি আজকের সময়ের দাবি নয়?

রাজনৈতিক বাস্তবতা বনাম ধর্মীয় আবেগ

মুসলিম বিশ্বের রাজনীতির দিকে তাকালে বোঝা যায়, অনেক সময় আকিদার আড়ালে আসলে কৌশলগত শক্তির লড়াইই কাজ করে। ইতিহাসের কারবালার বেদনা আমাদের আবেগকে নাড়া দেয়, কিন্তু আধুনিক কালে ইরাক-ইরান সংঘাতের পেছনে তেল, সীমান্ত ও আঞ্চলিক প্রভাবের প্রশ্নটাই মুখ্য ছিল। একইভাবে ২০১৫ সালের ইয়েমেন গৃহযুদ্ধে কয়েক কোটি মানুষ মানবিক সংকটে পড়েছে। এটি কেবল মাযহাবি বিরোধ নয়, বরং আঞ্চলিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। অন্যদিকে, সুন্নি-প্রধান কিছু আরব রাষ্ট্র ২০১৭ সালে আমেরিকার সঙ্গে প্রায় ১১০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রচুক্তি করেছে। আবার সংযুক্ত আরব আমিরাত সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়ার সঙ্গে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছে। যখন আদর্শগত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রগুলো কৌশলগত স্বার্থে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তখন শুধুমাত্র শিয়া পরিচয়ের ভিত্তিতে চরম বিদ্বেষ পোষণ কতটা যৌক্তিক-সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে।

বাস্তবতা হলো, আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্বার্থের সমীকরণে চলে। তাই ঘৃণা নয়, ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতাই হতে পারে পথ। ২০২৩ সালে চীনের মধ্যস্থতায় ইরান ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন দেখিয়েছে-প্রয়োজনে সংলাপের দরজা খোলা যায়। একইভাবে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপেরেশন (ওআইসি)-এর মতো মঞ্চে ফিলিস্তিনসহ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সমন্বিত অবস্থান নেওয়া সম্ভব।অতএব, আবেগকে অস্বীকার নয়, কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতাকে বুঝে শর্তসাপেক্ষ ঐক্যের পথে এগোনোই আজ সময়ের দাবি। ঐক্য মানে অভিন্ন আকিদা নয়; বরং পারস্পরিক সম্মান ও কৌশলগত সহযোগিতা। তবেই বিভাজন নয়, শক্তিই হবে মুসলিম বিশ্বের পরিচয়।

ঘৃণার উৎস: আকিদা নাকি অন্তরের রোগ?

কোরআন স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না" (সূরা আল ইমরান ১০৩)। তাহলে প্রশ্ন জাগে, আজ যে শিয়া-সুন্নি বিদ্বেষ আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে, তার উৎস কোথায়? বিশ্বে প্রায় ২০০ কোটিরও বেশি মুসলমান, অথচ নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে গত কয়েক দশকে লক্ষ লক্ষ প্রাণ হারিয়েছে। পাকিস্তানেও গত দুই দশকে শিয়া—সুন্নি সহিংসতায় হাজারের বেশি প্রাণহানির তথ্য পাওয়া যায়। এই রক্তপাত কি আকিদার স্বাভাবিক ফল, নাকি অন্তরের রোগ-অহংকার, গোঁড়ামি ও ক্ষমতার লোভের বহিঃপ্রকাশ? সূরা মায়েদা ও সূরা বনী ইসরাইলে ইবলিশের যে কৌশলের কথা বলা হয়েছে-মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিভেদ ছড়িয়ে দেওয়া-তা আজও যেন নতুন রূপে সক্রিয়। আকিদা তখনই অস্ত্র হয়ে ওঠে, যখন তা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামের শিক্ষা বিভাজন নয়, বরং অন্তর পরিশুদ্ধ করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা।

ইতিহাসের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

কারবালার ট্র্যাজেডি মুসলিম ইতিহাসের এক গভীর বেদনার নাম। কিন্তু সেটি শুধু ধর্মীয় আবেগের সংঘাত ছিল না; বরং ক্ষমতা ও নেতৃত্বের প্রশ্নে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও ছিল। ইতিহাসবিদদের মতে, ১৫০১ সালের আগে ইরানে শিয়াবাদ রাষ্ট্রীয় মতবাদ ছিল না। সাফাভি শাসনামলে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের অংশ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আকিদা ও রাজনীতি তখন একে অপরকে ব্যবহার করেছে। আধুনিক যুগে ১৯৮০—৮৮ সালের ইরান—ইরাক যুদ্ধও ছিল আঞ্চলিক আধিপত্যের লড়াই, নিছক মাজহাবি দ্বন্দ্ব নয়। একইভাবে ইয়েমেনের চলমান সংঘাতও মূলত আঞ্চলিক শক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে-রাজনীতি যখন ধর্মকে হাতিয়ার বানায়, বিভাজন তখন রক্তাক্ত

বাস্তবতা হলো, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটির বেশি মুসলমানের অধিকাংশই আকিদার জটিল তাত্ত্বিক বিতর্কে প্রবেশ করেন না। তারা জীবনের সংগ্রাম, রুজি-রুটি ও ইবাদতের সরল পথেই চলেন। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারত, তুরস্ক থেকে মরক্কো-মসজিদে দাঁড়ালে কাতার একটাই, কিবলা একটাই, কোরআন একটাই। রমজানে সারা পৃথিবীর মুসলমান একই মাসে সিয়াম পালন করেন। ঈদের তাকবিরেও বিভাজনের ভাষা শোনা যায় না। সাধারণ মানুষের কাছে শিয়া না সুন্নি-তার চেয়ে বড় পরিচয় তারা মুসলমান।

হয়।

সাধারণ মুসলমানদের বাস্তবতা

বাস্তবতা হলো, বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটির বেশি মুসলমানের অধিকাংশই আকিদার জটিল তাত্ত্বিক বিতর্কে প্রবেশ করেন না। তারা জীবনের সংগ্রাম, রুজি-রুটি ও ইবাদতের সরল পথেই চলেন। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারত, তুরস্ক থেকে মরক্কো-মসজিদে দাঁড়ালে কাতার একটাই, কিবলা একটাই, কোরআন একটাই। রমজানে সারা পৃথিবীর মুসলমান একই মাসে সিয়াম পালন করেন। ঈদের তাকবিরেও বিভাজনের ভাষা শোনা যায় না। সাধারণ মানুষের কাছে শিয়া না সুন্নি-তার চেয়ে বড় পরিচয় তারা মুসলমান। অথচ আলেমদের তাত্ত্বিক মতভেদ যখন রাজনীতির মঞ্চে ছুড়ে দেওয়া হয়, তখন তা সাধারণ মানুষের জীবনে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। ইতিহাস দেখিয়েছে, ধর্মীয় বিতর্ককে জনজীবনের সংঘাতে রূপ দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাজই।

মাযহাবী বিভাজন: আত্মসমালোচনা

শিয়া-সুন্নি বিভাজন নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথমেই আত্মসমালোচনার আয়নায় দাঁড়াতে হয়। বিশ্ব মুসলিম জনসংখ্যার প্রায় ৮৫—৯০% সুন্নি এবং ১০—১৫% শিয়া-এই পরিসংখ্যানকে ঘিরে আমরা যেন সংখ্যার অহংকার বা সংখ্যালঘুর নিরাপত্তাহীনতার রাজনীতি তৈরি করেছি। অথচ বিভাজন শুধু শিয়া—সুন্নিতে সীমাবদ্ধ নয়। সুন্নিদের ভেতরেই আশআরী, আহলে হাদিস, চার মাযহাব বনাম লা-মাযহাবি বিতর্ক-এমনকি তুচ্ছ ফিকহি মতভেদের কারণেও একে অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। "তাকফির" বা অন্যকে কাফের আখ্যা দেওয়ার সংস্কৃতি আজ সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মসজিদের মিম্বর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাসে কারবালার বেদনা যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইকে ধর্মীয় রূপ দিয়েছিল, তেমনি আধুনিক কালে ইরান—ইরাক যুদ্ধের লক্ষাধিক মৃত্যু প্রমাণ করে-আকিদা নয়, ভূরাজনীতি ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আগুন জ্বালিয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো, এই মাযহাবী পরিচয়কে অনেক সময় আঞ্চলিক শক্তি ও বৈশ্বিক শক্তির কূটনৈতিক খেলায় হাতিয়ার বানানো হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা যেখানে "উম্মাহ"-র ঐক্য, সেখানে আমরা কি বিভাজনকে রাজনৈতিক পুঁজিতে পরিণত করে নিজেদের ভবিষ্যৎই দুর্বল করে দিচ্ছি না?

উপসংহারে এসে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে-শিয়া বা সুন্নি পরিচয়ের চেয়ে বড় আমাদের পরিচয় মুসলমান। গত কয়েক দশকের রক্তাক্ত ইতিহাস-ইরাক—ইরান যুদ্ধ থেকে সিরিয়া কিংবা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ-প্রমাণ করেছে, বিভাজনের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত উম্মাহকেই দুর্বল করেছে। অথচ কোরআনের আহ্বান স্পষ্ট-বিভক্ত হয়ো না। তাই সময় এসেছে আত্মসমালোচনার সাহস দেখানোর। আকিদাগত মতভেদ থাকবে, কিন্তু তা যেন বিদ্বেষে রূপ না নেয়। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকবে, কিন্তু তা যেন রক্তপাতের কারণ না হয়। শর্তসাপেক্ষ ঐক্য, ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্মানই হতে পারে আগামী দিনের পথনির্দেশ। আমাদের শক্তি সংখ্যার অহংকারে নয়, অন্তরের ঐক্যে; স্লোগানে নয়, সমন্বিত কৌশলে। যদি আমরা ঘৃণার বদলে ভ্রাতৃত্ব বেছে নিতে পারি, তবে বিভক্ত উম্মাহ আবারও ইতিহাসে ইতিবাচক শক্তি হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

পরিণতি

মুসা আলি

মাঝরাত। মিশমিশে অন্ধকার। কুহেলি পাখির ডাকে প্রকৃতি অস্থির। মানসিকতায় চঞ্চল হিম্মত অন্ধকার বারান্দার উপরে এসে জানালার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন, রকি নিথর ঘুমে আচ্ছন্ন। আবার নিজের শোবার ঘরের দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন, এভাবে বিতণ্ডা সৃষ্টি করে সে ঠিক কাজ করেনি। যা দিনকাল পড়েছে, কিছু অঘটন ঘটে গেলে সমস্ত ঝক্কি তাঁর মাথার উপর চলে আসবে।

তখনও হিম্মতের মনের তলানিতে খেদের সুর ভাঙা গিটারের তালমাত্রাহীন আওয়াজের মতো একটানা বেজে চলেছে। আবার ঘুমিয়েও পড়লেন শরীরের ঝিমুনির টানে।

সকাল না হতেই ছ্যাঁক করে ঘুম ভেঙে গেল হিম্মতের। গভীর জলে ডুবন্ত সাঁতারুর মতো থই থই পা ফেলে বারান্দায় এসে দেখলেন, রকি বিছানায় নেই। এত সকালে গেল কোথায়? এক অচেনা শূন্যতার ধাক্কায় কেমন যেন বেসামাল অবস্থা।

একটু পরে পুবের আকাশে লাল সূর্যের অনিন্দ্যসুন্দর উঁকি। রুবি চা নিয়ে এল-তার জীবনে প্রতিদিনকার অন্যতম অভ্যাস, রোজ সকালে সূর্য ওঠার মতোই। হিম্মতের আলতো প্রশ্ন, "ছেলে কি কোথাও বের হয়েছে?"

"জানি না।" প্লেট নামিয়ে রেখে গজগজ করতে করতে রুবি ফিরে গেল রান্নাঘরে। রকির জন্য তাঁর মনের তলানিতে শীতের জড়তার মতো যে বিশেষ দুর্বলতা লেপটে রয়েছে, তা কেন লোকটা বুঝতে চাচ্ছে না? নাকি সব জেনে এভাবে মিথ্যা বাহানা দেখানোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে? একটাই তো ছেলে। মায়ের পক্ষে কি কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব?

তাৎক্ষণিক ঘটনার প্রেক্ষিতে রকি কি এমন মন্দ বলেছে? সারাজীবন অন্যের উপকারের গর্তে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে এভাবে সংসারটাকে দুর্বল করে তোলা ঠিক নয়। রকি তো সে কথাই বলতে চেয়েছে। তাতেই এই গোঁয়ার লোকটা এম.এ পড়া যোগ্যিমান ছেলের মুখের উপর কীভাবে দিব্যি বলে দিতে পারল-এভাবে কথা কইস না, এ সংসারে যা ভালো বুঝব, তাই করব।

সংসার ওর একার নাকি? এতো দেখছি বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগের কাঁচা বিড়ম্বনা। কাউকে বোঝাতে পারে না, নিজেও বুঝতে চায় না। সংসারের যাঁতাকলে পড়ে বাকি সকলের জীবন যেন পিষে যাচ্ছে যখন তখন।

নানা অভাব-অনটনের মধ্যে বড় হতে হতে রকি বেশ বুঝতে পেরেছিল, নিজের না থাকলে কেউ পাশে থাকে না। সাহায্যের প্রসঙ্গে এলে সবার আগে নিকটাত্মীয়রা সরে পড়ে। কেবলমাত্র সেই মূল্যায়নটুকু সে বাপকে বোঝাতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটার তাৎক্ষণিক খাঁকারির সামনে তার পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি।

আজও কেন লোকটা বুঝতে পারল না, কেবল সম্পদশালীরা দানখয়রাতের অধিকারী? সেই বিধান না মেনে ঋণ করে এতগুলো জামাকাপড় কিনে আনার কোনো দরকার ছিল কি? তাই নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাপ-ছেলের মধ্যে প্রবল বাকবিতণ্ডা জমে উঠেছিল কলকলে সমুদ্রস্রোতের মতো।

রুবি সেই সদ্য টাটকা স্মৃতি তখনও ভুলতে পারেনি। একটাই প্রশ্নে বারবার ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল-লোকটা কেন যোগ্য ছেলের ভালো কথা মেনে নিতে পারল না? রকি জানত, মানুষের দায়ে পাশে দাঁড়ানো তার বাপের প্রধানতম জীবনব্রত। কিন্তু সময়ের টানে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তা মেনে নিতে এত বিব্রত হওয়ার কী আছে?

জোয়ারের তীব্র স্রোতের মতো হিম্মতের হিসাব তখনও সম্পূর্ণ আলাদা খাতে কলকল করে বইছে। প্রতিবছর রোজা এলে একটা বিশেষ ইচ্ছা লোকটির ঘাড়ে কয়েক কুইন্টাল ভারী বোঝা হয়ে চেপে বসে। এ অভ্যাস অনেক পুরনো, বছর বছর চলে আসছে, প্রতিবছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের ঝড়বৃষ্টির মতো। কেবল সেই তাড়না নিয়ে রকিকে না জানিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে গতকাল বাজার থেকে দশ হাজার টাকার বস্ত্রসামগ্রী কিনে এনেছেন। সেটাই বাপ-ছেলের 'কেচ্ছার' মূল কারণ হয়ে উঠেছিল।

রকির ভাবনা, এম.এ পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের জন্য যে টাকা লাগবে তা তার বাপকেই দিতে হবে। কয়েক মাসের টিউশন ফিস বাকি রয়েছে। যাতায়াত খরচসহ টুকটাক হাতখরচ-হরেদরে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। দেনা করে বস্ত্রসামগ্রী কেনার পরে কি এই খরচটুকু তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব?

সকাল হবার আগেই বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় একা একা পথ চলতে চলতে রকি ঠিক এভাবেই ভাবছিল। মনের বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি মিশে যাচ্ছিল তার ধস্ত চিন্তার সঙ্গে। এখন আবার তাকেই বিশেষ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হচ্ছে। বাপকে এভাবে আক্রমণ করে কথা না বললেই ভালো করত সে। নতুন জাগ্রত বিবেক হুল ফোটাতে লাগল তার অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

হিম্মতের ভাবনা তখন ভিন্ন পথে ছুটছে। রুবি রাগ করে সারারাত তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। ঋণ করে জামাকাপড় কেনার সময় রকির খরচের বাজেট নিয়ে ভাবা উচিত ছিল তাঁর। উঠানে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশে নতুন সূর্যের আলো দেখে অনুশোচনায় ঝলসে যেতে থাকলেন। উপযুক্ত ছেলে তো বাপের জীবনে সূর্যের সমতুল্য। তাহলে কেন সে রকির পরামর্শ মেনে নিতে পারল না? নিজস্ব অনুভূতির তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বিমূঢ়তা এসে যেভাবে ধাক্কা মারছে, তাও বেশ অনুভব করতে পারলেন হিম্মত।

রকি বাড়িতে ফিরে এসে দেখল, তার বাপ উঠানে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছেন। চমকে উঠল রকি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হিম্মতের প্রশ্ন, "এত সকালে গিয়েছিলি কোথায়?"

"রাস্তায় ঘুরতে বের হয়েছিলাম।"

"আজ প্রথম?"

"না মানে মনে হলো-"

"বাপের উপর রাগ করে এভাবে রোজ সকালে প্রাতভ্রমণে অভ্যস্ত হতে পারলেই তো ভালো। স্বাস্থ্য উদ্ধারের অপূর্ব শুরুয়াত।"

"তিন মাথার মোড়ে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বাপি।"

উদ্বিগ্ন হিম্মতের প্রশ্ন, "কেন, কী হয়েছে?"

"রাস্তার পাশে আধমরা অবস্থায় একজন লোক পড়েছিল। মুখ থেঁতলানো। বাম হাতের পেশিতে গুলির চিহ্ন। রক্ত ঝরে ঝরে শরীর ফ্যাকাশে। মুখ নিচু করে একটানা গোঙাচ্ছিল।"

"কোথায় বাড়ি, জানতে পারলি?"

"এলাকার কেউ হলে চিনতে পারতাম।"

"তারপর কী হলো বল?"

"কেউ গায়ে হাত দিতে চাচ্ছে না। সবার মধ্যে একটাই ভয়-পুলিশ কেসে ফেঁসে যেতে হবে।"

"তুইও তাই ভাবলি?"

"দুজনকে সঙ্গে নিয়ে লোকটাকে ভ্যানে তুলে থানা

পর্যন্ত গিয়েছি। মেজোবাবু এসে বললেন, লোকটাকে ভ্যান থেকে নামাও।"

"তারপর?"

"নিজে উদ্যোগ নিয়ে মেজোবাবুকে বললাম, যেকোনো মূল্যে লোকটাকে বাঁচাতে হবে স্যার। পারলে সবকটা আসামিকে আজকের মধ্যে অ্যারেস্ট করুন।"

"বাধ্য হয়ে মেজোবাবু ডায়েরি নিয়ে লোকটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। বেঁচে যেতে পারে।"

হিম্মতের সামনে অপূর্ব সুযোগ। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "তাহলে ঋণ করে কটা জামাকাপড় কেনার জন্য আমার সঙ্গে এভাবে বিতণ্ডায় যেতে গেলি কেন?"

"সে তো অন্য প্রসঙ্গ।"

"গভীর অর্থে হুবহু একই।"

"কী রকম?"

"থানার পুলিশ তোর নামে ইচ্ছা করলে কেস শুরু করতে পারে। আবার মূল সাক্ষী হয়ে যেতে পারিস। কী দরকার ছিল এমনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার? অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের ঘাঁটি খসানোর ব্যবস্থা করে বাড়িতে ফিরলি?"

"নাহলে যে লোকটা মারা যেত।"

"জীবনে ত্যাগের ঝুঁকি সর্বত্র সমান রে।"

রকি চুপ করে থাকল। হিম্মতের বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। থেমে থেমে বললেন, "এ গ্রামে বেশ কয়েক ঘর বাউরি-মুচি রয়েছে। বড় অভাবী সকলে। তুই তা জানিস। দুর্গোৎসবের সময় তারাও মনে মনে চায় নতুন সাজপোশাক পরতে। উৎসবে মানুষে মানুষে ভাগাভাগি থাকা ঠিক নয়। তাই ওদের কথা ভেবে জামাকাপড়গুলো কিনেছি।"

"এসব বলোনি কেন আমাকে?"

"বললে রাজি হতে পারতিস? তোর মা কি সম্মতি দিত? আড়ালে আড়ালে তুই কি মায়ের সঙ্গে এক হয়ে যেতিস না?"

বাকরুদ্ধ হয়ে রকি তার বাপির পাশে দাঁড়িয়ে। নীরবতার গভীরতা দুজনের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা ধীরলয়ে মুছে দিচ্ছে। রকি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজস্ব ইচ্ছার মধ্যে হিম্মতের জাদুমন্ত্রকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় অস্থির হতে থাকল।

(খ)

পরান মণ্ডল হিম্মতের বাল্যবন্ধু। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত দুজনের পড়াশোনা একসঙ্গে। সেই পরান মেয়ের বিয়ের সমস্যা নিয়ে শনিবার সাত সকালে হিম্মতের বাড়িতে উপস্থিত। প্রত্যুষের প্রার্থনা সেরে হিম্মত বাড়িতে ফিরে এসেই বললেন, "আরে, পরান যে! বাড়ির সব খবর ভালো তো?"

"মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি কিন্তু বিপদ হলো, ছেলের বাবা বরপণ বাবদ পনেরো হাজারের দাবি থেকে কিছুতেই সরছে না। তাই তোর কাছে এসেছি।"

চিন্তিত হলেন হিম্মত। বন্ধুর মেয়ের বিয়ে বলে কথা। কিছু সময় থমকে থেকে বললেন, "কটা দিন সময় দে, একটু ভেবে দেখি।"

"তাহলে তোর ভরসায় বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। মেয়ে এ খবর শুনলে খুব খুশি হবে।"

"একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।" বলেই থমকে থাকলেন হিম্মত। পরোপকারীর ভাবনা সবসময় পরকে নিয়েই হয়। পরান তা জানত বলেই হিম্মতের কাছে আসতে সাহস পেয়েছিল এবং ভূমিকা ছাড়াই অকপটে নিজের দায়ের কথা এভাবে বলতেও পারল।

সেদিন বিকেলে পথের দু'ধারে পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোর বিস্তার। হিম্মত মোরাম রাস্তা মাড়িয়ে মাঠের ভিতরে ঢুকে বসে আছেন সবুজ ঘাসের উপর। শরীরে মৃদু বাতাসের হিল্লোল। সূর্যের শেষ সাত রঙ ঝলমলে ঘাসের বুকে। সেখানেই প্রার্থনা শেষ করে কায়মনোবাক্যে নিজস্ব মোনাজাতে হিম্মতের ঐকান্তিক প্রার্থনা-পরানকে উদ্ধার করার জন্য আমাকে শক্তি দাও আল্লাহ।

একজন অসহায় মানুষের সীমাহীন কল্পনা। সামর্থ্য নেই কিন্তু অন্যের সাহায্যে উদোম সাহসে ভরপুর। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার মাড়িয়ে হিম্মত হাঁটতে শুরু করলেন বাড়ির পথে। পরানের মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ বারবার উঁকি দিচ্ছে তাঁর মধ্যে। দুজনে সপ্তম পর্যন্ত একই শ্রেণির ছাত্র ছিল। সেই পরান এখন তাঁকে কখনো কখনো 'হিম্মতদা' বলে সম্বোধন করে। এ এক দুর্লভ সম্মান। আন্তরিক শ্রদ্ধা মিশ্রিত মানসিক নিবিড়তা। যদিও সমাজ সচেতন হিম্মত ভালো করেই জানেন, পারিবারিক জীবনের সমস্যা কীভাবে তাঁর সামনে এভারেস্ট পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ তাঁর সঙ্গে নেই। তাহলে কি কোনো উপায় নেই?

রাতের খাওয়া শেষ করে বিছানায় শুয়ে হিম্মত পরানের 'হিম্মতদা' সম্বোধনের মধ্যে আরও বেশি

করে ডুবে যেতে থাকলেন। হৃদয়ের গভীরে অভিনব অস্থিরতা শুরু হয়েছে। পরানের মেয়ে তাঁকে জেঠু বলে ডাকে। সম্পর্ক মিল করে দেখলে দুজনে যেন জ্ঞাতিভাই সম্পর্কের জালে গভীরভাবে জড়িত।

সকালে উঠে হিম্মত কাউকে কিছু না বলে পাশের গ্রামে রাকিবের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পুরনো জমিদারিত্ব খুইয়ে সুদ আর বন্ধকি কারবারে লোকটা নতুন করে নিজেকে গুছিয়ে নিতে সর্বদাই ব্যস্ত। তার কাছে সুদে টাকা নিয়ে আজও কেউ এক পয়সা ছাড় পায়নি। সবাই বলে, এ যুগের শাইলক।

হিম্মতকে দেখে তার প্রথম প্রশ্ন, "তারপর কেমন আছেন বলুন? বাড়ির সব খবর ভালো তো? অনেকদিন পর আমার এখানে এলেন।"

ঘোড়েল শাইলক ভালো করেই বুঝতে পারছে, লোকটা আজও পুরনো অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি, নিশ্চয় অন্যের দায় নিজের কাঁধে নিয়ে এখানে দরবার করতে এসেছেন। বিড়বিড় করে একটু গালমন্দ দিয়ে যুগোত্তীর্ণ শাইলকের গোপন মন্তব্য-যত পারিস ধম্ম-কম্ম করগে যা, তা না করে অন্যের দায় নিজের ঘাড় নিয়ে এভাবে ফকির হয়ে থাকার কোনো মানে হয় কি? অথচ সময় সুযোগ পেলে এঁড়ে তেজ দেখানোয় ব্যাটার জুড়ি মেলা ভার। কথা না রাখলে আবার...। এই করে তার বন্ধকি কারবারে এ 'ধজভঙ্গ' এঁড়ের জন্য বছরে অন্তত লাখখানেক টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।

কঠোর বাস্তব সত্য হলো, হিম্মতের কোনো আর্থিক শক্তি নেই কিন্তু প্রচুর লোকবল রয়েছে। পরোপকারে যেন এ যুগের দানবীর মহসিন, আমমানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনী বা বিশুর মতো শক্তিশালী। তুলনার মানদণ্ডে সে যেন যক্ষপুরীর ধনকুবের নয়-বরং অর্থের মানদণ্ডে যেটুকু সামনে আসতে পেরেছে, কেবলমাত্র সেটুকুই তার প্রাপ্তি।

সবকিছু শুনে হিম্মতকে বলল, "কোনোরকম ঝগড়ায় যেতে পারব না বাপু, তাতে বাপ-ঠাকুরদার সুনাম নষ্ট হবে। একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিতে পারলে অবশ্যই ভাবতে পারি। পরানের তো কিছুই নেই। না বলে দিলে ফেরত পাবার কোনো রাস্তা থাকবে না। তাছাড়া এখন আর এভাবে আলগা কারবার করি না, কারোর সঙ্গেই নয়।"

"পরান আমার বাল্যবন্ধু। মাত্র কয়েক হাজার টাকার জন্য ওর মেয়ের বিয়ে ভেঙে যেতে বসেছে। আমি যদি একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিই।"

"সেই ব্যবস্থাটুকু কী?"

"আমার বাস্তুভিটেটুকু তোমার নামে লিখে দিলাম। ফেরত নেওয়ার সময় রেজিস্ট্রি খরচও আমার। ভাবছি, এভাবে এ যাত্রায় পরান রেহাই পাক।"

"বেশ তো, বলছেন যখন...। কবে রেজিস্ট্রি করে দিতে পারবেন, তাই বলুন।"

"দুদিন পরে বুধবারের কথা ভাবছি।"

"টাকাটা কি আজ নিয়ে যাবেন?"

"তাহলে দাও।"

"আপনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, অবিশ্বাস করতে পারি কি?"

যেমন কথা তেমন কাজ। নির্দিষ্ট দিনে বাড়ির কাউকে না জানিয়ে রেজিস্ট্রি সেরে ফেললেন হিম্মত। ত্যাগের মন্ত্রে লোকটি তখন সীমাহীন আকাশের সমতুল্য হয়ে উঠেছে।

গোপন আনন্দের গভীরতা অনেক বেশি। তাই বোধহয় হিম্মতের মনের তলানিতে মানবিক দায় সারার ইমেজ দারুণভাবে মিশে যেতে থাকল, যেন তা তাঁর জীবনে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ। বরণের নতুন দৃষ্টান্ত নিয়েও বারবার ভাবছেন-স্বয়ং বিশ্বনবী তো অভাব আর বিরোধিতার অসীম ডালি মাথায় নিয়ে সারাজীবন গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সেই অভিনব কলকলে উৎসাহের বান হিম্মতের হৃদয়ের গভীরে। দুচোখের সামনে পরানের মেয়ের ছবি উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে। বাড়িতে গেলেই তার প্রথম সম্ভাষণ-ভালো আছেন জ্যেঠু? আপনি এলে বাবা খুব খুশি হবে।

পরের দিন প্রত্যুষে বারান্দায় বসে নামাজ সারার পরে শেষ প্রার্থনায় হিম্মতের বিশেষ আন্তরিক আকুতি-হে আল্লাহ, আমাকে আরও বেশি করে শক্তি দাও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর।

উঠানে দাঁড়িয়ে রুবির কানে তা আশঙ্কার ঘণ্টা হয়ে দেখা দিল। নিশ্চয় নতুন কোনো সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে লোকটা। ঘুম থেকে জেগে উঠে রকি বলল, "এসব কী বলছ মা? বাপিকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে পারলে না কেন?"

রুবি সেই সাহস দেখাতে পারেনি, কেবল কটমট চোখে একবার তাকাতে পেরেছিল হিম্মতের দিকে।

সকাল গড়িয়ে বিকেল। পড়ন্ত সূর্য ধীরগতিতে নামছে পশ্চিমের আকাশ বেয়ে। হিম্মতের মনে নতুন

অস্থিরতা। পায়ে পায়ে রকির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"বাপি, কিছু বলবে?"

"তোর সঙ্গে কিছু কথা ছিল রে।"

রকি বিছানা ছেড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

"ভাবছি, তোকে নিয়ে একবার পরানের বাড়িতে যাব।"

"বেশ তো চলো, কিন্তু কেন?"

"যেতে যেতে সব বলব তোকে।"

মাঝপথ পর্যন্ত হিম্মত নীরবে হেঁটে চললেন, পাশে পাশে রকি। তারপর হিম্মত ব্যাপারটা খুলে বললেন।

"মাকে একথা জানাতে পারলে না কেন?"

"ওরে, ও কিছুতেই রাজি হতো না।"

"রাকিব লোকটা যে ভালো নয় তা তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানো।"

"অত ভাবছিস কেন? পরানের এক বিশেষ আত্মীয় সামনের মাসে এ টাকা পরিশোধ করে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। তখন ফেরত দলিল করে নেব।"

রকির বুকের গভীর থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

"এভাবে দুর্ভাবনায় জড়িয়ে পড়লি যে?"

"ওইটুকুন বাস্তুভিটে, লোকটা সুযোগ পেয়ে কখন কী করে বসে।"

"এসব কী বলছিস রে তুই?" হিম্মতের গলায় হুমকির সুর।

তাতেই রকি ত্রস্ত।

"আমার ঠ্যালা সামলানোর ক্ষমতা ওই শাইলকের নেই রে। ওই রকম দশটা শাইলককে এক মুহূর্তে উপড়ে ফেলতে পারি।"

হিম্মতের মানসিক দৃঢ়তায় রকি চমকে না উঠে পারল না। বুঝল, নিঃশর্ত সেবা-প্রদানের মাধ্যমে যে লোকবল তার বাপির অনুকূলে এসেছে, তার গুরুত্ব অপরিসীম।

পরানের বাড়িতে চা-বিস্কুট খেয়ে পরানের মেয়েকে আশীর্বাদ করে হিম্মত রকিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "চল, দ্রুত বাড়িতে ফিরতে হবে। একটু পরে ঝুপঝুপ করে আবছা আঁধার নামবে। আমার আবার চোখ ধরে। পথ চলতে বারবার হোঁচট খেতে হয়।"

বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে হাঁপানির টানে হিম্মত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ত্রস্ত রকি বাপিকে জাপটে ধরে বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে সাইকেল নিয়ে ছুটল ডাক্তারের কাছে।

রুবি এসে বলল, "মাথাটা বালিশের উপর ভালো করে রাখো।"

"বুকের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছি গো, আমাকে একটু ধরো।"

রকি ফিরে এসে দেখল, মায়ের কোলে মাথা রেখে তার বাপি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

ডাক্তারবাবু দেখে বললেন, "একটা ইনজেকশন দিয়ে যাচ্ছি। এক্ষুণি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো খুব প্রয়োজন।"

গ্রামের সমবেত লোকজন সিদ্ধান্ত নিল, সকালে যেকোনো বড় নার্সিংহোমে নেওয়া হবে। রাত বাড়ছে পলে পলে। রকির বুকে তখন হিম্মতের স্মৃতির বন্যা ছাড়া কিছুই নেই। তা বাড়তে বাড়তে মনুমেন্টের সমতুল্য হয়ে উঠল।

প্রহরের পর প্রহর এগিয়ে চলেছে। বারান্দার একধারে বসে রুবি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভোরের শুরুতে আজানের মধুর সুর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ভরপুর। পাশের গ্রাম থেকে কাঁসরঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে নতুন দিনকে স্বাগত জানাতে। ব্যস্ত রকি ধস্ত মনে ওজু সেরে বাপের দ্রুত আরোগ্য কামনায় প্রত্যুষের নামাজ শেষ করে মোনাজাতে হাত তুলে অঝোরে কাঁদতে শুরু করল।

শাইলকতুল্য রাকিব মাঝরাতে এ খবর পেয়ে অচেনা আনন্দে ভীষণ উদ্বিগ্ন। সকাল না হতেই কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে হিম্মতের বাড়িতে উপস্থিত হতে কোনো কুণ্ঠা করল না। হেড কনস্টেবলকে তাগিদ দিল, "আর দেরি করো না ভাই, দ্রুত কাজটুকু সেরে ফেলো।"

কনস্টেবল সরকারি পদবাচ্য হলেও মানুষ-তার মধ্যে মানসিক সংকোচের ভারী বোঝা, ভিতরে ভিতরে তো দ্বন্দ্বে উদ্বেলিত। রাকিবের দ্বিতীয় তাগিদে বাধ্য হয়ে বলল, "শোনো রকি, এখন থেকে এ বাস্তুপুকুর তো-"

দুহাতের তালু মুখের সামনে মেলে ধরে রকির বুকভরা ফরিয়াদ, "আল্লাহ, আজও কেন তুমি রাকিবের শাইলকি মনোভাব দূর করতে পারলে না?"

পরম্পরা রক্ষার প্রতিজ্ঞা তখন রকির বুকের গভীরে দ্রুততালে দুর্বার হয়ে উঠছে। তাতেই ডুবতে থাকল সাগরের তলদেশে দক্ষ ডুবুরির মতো। হৃদয়ের আবেগে সাগর সেঁচে বাকি সব মণিমাণিক্য লাভের অপরিসীম উদ্বেলতা।

বিশ শতকী সাবেক বাংলার অন্যতম রাষ্ট্রনায়ক সোহরাওয়ার্দী

জহির-উল-ইসলাম

ব্রিটিশ শাসিত উপমহাদেশের শেষ অর্ধশতক অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস যথেষ্ট গৌরবোজ্জ্বল। এই সময় শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কায়কোবাদ, মুনশী মেহেরুল্লাহ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মৌলভী মুজীবর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ, মওলানা আকরম খাঁ, আব্বাসউদ্দীন আহমদ, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং রাজনীতি ও সমাজসেবায় নবাব আবদুল লতিফ, এ. কে. ফজলুল হক, নবাব সলীমুল্লাহ, খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী প্রমুখ মনীষীর সঙ্গে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যে অত্যুজ্জ্বল অবদান রেখেছেন তা তুলনারহিত।

সাবেক বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৬), মেহনতি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা ও 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৮৯২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মেদিনীপুর জেলার এক উচ্চশিক্ষিত ও প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অসংখ্য ইসলামাশ্রয়ী মনীষীর জন্ম নেওয়া এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জিয়াউদ্দীন আবুল নজিব আবদুল কা'হির ইবনে আবদুল্লাহ-যিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশোদ্ভূত বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত।

সোহরাওয়ার্দীর পিতা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী শিক্ষাজীবনের শুরুতে ঢাকা মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন মর্যাদাবান বিচারপতি হিসেবে গৌরবময় কর্মজীবন শুরু করেন। একসময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন নিযুক্ত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁর বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে 'স্যার' উপাধি প্রদান করা হয়েছিল। অন্যদিকে, জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আখতার বানু একজন বিদুষী মহিলা হিসেবে সমাজে অনন্য সম্মানের অধিকারী ছিলেন। প্রাথমিক

জীবনে তিনি তাঁর পিতা মওলানা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর কাছে ইংরেজি, উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষা রপ্ত করেন। ফারসি ভাষায় তিনি অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এই ভাষায় তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ 'আয়না-ই-ইবরাত' ও 'কাওকাব-ই দুররী' তৎকালীন পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছিল। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। সেই সঙ্গে উর্দু সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ পরীক্ষার প্রথম মহিলা পরীক্ষক হওয়ার বিরল গৌরব অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বড় ভাই শাহীদ সোহরাওয়ার্দীও সেকালের একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

এমন একটি অভিজাত ও আলোকিত পরিবারে বেড়ে ওঠা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়। পরবর্তীতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে তিনি বি.এস.সি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিলেত গমন করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ সম্পন্ন করেন। শিক্ষক-ছাত্র সবার প্রিয় সোহরাওয়ার্দী অক্সফোর্ড মজলিসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেখানে আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। একজন নামজাদা ব্যারিস্টার হিসেবে অতি স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। সেই সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধিও। তবে অর্থ ও ক্ষমতার মোহ তাঁকে সমাজবিমুখ বা আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্র-মানবে পরিণত করেনি। জীবনের এই সোনালী সময়ে তিনি আপন কওমের সমস্যা সমাধান ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় জড়িত থাকার অজুহাতে বহু মুসলমানকে আসামি করে জেলখানায় বন্দী করা হয়। তাদেরকে কারামুক্ত করার জন্য তিনি এককভাবে সর্বাত্মক আইনী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এই সময় একজন ফাঁসির আসামিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর মাত্র দু'ঘন্টা আগে নির্দোষ প্রমাণের মাধ্যমে মুক্ত করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর পেশাগত দক্ষতাকে জনসমক্ষে আরও উজ্জ্বল ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

দেশে ফিরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। একজন নামজাদা ব্যারিস্টার হিসেবে অতি স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। সেই সঙ্গে আর্থিক সমৃদ্ধিও। তবে অর্থ ও ক্ষমতার মোহ তাঁকে সমাজবিমুখ বা আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্র-মানবে পরিণত করেনি। জীবনের এই সোনালী সময়ে তিনি আপন কওমের সমস্যা সমাধান ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯২৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় জড়িত থাকার অজুহাতে বহু মুসলমানকে আসামি করে জেলখানায় বন্দী করা হয়।

কর্মজীবনে প্রবেশের মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন যে, কেবল ব্যারিস্টারি পেশার মাধ্যমে বঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই নিপীড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব-এই বোধ থেকেই ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উত্থান ঘটে।

তৎকালীন সময়ে বাংলার রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক উদারপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্যযোগ্য হয়ে উঠেছিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপলব্ধি করলেন বাংলার জমিনে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সত্তা গঠন করা আবশ্যক। তিনি তাঁর মনের এই অভিব্যক্তি অকপটে দেশবন্ধুর কাছে তুলে ধরলে দেশবন্ধু তাতে সম্মতি প্রদান করলেন। সোহরাওয়ার্দী ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে গঠিত 'স্বরাজ পার্টি'-তে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তাঁরা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামক এক চুক্তি করলেন। চুক্তি মোতাবেক সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের শতকরা

৫৬ ভাগ নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯২৪ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে 'স্বরাজ পার্টি' বিপুল ভোটে জয়লাভ করলে চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। উগ্র অসহিষ্ণু হিন্দুত্ববাদীদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কর্পোরেশনের প্রায় সব শূন্য পদে তাঁরা মুসলমানদের নিয়োগ দেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাত্র এক বছর পর ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন। এই সুযোগে অনুদার হিন্দু নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বাতিল করে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের উন্নয়নের ধারাকে অচিরেই রুদ্ধ করে দেন। এদিকে নেতৃত্বশূন্য হয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 'স্বরাজ পার্টি' থেকে সরে এসে শ্রমিক ও মজদুরদের সমন্বয়ে শ্রমিক সংগঠন গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯২৮ সালে সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সালের গোড়ার দিকে তাঁর নেতৃত্বে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি' গঠিত হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় ভারত শাসন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় এ. কে. ফজলুল হকের মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে শ্যামা-হক মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর মুসলিম লীগের খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রভাবশালী মন্ত্রী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৪৬ সালের ৩ জুলাই সোহরাওয়ার্দী সাবেক বাংলার প্রধানমন্ত্রী পদ অলংকৃত করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বক্ষণ অর্থাৎ ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা পার্টির মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মুসলিম লীগ ১২১ টি আসনের মধ্যে ১১৭টিতে বিপুল সংখ্যাধিক্যে বিজয় অর্জন করে। এই বছর কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তাঁর সরকার এই দাঙ্গা দমনে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বলে অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই সময় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর হাতে। সুতরাং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে তাঁর দিকে আঙুল তোলা যথার্থ নয় বলে অভিজ্ঞ মহলের দাবি।

উপমহাদেশের আজাদী আন্দোলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্যাপক অবদান রাখার পাশাপাশি বাংলার নিপীড়িত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। উপর্যুপরি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বাংলার প্রধান দুই সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদ বিনষ্ট হলে তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, এমনকি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অকুস্থলে ছুটে যেতেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার পাশাপাশি বিপন্ন মানবতার সেবায় সর্বশক্তি নিয়ে আত্মনিয়োগ করতেন। শুধু তাই নয়, ১৯৩১ সালে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবনের দুর্ভোগ লাঘবের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান তিনি।

হিন্দু-মুসলমান জনবিন্যাসের ভিত্তিতে দেশভাগের পক্ষে তাঁর সম্মতি ছিল না। সাবেক বাংলার সঙ্গে আসাম ও অবিভক্ত বিহারের বেশ কিছু বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে 'বৃহৎ বাংলা' নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন, স্বাধীন অখণ্ড বাংলা গঠিত না হলে বাংলার হিন্দুদের ভাষা ও কৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন করে তিনি তাঁর এই প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনার পথিকৃৎ উদারপ্রাণ সোহরাওয়ার্দী হিন্দুদের অভয় প্রদান করে সেদিনের সম্মেলনে ঘোষণা করেন, তারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করলে আমি তাদের সার্বিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বদা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। তিনি মনে করতেন, বাংলা যদি বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে টিকে থাকতে চায় তবে বাঙালি জাতিকে নিজের সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে নির্বাচনে তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে পরাজিত হন। নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে এইসময় তিনি ঢাকা না গিয়ে বেশ কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। এখানে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি মিশনে যোগদান করে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যান।

অবশেষে ১৯৪৯ সালে তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় চলে যান। ওখানে অবস্থানকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সংগঠনকে মজবুত করার কাজে আত্মনিয়োগ

করেন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্টের কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। উক্ত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই তেরো মাস তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ তাঁকে বেশিদিন এই পদে অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান সরকার প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিল।

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে সংশ্লিষ্ট সরকার নানান অভিযোগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনকে বিদ্ধস্ত করে তোলে। অবশেষে ১৯৬২ সালে সরকার তাঁকে জেলে পাঠায়। ছয় মাস জেল খাটার পর হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তিনি জেলমুক্ত হন। এইসময় উন্নত চিকিৎসার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে ইউরোপে পাঠানো হয়। জুরিখ, লণ্ডন ও জার্মানিতে চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পথে ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। সেখান থেকে তাঁর লাশ বাংলাদেশের মাটিতে এনে জানাযার নামাজ শেষে ৮ ডিসেম্বর ঢাকা হাইকোর্টের প্রাঙ্গণে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর জানাযায় অশ্রুসিক্ত নয়নে লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে তিনি নিছকই একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রকৃত জননায়কও।

তথ্যঋণ:

১. দেওয়ান আবদুল হামিদ, যুগের নকীব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৮৭, ঢাকা-২।

২. বিবিধ সহযোগী মাধ্যম।

ছোটগল্প

কবর

শেখ নজরুল ইসলাম

১

গভীর অন্ধকার। আরও গভীর তার নীরবতা। আজ কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে আঁধার। আকাশে চাঁদ নেই, তারার আলোও যেন ভয়ে মুখ লুকিয়েছে। চারদিক নিঝুম। এমন নিস্তব্ধতা, যেন পৃথিবী নিজেই শ্বাস আটকে রেখেছে। মধ্যরাতের এই গভীর নীরবতা বাতাসও মেনে নিয়েছে। সে-ও আজ মাঝরাতে কেমন নিঃসাড়, ক্লান্ত, স্তব্ধ; বোধহয় কিছুটা অসহায়ও! যেন অদৃশ্য কোনো আতঙ্ক তাকে থামিয়ে রেখেছে। আঁধারে গাছের পাতা নড়ে না, শুকনো ঘাসের ডগায়ও কোনো সাড়া নেই। দূরের বাঁশঝাড়ে জমাট অন্ধকার স্তূপ হয়ে বসে আছে, আর ভেজা মাটির গন্ধ নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

এই স্তব্ধতার ভেতর, গভীর নীরবতার মাঝে হঠাৎই পাশের জমির কোণ থেকে একটি পরিচিত ডাক আছড়ে পড়ে- লম্বা, টানটান, কানে বিঁধে যাওয়া শেয়ালের ডাক। নিস্তব্ধতা মুহূর্তেই ভেঙে খানখান। অন্ধকারের বুক চিরে উঠে এল সেই শব্দ, যেন রাতের গোপন ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

এই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়ে গর্বিত শেয়াল তখন লেজ নাড়ছে। তার দেহ সতর্ক, কিন্তু অস্থির নয়; বরং যেন সে এই রাতেরই এক স্বাভাবিক বাসিন্দা। গ্রীবা ধীরে ধীরে বাঁকিয়ে সে এদিক-ওদিক তাকায়। কখনও অন্ধকারের গভীরে, কখনও মাটির দিকে, আবার কখনও বা দূরের নিঃশব্দ প্রান্তরের দিকে। তার চোখ দুটি অস্বাভাবিক দীপ্ত, গভীর আর জ্বলন্ত; যেন সেই চোখের ভেতর লুকিয়ে আছে কোনো অদৃশ্য আগুন। অন্ধকারও যেন তার দৃষ্টির সামনে সরে যেতে চাইছে।

শেয়ালের সেই ডাক অন্ধকার চিরে প্রবেশ করে এই কবরডাঙায়, যেখানে গভীর রাতের আঁধারে ভয়াল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শেয়ালের ডাকে সেই ভয়াল নিস্তব্ধতার মাঝে যেন ভূকম্পন অনুভব করল কবরস্থানটি। ভগ্ন, অর্ধভগ্ন, সম্পূর্ণ কবরগুলিও যেন নড়ে উঠল অদ্ভুত এক শিহরণে। পরিচিত এক আতঙ্কে। এই আতঙ্কের ভাষা নেই, কায়া নেই; বিমূর্ত এক অতিলৌকিক স্তরে এর যাওয়া-আসা।

মনে হয়, এই বুঝি কবরের স্যাঁতসেঁতে গর্ভ ফেটে একে একে উঠে দাঁড়াবে তারা। মাটির ভেতর চাপা

পড়ে থাকা অদৃশ্য দেহগুলি ধীরে ধীরে সাড়া দেবে, নিঃশব্দে, শীতল এক তাড়নায়। তাতে থাকবে না রক্ত-মাংসের কোনো উষ্ণ চিহ্ন। থাকবে শুধু শুকনো হাড়ের কড়মড়ে গঠন আর সময়ের গহ্বরে ক্ষয়ে যাওয়া শূন্য অবয়ব।

প্রথমে শোনা যাবে মৃদু শব্দ- খচ্... খট্... কড়মড়... যেন মাটির তলা থেকে হাড়গুলি একে অপরের সঙ্গে ঠেকে ঠেকে উঠছে। সেই ক্ষীণ শব্দ ক্রমে ঘন হবে, ভারী হবে। তারপর একসময় নীরবতার বুক চিরে ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। স্তব্ধ রাত তখন আর নিঃশব্দ থাকবে না; হাড়ের ঠোকাঠুকির অদ্ভুত প্রতিধ্বনিতে নিস্তব্ধতা একসময় কলরবে পরিণত হবে। কিন্তু সে কলরব জীবনের নয়, মৃত্যুর।

ধীরে ধীরে যেন কবরের বুক উঁচু হয়ে উঠবে। মাটি ফেটে ফুঁড়ে বের হবে ফ্যাকাশে অস্থি, কঙ্কালসার আঙুল। তারপর শূন্য চোখের গহ্বর। তাদের কোনো মুখ নেই, তবু যেন নীরব আর্তনাদ ভেসে আসবে। বাতাস হঠাৎ ঠান্ডা হয়ে উঠবে, ভারী, স্যাঁতসেঁতে; যেন অদৃশ্য কারও নিশ্বাস চারপাশে জমাট বেঁধেছে।

তারপর এক সময় মনে হবে, তারা মাটির ওপর নয়, শূন্যে ঝুলে আছে। কঙ্কালগুলি ধীরে ধীরে দুলছে, অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো। তাদের ফাঁপা পাঁজরের ফাঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে শোঁ শোঁ শব্দ তুলছে। শূন্য চোখের গহ্বরগুলো যেন অন্ধকারের মধ্যেই তাকিয়ে আছে- কারও প্রতীক্ষায়, কোনো অজানা আহ্বানে।

চারদিকের অন্ধকার তখন আর নিছক অন্ধকার থাকে না; সে হয়ে ওঠে জীবন্ত, সজাগ, ভৌতিক। মনে হয়, মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা সব নীরবতা, সব বিস্মৃত দেহ, সব অজানা মৃত্যু- একসঙ্গে জেগে উঠেছে। আর সেই জাগরণের শব্দে রাতের গভীর নীরবতা ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে এক অদ্ভুত, শীতল, ভয়াল উপস্থিতিতে। যেখানে জীবন নেই, তবু অদৃশ্য সঞ্চরণ থেমে নেই।

কৃষ্ণপক্ষের এই গভীর অন্ধকার, নিঃশব্দ রাত অচিরেই যেন মেলার রূপ নেবে। মাংসহীন দেহের মেলা। এ মেলা মিলনের, এ মিলন বিচ্ছেদের! কেননা, কোলাকুলি পর্ব শেষ করে কঙ্কালগুলি আবার যে যার গৃহে প্রবেশ করবে। পুনরায় অনন্ত ঘুমের তোড়জোড়।

তখন কবরস্থান জুড়ে আবার সেই নীরবতা। গভীর অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে রাত। চারদিক নিঝুম। বাধ্য কবরগুলি আবারও নিঃসাড়। এই ঘন আঁধার মধ্যরাতে হঠাৎই পশ্চিম দিকের পুকুর থেকে এক ঝলক আলো কবরস্থানের মাঝের বড়ো তেঁতুলগাছটিতে এসে পড়ল। চোখের পলক ফেলার সময়টুকু মাত্র। আবার অন্ধকার।

খসখস শব্দ- মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতার।

ওরা উঠল পুকুরপাড় থেকে। টর্চের মুখটা আরও একবার সোজা করল বড়ো তেঁতুলগাছটির দিকে। পাশেই নরম মাটির কবরটি। ভিজে মাটির গন্ধ ওরা পুকুরপাড় থেকেই অনুভব করল। দু-চোখ বন্ধ করে অদ্ভুত রকমের পরিচিত একধরনের ঘ্রাণও গ্রহণ করল ওরা।

লোকমান ও কামরান সন্তর্পণে এগিয়ে এল তেঁতুলগাছের পাশে, যেখানে কাঁচা কবরটি রয়েছে। লোকমানের হাতে বড়ো টর্চ, আর কামরানের হাতে ছোট একটি শাবল ও চটের থলে। ওরা দু-জন একবার চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিল। যদিও এই ঘন অন্ধকারে কিছু দেখা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু অভ্যাসবশত বা সংস্কারবশত ওরা এমন করে- প্রতিবারই।

চারদিক দেখে ওরা আশ্বস্ত হলো। এবার দু-জন একে অপরের দিকে দৃষ্টি রাখে। তীক্ষ্ণভাবে। কেউ কারও চোখের দৃষ্টির হিংস্রতা দেখতে পাচ্ছে না, অথচ অনুভবে ওরা পারদর্শী। এভাবে অল্প কিছু সময় পার হলো।

লোকমান তার তীক্ষ্ণ আঙুলে টর্চের বোতাম টিপল। মুহূর্তেই ঘন অন্ধকার চিরে এক সরু, সোজা আলোর রেখা ছুটে গেল সামনে। সেই তীক্ষ্ণ আলো গিয়ে স্থির হয়ে পড়ল অদূরের কবরটির ওপর। ভেজা মাটির ঢিবিটা আলোয় ধরা পড়তেই যেন আরও অস্বাভাবিক, আরও ভারী মনে হলো। যেন ওখানে মাটি নয়, চাপা পড়ে আছে কোনো গোপন নিঃশ্বাস।

আলোর তীব্রতা কবরের আচ্ছাদনের ওপর স্থির থেকে ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে যেতে চাইছে। যেন মাটির স্তর ভেদ করে পৌঁছাতে চাইছে ভেতরের গুমট, আবদ্ধ অন্ধকারে। চারপাশের স্যাঁতসেঁতে নীরবতা আরও ঘন হয়ে উঠল। বাতাসে কাঁচা মাটির গন্ধ, সাথে এক ধরনের শীতল, দমবন্ধ করা স্থিরতা। যেন এই কবরের ভেতরে সময় থেমে আছে।

লোকমানের টর্চের সেই আলো কেবল মাটির ওপর নয়, নিচের স্তব্ধ অন্ধকারেও ছড়িয়ে পড়ছে। যেখানে

সংকীর্ণ, শ্বাসরুদ্ধ এক সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিথর হয়ে শুয়ে আছে সাদা কাফনে মোড়া তাজা একটি লাশ। কাফনের কাপড়টি নিস্তেজ, নিঃশব্দ, অথচ তার ভাঁজে জমে আছে নতুন মৃত্যুর ঠান্ডা ভার। চারদিকের গুমোট অন্ধকার যেন তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। নির্বাক, মাটির নিচে বন্দি রয়েছে অসহায় লাশটি।

কামরানের হাতের শাবল ততক্ষণে প্রস্তুত!

ঝপ করে বসে পড়ল লোকমান ও কামরান- কবরটির উত্তর দিকে। লোকমানের দেখানো টর্চের আলোয় কামরান শাবল দিয়ে কবর খুঁড়তে শুরু করল। ক্ষিপ্র গতিতে।

সদ্য দেওয়া কবর। জিনকরা গ্রামের একজন মহিলার কবর এটি। আজই জোহরের পর মাটি দেওয়া হয়। প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের ফতেপুর গ্রামের লোকমান ও কামরান এ খবর রেখেছে। তখনই অভিযানের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়ে যায়।

ভিজে মাটিতে শাবল চালাতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না কামরানের। বরং বেশির ভাগ মাটিই সে হাতে গোলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে। কাদামাটি মুহূর্তে নেতিয়ে পড়ে ঘাসের ওপর। এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কবরের একটা অংশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু পুব-পশ্চিমে রাখা টুকরো বাঁশের কাঠামোটি। কাঠামোর উপরে পাতলা খড়ের আচ্ছাদন ভিজে মাটির সাথেই উঠে গেছে। বাঁশগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে রাখে কামরান।

এতক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে ওরা উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল পুকুরটির দিকে। কামরান পুকুরের পানিতে কাদামাখা হাত ডুবাল। লোকমান মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে ওকে সাহায্য করে। হাত ধুয়ে ওরা উঠে এল আবার কবরটির কাছে। সময় নষ্ট না করে ওরা একে একে নামল কবরে! বেশ পারদর্শিতার সাথেই নামল, মনে হয় এ কাজে ওরা কত অভিজ্ঞ!

জমির কোণ থেকে শেয়ালটা আবার ডেকে উঠল।

কবরের দক্ষিণ দিকে লাশের পা দুটি কাফন সমেত ধরল লোকমান। কামরান গেল উত্তরে মাথার কাছে। অনায়াসে ওরা লাশ নিয়ে কবর থেকে উঠল। লাশ মাটিতে ঘাসের ওপর রাখল ওরা। এই মুহূর্তে ঘাসের মধ্যেও যেন একধরনের শিহরণ জেগে ওঠে। আতঙ্কে ওরাও যেন কুঁকড়ে যায়। পাশের তেঁতুলগাছটা থেকে একটি পেঁচা ক্রমাগত এদিকে তাকিয়ে সমস্ত কাণ্ডটা দেখে চলেছে। সে-ও দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করছে সে-ও।

লাশ এখন কবর থেকে বাইরে আনা হয়েছে। এবার কাজ কাফন খোলা। সেটাও নিমেষে সম্পন্ন করল লোকমান ও কামরান। টর্চের আলোয় স্পষ্ট একজন যুবতী নারীর নিরাবরণ দেহ। দীর্ঘ খোলা ঘন চুল এখনো পর্যন্ত ভিজে। ওরা তাকিয়ে থাকে। চিত হয়ে থাকা মৃত যুবতীর দেহের দিকে দেখতে দেখতে অদ্ভুত একধরনের নেশা লাগে ওদের দু-জনের।

এ এক বিরল ক্ষুধার নেশা!

চটের পুরোনো থলেটার মুখ ধীরে ধীরে খুলল লোকমান। হাত ঢুকিয়ে সে বের করল একটি বাঁকানো হাঁসুয়া। হাঁসুয়াটি ধারালো, চকচকে; বহু অন্ধকার রাতের নীরব সাক্ষী। টর্চের আলোয় ধাতব ধারটা এক মুহূর্ত ঝলসে উঠতেই চারপাশের পরিবেশ আরও শীতল, আরও ভারী হয়ে উঠল।

এবার কামরান নিঃশব্দে টর্চটি হাতে তুলে নিল। তার হাত কাঁপছে না এতটুকু। টর্চের আলো স্থির রাখার এক অদ্ভুত চেষ্টা তার চোখে স্পষ্ট। টর্চের সরু আলোর রেখা যুবতী লাশের ওপর স্থির হয়ে রইল। লোকমান এক মুহূর্ত থামল। তার নিঃশ্বাস ভারী, চোখ স্থির, মুখে কোনো অনুভূতির চিহ্ন নেই। শুধু এক নিষ্ঠুর, যান্ত্রিক স্থিরতা। তারপর হঠাৎই সে হাঁসুয়াটির হাতল শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। পরের মুহূর্তেই নিস্তব্ধতা চিরে উঠল ধাতব এক শীতল শব্দ।

হাঁসুয়ার ধার যুবতী লাশের ওপর নেমে এল নির্দয়ভাবে, দ্রুত, কোনো দ্বিধা ছাড়াই। যেন বহুবার অনুশীলিত এক নিষ্ঠুর অভ্যাস। পাশে কাফনের সাদা স্তর অল্প আলোয় কেঁপে উঠল। লোকমানের হাত থামল না একবারও। তার গতিবিধি ছিল অদ্ভুতভাবে স্থির, ঠান্ডা, অনুভূতিহীন। যেন সে কোনো মানুষ নয়, বরং অন্ধকারেরই এক নির্বিকার কর্মী।

কামরানের ধরা টর্চের আলো কাঁপতে কাঁপতে সেই দৃশ্যকে আরও ভয়াবহ করে তুলছিল। আলো কখনও হাঁসুয়ার ধার ছুঁয়ে ঝলসে উঠছে, কখনও লাশের বীভৎস গহ্বরের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। চারপাশের বাতাস যেন আরও ভারী হয়ে উঠেছে।

নিমেষের মধ্যেই সব শেষ। লোকমানের হাত ধীরে থামল। যুবতী লাশটিকে কয়েক টুকরো করে ফেলেছে সে! কিন্তু তার মুখে কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো অনুশোচনা নেই। কেবল শীতল স্থিরতা।

শেয়ালটা মনে হয় আবারও একবার ডেকে উঠল।

ওরা দু-জন যখন ফতেপুরে ওদের বাড়িতে এসে পৌঁছায়, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ফজরের আজান শোনা যাবে। চটের থলে থেকে মাংসের টুকরোগুলো বের করল লোকমান ও কামরান। তারপর নির্দিষ্ট হাঁড়িতে সেগুলি রান্না করে ওরা। মসজিদ থেকে তখন ফজরের আজান ভেসে আসছিল।

এদিকে দুটি স্টিলের থালা নিয়ে মাঝে হাঁড়িটি রেখে পরম তৃপ্তিতে বসেছে দুই নরখাদক! অত্যন্ত খিদে তাদের!

লোকমান ও কামরান দুই ভাই। যমজ। বয়স বত্রিশ। ফতেপুর গ্রামে দুই ভাই থাকে। আব্বা-মা বহুদিন হলো গত হয়েছেন। এদের আব্বা-মা যথেষ্ট সামাজিক থাকলেও, দুই ভাই প্রতিবেশীদের কাছে যেন কেমন! কারও সাথে মেশে না, কথা বলে না। সর্বদাই ঘরের মধ্যে থাকে। 'ওরা ওদের মতোই বাঁচে'- এই ভেবে প্রতিবেশীরাও খুব একটা গুরুত্ব দেয় না ওদের।

লোকমান ও কামরান দুই যমজ ভাইয়ের অস্বাভাবিক এক বাতিক! এই বাতিকের শুরুটা হয়েছিল অনেক আগেই। এখন ওদের এই বাতিক ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেটি হলো- কবর থেকে লাশ চুরি করে খাওয়া! এ এক অসম্ভব রকমের খিদে ওদের। এই নেশা ওদের অনেকদিনের; আব্বা-মা মারা যাবার কিছু মাস পর থেকেই। নরমাংসের স্বাদ অদ্ভুত একধরনের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে ওদের শরীর-মনে।

এ পর্যন্ত একশোরও বেশি কবর খুঁড়ে মরদেহ খেয়েছে এই দুই ভাই। গভীর রাতে চলে তাদের এই অভিযান। নরখাদকের দুঃসাহসিক অভিযান। অনেক অনেক দূরের কবরস্থান থেকে তারা লাশ তুলে এনেছে। এ নিয়ে চাঞ্চল্যও ছড়িয়েছে নানা দিকে। দিনের আলোতে লাশের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ দেখে আতঙ্ক ও বিস্ময় তাড়া করেছে মানুষের মনে। নানা স্থানে কবর পাহারারও ব্যবস্থা করেছে কোনো কোনো গ্রাম বা পাড়া। কিন্তু নরখাদক দুই ভাই ওদের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে যায়।

একটি লাশ রান্না করে ছয়-সাত দিন ধরে ওরা খায়। সেটি শেষ হবার পর চলে ওদের নতুন লাশের সন্ধান। পৃথিবীর ইতিহাসে এই বিরল মানুষ খুব বেশি নেই। থাকার কথাও নয়। সৃষ্টির আদিমদের কথা আমাদের

এ পর্যন্ত একশোরও বেশি কবর খুঁড়ে মরদেহ খেয়েছে এই দুই ভাই। গভীর রাতে চলে তাদের এই অভিযান। নরখাদকের দুঃসাহসিক অভিযান। অনেক অনেক দূরের কবরস্থান থেকে তারা লাশ তুলে এনেছে। এ নিয়ে চাঞ্চল্যও ছড়িয়েছে নানা দিকে। দিনের আলোতে লাশের ছিন্নভিন্ন দেহাংশ দেখে আতঙ্ক ও বিস্ময় তাড়া করেছে মানুষের মনে। নানা স্থানে কবর পাহারারও ব্যবস্থা করেছে কোনো কোনো গ্রাম বা পাড়া। কিন্তু নরখাদক দুই ভাই ওদের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে যায়।

জানার অতীত; যতটাই তত্ত্বে পেয়েছি, তা অনুমানই বলা যায়- সূত্র ধরে মূলে পৌঁছানো! সেই আদিম মানুষরা নিজেদেরই মাংস খেত এমন তথ্য দিতেও কেউ সাহস করেন না। কেননা, প্রমাণ হাতের কাছে নেই।

লোকমান ও কামরান সৃষ্টির কোন স্তরের আমাদের জানা নেই; কিন্তু তারা ভূমিষ্ঠ আধুনিক যুগের সভ্য মাটিতে। এরা মানুষের মাংস খায়; বেশ তৃপ্তি করেই ওদের উদরের জ্বালা প্রশমিত করে। দিনের আলোতে যা করা যায় না, তা ওরা রাতের অন্ধকারে নির্বিঘ্নে ঘটায়।

২

সেদিন ওরা দুই ভাই খুনডাঙার কবরস্থান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আসরের পর ওখানে একটা শিশুকে কবর দেওয়া হয়েছে। রাতের বেলা একটু আগে থেকেই দুজন বের হয়। অনেক দূরের পথ, প্রায় আট কিলোমিটার। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে ওরা ওদের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

বেশ দ্রুত হাঁটছিল ওরা। খুনডাঙা যেতে হলে দ্বারকেশ্বর নদ পার হতে হবে। বেশির ভাগটাই বালি, মাঝে অল্প স্থান জুড়ে জল। তাও হাঁটু পর্যন্ত। স্বাচ্ছন্দ্যেই

দ্বারকেশ্বর নদ পার হলো ওরা। দ্বারকেশ্বরের ওপারে প্রথম গ্রামের মূল রাস্তা দিয়ে না গিয়ে জমির আল ধরে যাচ্ছিল ওরা। গ্রামের রাস্তায় কেউ টের পাবে বলে এই পন্থা অবলম্বন।

এইভাবে ওরা খুনডাঙার কবরস্থানে এসে পৌঁছাল। যথারীতি সদ্য দেওয়া কবরের কাছে এসে শুরু হলো ওদের কর্ম। শিশুর লাশ কবর থেকে তুলে এনে ধারালো অস্ত্রটি ব্যবহার করতে যাবে, এমন সময় চারদিক আলোয় ভরে উঠল! লোকমান ও কামরান তাকাল বিস্ময়ে।

আদালতে জজের সামনে দাঁড়িয়ে লোকমান ও কামরান ওদের কর্মের কথা স্বীকার করে। কোথায়, কীভাবে তারা লাশ চুরি করত তার পরিসংখ্যানও ঠিকঠাক জানায়। বিচারে লোকমান ও কামরানের দু-বছর কারাবাসের সাজা ঘোষণা হয়। সাজা শুনে ওরা দাঁড়িয়ে থাকে নির্লিপ্তভাবে। জেলের বিশেষ একটি সেলে নরখাদক দুই ভাইকে রাখা হয়।

ইতিমধ্যে ওরা অন্তকরণ থেকে উপলব্ধি করে, এতদিন তারা যা করেছে, সেটা আসলে ঘোর পাপকর্ম। জেলে বসেই ওরা কসম করে, জীবনে নর-লাশ আর খাবে না! এই সব্বনেশে খিদে থেকে ওরা মুক্ত হবে। কঠোর প্রতিজ্ঞা করে ওরা।

জেলে অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে খুব বেশি মিশতে পারে না ওরা। বন্দিরাও ওদের অদ্ভুত ও বিস্ময়কর নেশার কথা জানতে পেরে ওদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলারই চেষ্টা করে সর্বদা। কিন্তু ওরা দুই ভাই নিশ্চিত, জেল খেটে ওদের পুরোনো অভ্যাস বদলে গেছে। ওরা আর নরখাদক নয়। কই, এতদিন জেলে থেকে নর-লাশ খাবার ইচ্ছে তো আর জাগছে না!

এভাবে দু-বছর পেরিয়ে যায়। দু-বছর পর জেল থেকে ছাড়া পায় লোকমান ও কামরান। উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বস্তির নিশ্বাস নেয় ওরা।

লোকমান ও কামরান হেঁটেই বাড়ি ফিরছিল। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে ওরা, তাই ওদের মনে আজ দারুণ আনন্দ। পিছনের বীভৎস মাখা জীবন থেকে ওরা মুক্তি পেয়েছে, তাই ওদের হৃদয় আজ উৎফুল্লে ভরা।

গোবিন্দপুরের পাকা রাস্তা ধরে হাঁটছিল ওরা। রাস্তার পশ্চিম দিকেই একটি কবরস্থান। সেখানে সদ্য দেওয়া একটি কবর। যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ওরা। বিকাল গড়িয়ে তখন সন্ধ্যা। অদ্ভুত পরিচিত একটা গন্ধ ওদের নাকে আসে। তাকায় একে অপরের দিকে। তারপর লোকমান ও কামরান এগিয়ে যায় ভিজে মাটির কবরটির দিকে- মন্ত্রমুগ্ধের মতো।

প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ওদের। প্রচণ্ড খিদে। আকুলভাবে দু-হাত দিয়ে কবর খুঁড়তে লাগল ওরা দু-জন!

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে প্রয়োজন স্টার্টআপ কালচার

আলি মোস্তাফা

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজকে নিয়ে যখনই আলোচনা হয়, তখন প্রায় একই কয়েকটি শব্দ বারবার ফিরে আসে - পিছিয়ে পড়া, বেকারত্ব, শিক্ষার ঘাটতি, অনুন্নয়ন, প্রান্তিকতা, বঞ্চনা। এই শব্দগুলির অনেকটাই বাস্তবতার ভিতরে দাঁড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু সমস্যার ভাষা যত স্পষ্ট, সমাধানের ভাষা তত জোরালো নয়। আমাদের জনপরিসরে এখনো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় "চাকরি পাওয়া"। অথচ একটি সমাজের প্রকৃত শক্তি শুধু কতজন চাকরি পেল, তা দিয়ে মাপা যায় না; মাপা যায় কতজন কাজ তৈরি করল, কতজন বাজার গড়ল, কতজন অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজের পায়ে দাঁড়াল, আর কতজন নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জীবনেও অর্থনৈতিক গতি আনল, তা দিয়ে।

এই কারণেই আজ পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের সামনে একটি জরুরি প্রশ্ন দাঁড়িয়ে আছে, আমরা কি কেবল চাকরিপ্রার্থী সমাজ হয়ে থাকব, না কি উদ্যোক্তা সমাজেও পরিণত হব? একটি বড় জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ কি কেবল চাকরির অপেক্ষার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? শুধু আবেদনপত্র, পরীক্ষা, মেধাতালিকা, নিয়োগের প্রতিশ্রুতি আর দীর্ঘ প্রতীক্ষা দিয়ে কি একটি সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ সম্ভব?

না, সম্ভব নয়। আর এই "সম্ভব নয়" কথাটিই আজ নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে স্টার্টআপ কালচার নিয়ে কথা বলার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। কারণ সময় বদলেছে, বাজার বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, কাজের ধরন বদলেছে; বদলানো দরকার আমাদের অর্থনৈতিক কল্পনাও।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৭ শতাংশ। মুর্শিদাবাদে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, মালদায় অর্ধেকের বেশি,

উত্তর দিনাজপুরে প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে গেলে মুসলিম সমাজকে আলাদা করে দেখা যায় না; এই সমাজের অগ্রগতি মানেই রাজ্যের অগ্রগতির একটি বড় অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এত বড় জনসমাজ এখনও প্রধানত অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল- ছোট দোকান, অটো চালানো, হকারি, টেইলারিং, নির্মাণশ্রম, গ্যারেজ, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি, মাছ, ফল, সবজি, ঘরোয়া উৎপাদন, ছোট পরিষেবা। এই সব ক্ষেত্রেই পরিশ্রম আছে, অভিজ্ঞতা আছে, বেঁচে থাকার জেদ আছে; নেই শুধু সেই রূপান্তর, যা কাজকে বড় করে, আয়কে স্থায়ী এবং বৃহৎ মূলধনে রূপান্তর করে, আর শ্রমকে ব্যবসায়িক শক্তিতে পরিণত করে।

এই জায়গাটাই আমাদের বুঝতে হবে। মুসলিম সমাজে উদ্যোগের বীজ নেই, এ কথা ভুল। বরং উদ্যোগ আছে, কিন্তু সংগঠিত উদ্যোক্তা-সংস্কৃতি নেই। দোকান আছে, কিন্তু ব্র্যান্ড নেই। পণ্য আছে, কিন্তু বাজারচিন্তা নেই। দক্ষতা আছে, কিন্তু ডিজিটাল উপস্থিতি নেই। গ্রাহক আছে, কিন্তু গ্রাহকের তথ্য নেই। কাজ আছে, কিন্তু কাজকে বাড়িয়ে তোলার কৌশল নেই। একজন দর্জি বছরের পর বছর মহল্লার ভরসা হয়ে থাকেন, কিন্তু মহল্লার বাইরে তাঁর কোনো পরিচয় গড়ে ওঠে না। একজন মহিলা অসাধারণ আচার, সেমাই, কেক বা মশলা বানান, কিন্তু তাঁর পণ্য আত্মীয়তার সীমানা পেরোয় না। একজন কুক ভালো বিরিয়ানী বানাতে পারেন, কিন্তু তাঁর বিরিয়ানী এলাকার বাইরে থেকে পাওয়ার উপায় নেই। একজন তরুণ মোবাইল সারাতে পারে, কিন্তু সে এখনও ভাবেনি তার কাজকে হোম-সার্ভিস, অনলাইন বুকিং বা নিয়মিত সাবস্ক্রিপশন মডেলে নিয়ে যাওয়া যায়। অর্থাৎ সমস্যা দক্ষতার অভাবে নয়; সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতায়।

এখানেই স্টার্টআপ কালচার জরুরি হয়ে ওঠে। স্টার্টআপ মানে কেবল কাচঘেরা অফিস, মোটা বিনিয়োগ, ইংরেজি প্রেজেন্টেশন বা সফটওয়্যার কোম্পানি নয়। স্টার্টআপ মানে একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার কার্যকর, নতুন, এবং টেকসই সমাধান তৈরি করা। একটি গ্রামের কৃষক যদি ন্যায্য দামে বাজার না পান, তাকে সরাসরি শহরের ক্রেতার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ স্টার্টআপ। মুসলিম মহিলাদের হোম-বেইজড পণ্যকে ডিজিটাল বাজারে তোলার ব্যবস্থা স্টার্টআপ। মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্থানীয় ভাষাভিত্তিক স্কিল-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম স্টার্টআপ। ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন অর্ডার, প্যাকেজিং ও ডেলিভারি সাপোর্টও স্টার্টআপ। ঘরে বসে সমস্ত পণ্য ও পরিষেবা দেওয়াও স্টার্টআপ।

আমরা যদি একটু বড় পরিসরে দেখি, তা হলে বোঝা যাবে কেন এই কথা এখন আরও জরুরি। আজকের ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ বা এমএসএমই খাতে ৬ কোটিরও বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, এবং এই খাতে ১১ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং জিডিপির প্রায় ২৮.৭৭% দখল করে আছে। অর্থাৎ বড় শিল্প একমাত্র পথ নয়; ছোট উদ্যোগও অর্থনীতির মেরুদণ্ড হতে পারে। আবার কেন্দ্রের স্টার্টআপ-সংক্রান্ত নীতির ফলে দেশে এক লক্ষেরও বেশি নিবন্ধিত স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে। এই প্রবণতা প্রমাণ করে, উদ্যোগের ভাষা বদলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই নতুন অর্থনৈতিক জোয়ারে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম তরুণ-তরুণীরা কোথায়? তারা কি দর্শক হয়ে থাকবে, না অংশগ্রহণকারী হবে?

সমস্যা হচ্ছে, আমাদের সমাজে এখনও "চাকরি"কে নিরাপত্তার একমাত্র প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক কারণ আছে। দীর্ঘদিন প্রান্তিকতায় থাকা মানুষ ঝুঁকি নিতে ভয় পাবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিরাপত্তার সন্ধান যদি সৃজনশীলতাকে মেরে ফেলে, তবে সমাজ ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে যায়। আজ সরকারি চাকরি সীমিত, বেসরকারি চাকরির নিশ্চয়তা কম, আর অনিয়মিত শ্রমবাজারে আয় ভীষণ অনিশ্চিত। ফলে শুধু চাকরির স্বপ্ন দেখানো এখন অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত সান্ত্বনা। তার পাশাপাশি কাজ তৈরি করার পথও খুলতে হবে।

এই মানসিক বাঁকটাই সবচেয়ে কঠিন। কারণ স্টার্টআপ কালচার আসলে ব্যবসার আগে সংস্কৃতির প্রশ্ন। পরিবারে সন্তানকে কী শেখানো হচ্ছে? শুধু পরীক্ষায় নম্বর তোলার কৌশল, না কি সমস্যা দেখে সমাধান ভাবার ক্ষমতা? স্কুলে কি কেবল সিলেবাস শেষ হচ্ছে, না কি যোগাযোগ, নেতৃত্ব, দলগত কাজ, আর্থিক শৃঙ্খলা, ডিজিটাল দক্ষতা, বাজার সম্পর্কে বোঝাপড়া, এসবও শেখানো হচ্ছে? ব্যর্থতাকে কি অপমান বলে দেখা হচ্ছে, না কি অভিজ্ঞতা বলে? যতদিন না এই প্রশ্নগুলির উত্তর বদলাবে, ততদিন স্টার্টআপ নিয়ে শুধু বক্তৃতা হবে, কিন্তু সংস্কৃতি তৈরি হবে না।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের ভেতরে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন আরও বেশি, কারণ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান এখনও আশাব্যঞ্জক নয়। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মুসলমানদের সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় ৬৯ শতাংশ, যা রাজ্যের সামগ্রিক সাক্ষরতার হার থেকে কম। উচ্চশিক্ষায় টিকে থাকা, সংগঠিত চাকরিক্ষেত্রে প্রবেশ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক, এসব ক্ষেত্রেও নানা ঘাটতি রয়েছে। সাচার কমিটি থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু সমীক্ষাই দেখিয়েছে, মুসলিম সমাজের বড় অংশ অর্থনৈতিক সুযোগের মূলস্রোতে পর্যাপ্তভাবে যুক্ত হতে পারেনি। এই অবস্থায় শুধু ভর্তুকি, অনুদান বা সহানুভূতির রাজনীতি দিয়ে এগোনো যায় না। দরকার অর্থনৈতিক সক্ষমতা। আর সেই সক্ষমতার সবচেয়ে কার্যকর পথগুলির একটি হল উদ্যোক্তা-সংস্কৃতি।

এখানে নারীদের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে বহু নারী ঘরের ভিতরে বসেই উৎপাদনমূলক কাজ করেন, সেলাই, এমব্রয়ডারি, রান্না, শুকনো খাবার, বিউটি কেয়ার, টিউশন, হস্তশিল্প, শিশু পরিচর্যা। কিন্তু এই শ্রমের বড় অংশ অদৃশ্য থেকে যায়, কারণ তা বাজারের সঙ্গে যুক্ত নয়। একটু সংগঠন, একটু প্রশিক্ষণ, একটু প্রযুক্তি আর কিছু বিশ্বস্ত বাজারসংযোগ পেলে এই ক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্তন সম্ভব। কয়েকজন মহিলা মিলে একটি ক্লাউড কিচেন, অনলাইন পোশাক ব্র্যান্ড, কমিউনিটি বেকারি, টিউশন নেটওয়ার্ক, অথবা মহল্লাভিত্তিক সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারেন। নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের প্রভাব শুধু আয় বাড়ায় না; পরিবারের পুষ্টি, মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আগামী প্রজন্মের আত্মবিশ্বাসও বদলে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে স্টার্টআপ কালচার গড়ে তোলার কথা বলতে গেলে খাতভিত্তিক সম্ভাবনা বোঝা জরুরি। শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলি নিয়ে ভাবতে হবে।

খাদ্য ও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ একটি বড় ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘরোয়া খাদ্য উৎপাদন, বেকারি, মাংসজাত ও মশলাজাত পণ্য, স্ন্যাকস, কেটারিং, উৎসব-ভিত্তিক খাবার, আচার, মিষ্টি, শুকনো খাবার, অনেক সম্ভাবনা আছে। এগুলিকে স্বাস্থ্যবিধি, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং এবং অনলাইন বিপণনের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে বাজার অনেক বড় হতে পারে।

এখানে নারীদের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে বহু নারী ঘরের ভিতরে বসেই উৎপাদনমূলক কাজ করেন, সেলাই, এমব্রয়ডারি, রান্না, শুকনো খাবার, বিউটি কেয়ার, টিউশন, হস্তশিল্প, শিশু পরিচর্যা। কিন্তু এই শ্রমের বড় অংশ অদৃশ্য থেকে যায়, কারণ তা বাজারের সঙ্গে যুক্ত নয়। একটু সংগঠন, একটু প্রশিক্ষণ, একটু প্রযুক্তি আর কিছু বিশ্বস্ত বাজারসংযোগ পেলে এই ক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্তন সম্ভব। কয়েকজন মহিলা মিলে একটি ক্লাউড কিচেন, অনলাইন পোশাক ব্র্যান্ড, কমিউনিটি বেকারি, টিউশন নেটওয়ার্ক, অথবা মহল্লাভিত্তিক সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে পারেন।

পোশাক, টেক্সটাইল, টেইলারিং, বুটিক ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রও অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। বহু তরুণ-তরুণী সেলাই জানেন, কিন্তু বাজার জানেন না। অনলাইন অর্ডার, কাস্টম ফিটিং, উৎসব-নির্ভর সংগ্রহ, মুসলিম পোশাকের আধুনিক রূপ, স্কুল ইউনিফর্ম, কর্পোরেট ইউনিফর্ম, বা ডিজিটাল ক্যাটালগভিত্তিক পরিষেবা, এসবের বিস্তর সুযোগ রয়েছে।

শিক্ষা-প্রযুক্তি একটি বিশেষ ক্ষেত্র হতে পারে। বহু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মানসম্মত টিউশন, ভাষাশিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গাইডেন্স, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, এবং ডিজিটাল শিক্ষাসামগ্রীর অভাব আছে। স্থানীয় ভাষাভিত্তিক কম খরচের শিক্ষা-সহায়ক প্ল্যাটফর্ম, অফলাইন-অনলাইন মিশ্রিত শিক্ষাকেন্দ্র, মেয়েদের জন্য নিরাপদ লার্নিং সেন্টার, এসব উদ্যোগ দ্রুত প্রভাব ফেলতে পারে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও সুযোগ রয়েছে। সাশ্রয়ী ডায়াগনস্টিক সংগ্রহ, টেলিমেডিসিন সহায়তা, গ্রামীণ

স্বাস্থ্য-পরামর্শ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য সচেতনতা, ওষুধ হোম ডেলিভারি, রোগী পরিবহণ, এসব ক্ষেত্র এখনও বড় পরিসরে সংগঠিত হয়নি। যেখানেই প্রয়োজন বেশি আর পরিষেবা কম, সেখানেই উদ্যোগের জায়গা।

কৃষি ও গ্রামীণ সাপ্লাই চেইনও গুরুত্বপূর্ণ। ফল, সবজি, শস্য, মাছ, হাঁস-মুরগি, দুগ্ধ, বীজ, সার, সংরক্ষণ, পরিবহণ, সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি, ফার্ম-টু-হোম মডেল; এসবের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী উদ্যোগ গড়ে উঠতে পারে।

ডিজিটাল পরিষেবাও আর শহরকেন্দ্রিক নয়। ডেটা এন্ট্রি, গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন বিজ্ঞাপন, স্থানীয় ব্যবসার ডিজিটাল উপস্থিতি তৈরি, ফ্রিল্যান্স পরিষেবা, এসব ক্ষেত্রেও মুসলিম তরুণদের বড় সম্ভাবনা আছে। একবার দক্ষতা তৈরি হলে ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অনেকটাই কমে যায়।

তবে স্টার্টআপের কথা বললেই 'টাকা' প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। মূলধনের অভাব বাস্তব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অভাবের থেকেও বড় সমস্যা তথ্যের অভাব। অনেক তরুণ জানেন না কীভাবে ক্ষুদ্র ঋণের জন্য আবেদন করতে হয়, কীভাবে একটি ব্যবসার খরচ-লাভের হিসাব বানাতে হয়, কীভাবে ডিজিটাল লেনদেন রাখতে হয়, কীভাবে লাইসেন্স বা নিবন্ধন করতে হয়। ফলে ভালো আইডিয়াও শুরুর আগেই থেমে যায়। এ জায়গায় কমিউনিটি-ভিত্তিক আর্থিক সাক্ষরতা জরুরি। শুধু ঋণ দিলেই উদ্যোক্তা তৈরি হয় না; উদ্যোক্তা তৈরি হয় পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা, হিসাব ও বাজারচিন্তার সমন্বয়ে।

তাই মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ছোট ছোট উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার কিংবা স্টার্টআপ বিষয়ক সভা-সেমিনার করা দরকার। যেখানে একজন তরুণ বা তরুণী গিয়ে জানতে পারবেন, কীভাবে একটি আইডিয়াকে ছোট ব্যবসায় রূপ দিতে হয়, কীভাবে অনলাইন বিক্রি শুরু করতে হয়, কীভাবে লোগো, প্যাকেজিং, সোশ্যাল মিডিয়া পেজ, ডিজিটাল পেমেন্ট বা ট্রেড লাইসেন্স করা যায়। বাংলা ভাষায়, সহজ ভাষায়, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে এই সহায়তা পৌঁছে দিতে হবে। কারণ উদ্যোক্তা হওয়ার পথের প্রথম বাধা প্রায়ই "আমি জানি না, কোথা থেকে শুরু করব"।

শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও এই পরিবর্তনের অংশ হতে হবে। মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, ক্লাব, সব জায়গাকে কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতির কেন্দ্র না রেখে দক্ষতা ও উদ্যোগের আলোচনার জায়গা বানাতে হবে। ব্যবসার ভাষা মানেই বড় তত্ত্ব নয়; খুব সাধারণ কিছু জিনিস, কীভাবে গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলতে হয়, কীভাবে খরচ লিখে রাখতে হয়, কীভাবে অনলাইনে নিজের কাজ দেখাতে হয়, কীভাবে একটি ছোট পরিষেবাকে নিয়মিত গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। উদ্যোক্তার প্রথম পাঠ কখনও কখনও নিজের পাড়ার অভাবগুলো চিনে নেওয়া থেকেই শুরু হয়। এলাকায় কোন পরিষেবাটি নেই? মানুষ কোন জিনিসের জন্য দূরে যায়? কোথায় সময় নষ্ট হয়? কোন দক্ষতার বাজার নেই? এই প্রশ্নগুলিই নতুন উদ্যোগের জন্ম দেয়।

এখানে সমাজের ভেতরের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও কম নয়। মসজিদ, মাদ্রাসা, লাইব্রেরি, ক্লাব, সামাজিক সংগঠন, এসবের সামাজিক প্রভাব এখনও প্রবল। সেখানে যদি সৎ ব্যবসা, ন্যায্য উপার্জন, শ্রমের মর্যাদা, স্বনির্ভরতার গুরুত্ব, ঋণ ব্যবস্থাপনার সতর্কতা, শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক, এসব নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়, তা হলে প্রভাব পড়বে। ইসলামী ঐতিহ্যও সৎ বাণিজ্যকে মর্যাদা দেয়; কাজেই উদ্যোক্তা হওয়ার ধারণাকে ধর্মবিরোধী বা লজ্জার বিষয় হিসেবে নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবেও দেখা যায়।

আরও একটি বড় অভাব হলো রোল মডেল। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে বহু ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা আছেন, যারা খুব সামান্য থেকে শুরু করে নিজেদের অবস্থান গড়েছেন। কিন্তু তাঁদের গল্প খুব কম ছড়ায়। অথচ একজন প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তার সাফল্য, যিনি দশজনকে কাজ দিয়েছেন, গ্রামের পণ্যকে শহরে পৌঁছে দিয়েছেন, বা ঘরোয়া দক্ষতাকে ব্র্যান্ডে পরিণত করেছেন, এই গল্পগুলিই সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা জাগাতে পারে। সমাজের দরকার কেবল বড় বড় স্বপ্ন নয়, চোখের সামনে দেখা সম্ভব উদাহরণ।

অবশ্যই এ পথ সহজ নয়। ব্যর্থতার ভয় থাকবে, সামাজিক সংশয় থাকবে, অর্থের টান থাকবে, অনেকে ঠাট্টাও করবে। কিন্তু কোনো সমাজই অপেক্ষা করতে করতে শক্তিশালী হয়নি। শক্তিশালী হয়েছে শুরু করার সাহসে। স্টার্টআপ কালচার মানে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়ার কল্পনা নয়; এর মানে ছোট থেকে শুরু করে পদ্ধতিগতভাবে বড় হওয়া। এর মানে কাজকে

কাজ হিসেবে নয়, একটি সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা। এর মানে নিজের জীবিকার সঙ্গে অন্যের জীবিকার সম্পর্ক তৈরি করা।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজের সামনে আজ দুটি পথ খোলা। একদিকে পুরনো অভ্যেস; অপেক্ষা, অভিযোগ, সীমিত সুযোগের জন্য অন্তহীন প্রতিযোগিতা। অন্যদিকে নতুন পথ, দক্ষতাকে সংগঠিত করা, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা, ছোট উদ্যোগকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা, তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে ভাবতে শেখানো। প্রথম পথ পরিচিত, কিন্তু ক্লান্তিকর। দ্বিতীয় পথ কঠিন, কিন্তু সম্ভাবনাময়।

এখন সময় এসেছে প্রতিটি পরিবারে অন্তত এই কথাটি উচ্চারণ করার, শুধু চাকরি খুঁজে বেড়ালেই হবে না, কাজ তৈরির কথাও ভাবতে হবে। প্রতিটি মহল্লায় এই প্রশ্ন তোলা দরকার - আমাদের এলাকায় কী সমস্যা আছে, যার সমাধান আমরাই করতে পারি? প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই বোধ তৈরি করা দরকার - ডিগ্রি প্রয়োজন, কিন্তু দক্ষতা ও উদ্যোগও সমান প্রয়োজন। আর প্রতিটি সামাজিক সংগঠনের ভাবা উচিত, দানের পাশাপাশি উৎপাদনশীল ক্ষমতা তৈরি করা যায় কীভাবে।

কারণ শেষ পর্যন্ত একটি সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে শুধু সহানুভূতি নয়, সক্ষমতা। আর সক্ষমতার সবচেয়ে দৃশ্যমান রূপ হলো,সে সমাজ নিজের কাজ নিজে তৈরি করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজে স্টার্টআপ কালচার শুরু হওয়া তাই কোনো ফ্যাশন নয়, কোনো বিদেশি ধারণার অনুকরণ নয়; এটি সময়ের দাবি, বাস্তবতার দাবি, ভবিষ্যতের দাবি। যে সমাজ শুধু কাজ খোঁজে, সে টিকে থাকে। কিন্তু যে সমাজ কাজ তৈরি করতে শেখে, সে ইতিহাসে নিজের জায়গা করে নেয়।

এপস্টাইন ফাইলস: নশ্বর দুনিয়ার কুৎসিত রূপ ও আমাদের শিক্ষা

জিমারিনা সারওয়ার

জেফরি এপস্টাইনের যৌন-পাচার মামলার সঙ্গে জড়িত তথাকথিত 'এপস্টাইন ফাইলস' এখন বিশ্বজুড়ে এক চরম অস্বস্তির নাম। উন্মোচিত আদালতের নথিপত্র, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ইমেল এবং মামলায় উল্লিখিত নামের তালিকা লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার। চারপাশে অজস্র প্রশ্ন, এই নেটওয়ার্কে কারা ছিল? সেই দ্বীপে কারা যেত? সেখানে আসলে কী ঘটেছিল? বিশ্বের প্রভাবশালী ধনী এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে এই সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু? কেউ কেউ হয়তো এই ঘটনাকে একাডেমিক বা নিছক কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখছেন, কিন্তু মুসলিম হিসেবে এই বৈশ্বিক সংবাদের আড়ালে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো - এপস্টাইন এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন সহযোগীরা হলো দুনিয়া'র এক জীবন্ত উদাহরণ। এই মামলা থেকে আমরা কিছু শাশ্বত এবং কঠোর শিক্ষা পাই যা আমাদের এই নশ্বর পৃথিবী এবং জীবনকে চিনতে সাহায্য করে।

১. দুনিয়া ও মানুষের অতৃপ্ত লালসা

বাস্তবতা হলো, এপস্টাইন ক্ষমতাবান অন্যান্য পুরুষদের মতো তার মনের যেকোনো কুপ্রবৃত্তি মেটানোর অবারিত সুযোগ পেতেন। নারী থেকে শুরু করে মাদক, ক্ষমতা থেকে প্রভাব - সবই তার হাতের নাগালে ছিল। কোনো শাস্তির ভয় ছিল না। যখন তিনি চাইলেই প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাথে অসংখ্য সম্মতিক্রমে সম্পর্ক (অর্থের বিনিময়ে হোক বা অন্যভাবে) স্থাপন করতে পারতেন, তখন কেন তিনি যৌন শোষণের জন্য শিশুদের বেছে নিলেন? কারণ, মানুষের কামনা-বাসনা যত মেটানো হয়, তার ক্ষুধা তত বাড়ে। প্রতিবার সেই তৃপ্তি পেতে হলে আরও ভয়াবহ কিছুর প্রয়োজন হয়। যখন প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাথে সম্পর্ক সাধারণ বা একঘেয়ে হয়ে যায়, তখন দৃষ্টি পড়ে কিশোরীদের দিকে। কিশোরীদের সাথে লালসা চরিতার্থ করার পর যখন সেটিও তুঙ্গে পৌঁছায়, তখন নজর যায় প্রাক-কিশোরী বা শিশুদের দিকে। পশুত্ব, মৃতদেহ কিংবা নিকটাত্মীয়ের সাথে যৌনাচার-এর শেষ কোথায়? আনন্দের সেই একই অনুভূতি পেতে হলে প্রতিবার

ভোগের মাত্রা আরও অন্ধকার এবং বিকৃত হতে হয়।

পৃথিবীর খুব কম বিষয়ই আছে যা শিশু যৌন নিপীড়নের মতো সর্বজনীনভাবে নিন্দিত। যখন অন্য সব ধরনের শারীরিক লালসা মেটাতে মেটাতে একঘেয়েমি চলে আসে, তখন মনোযোগ যায় সবচেয়ে নিষিদ্ধ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ের দিকে, কারণ সেটিই তখন সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা দেয়। এর সাথে যদি যুক্ত হয় এমন এক বিশ্বাস যে, "আমি সকল আইনের ঊর্ধ্বে"-তবেই এপস্টাইনের মতো অপরাধীদের উত্থান ঘটে।

এমনকি মুমিন হিসেবে আমাদের জন্য নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমানার ক্ষেত্রেও আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা বৈধ বিষয়েও অতিমাত্রায় নিমগ্ন না হই। কারণ এটি আমাদের অনুভূতিকে অসাড় করে দিতে পারে, যার ফলে একসময় আমাদের দৃষ্টি সন্দেহজনক বা হারাম বিষয়ের দিকে চলে যেতে পারে। নিজেকে বোঝার অর্থ হলো নিজের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক এবং আবেগীয় ক্ষুধাকে চেনা এবং সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। এর বিকল্প হলো একটি অন্তহীন এবং বিকৃত অতল গহ্বর, যা আমরা এই ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি।

২. ক্ষমতার একমাত্র অগ্রাধিকার: নিজেকে টিকিয়ে রাখা

নিঃসন্দেহে এখন পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। যারা পর্দার আড়ালের আসল প্রভাবশালী খেলোয়াড়, তাদের নাম ও পরিচয় যে মুছে ফেলা হয়েছে বা অস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে-তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্য প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো কখনোই নিজেদের বিচার করবে না। এর পরিবর্তে, দায়বদ্ধতার একটি মরীচিকা তৈরি করা হবে যেখানে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের বা কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করে লোকদেখানো শাস্তি দেওয়া হবে। যারা আসল কলকাঠি নাড়ে, তারা সেই দড়ি দিয়ে কখনোই নিজেদের ফাঁসি দেবে না। তাই এই পার্থিব জীবনে সেই চূড়ান্ত ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয় যা আসলে হওয়া উচিত। ক্ষমতা স্বভাবগতভাবেই আত্মরক্ষা, প্রতারণা এবং আঁতাতের এমন এক কৌশলে চলে যা তাকে সবসময় সুরক্ষিত রাখে।

ক্ষমতা মূলত একটি চরম কলুষিত শক্তি। এটি এতটাই সত্য যে, উচ্চ পদে থেকেও যারা নিজেদের বিবেক ও নৈতিকতা ধরে রাখতে পেরেছেন এবং ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন-তাদের সংখ্যা আমরা আঙুলে গুনতে পারব। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে আনুগত্য, অন্ধ অনুসরণ এবং নৈতিক দৃঢ়তা বিসর্জনের প্রয়োজন হয়। যারা এই কলুষিত প্রভাব বিস্তার করে, তারা মূলত তাদের চারপাশের নেটওয়ার্কের সবার নীরব সমর্থন বা সম্মতির ভিত্তিতেই তা করতে পারে। দুনিয়ার স্বরূপ বরাবরই এমন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যখন এপস্টাইন কাবার গিলাফের (কিসওয়া) বড় টুকরো পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন তার সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগীরাই তার জন্য এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কাবার গিলাফ পাওয়া কতটা কঠিন, তা বিবেচনা করলে এটি একটি বিশাল ঘটনা। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য আসলে কী ছিল? মুসলিম দাবিদার কেউ কীভাবে একজন দণ্ডিত শিশু যৌন পাচারকারীর কাছে এমন পবিত্র বস্তু পাঠাতে পারে? তারা এমনকি দম্ভোক্তি করে বলেছিল, "এই কালো কাপড়টি কমপক্ষে এক কোটি সুন্নি, শিয়া এবং অন্যান্য মাজহাবের মুসলিমরা স্পর্শ করেছে"-যেন তারা কোনো পুরনো গাড়ি বিক্রি করছে! এপস্টাইন এটি দিয়ে কী করতে চেয়েছিলেন? পবিত্রতাকে অপমান করতে, কোনো অন্ধকার তান্ত্রিক আচার পালন করতে, নাকি ভিন্ন কোনো বিকৃত উপায়ে নিজেকে ক্ষমতাবান অনুভব করতে? দুনিয়া এই সব প্রবৃত্তিকেই লালন করে, আর তার চারপাশের আরব সহযোগীরাই তাকে এতে মদত দিচ্ছিল।

এপস্টাইন ফাইলসের মতো ঘটনা যখন দুনিয়ার প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে, তখন আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত-আমরা আমাদের হাতের ক্ষমতাকে কীভাবে ব্যবহার করছি? আমরা কি জেনেশুনে বা না জেনে অন্যের দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাকে শক্তিশালী করছি? বৈশ্বিক অভিজাত শ্রেণির এই চরম শোষণ যেন মুমিনদের হতাশ না করে, বরং এটি যেন তাদের চিন্তা, কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের থেকে আলাদা হওয়ার প্রেরণা জোগায়। তারা কীসের পেছনে ছুটছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি কী হচ্ছে-তা কেবল আখেরাতে নয়, এই দুনিয়াতেও চাক্ষুষ করা জরুরি।

সর্বোপরি, যখন মানুষ এই সুবিধাভোগী মহলের বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, তখন আমাদের প্রথম কাজ হলো এই পচনকে উন্মোচিত করা এবং দ্বিতীয়ত, ইসলামের সুদৃঢ় নৈতিক নীতিমালা ও নিরাপত্তার ছায়াতলে এক শক্তিশালী ও নীতিবান বিকল্প পথ

মানুষের সামনে তুলে ধরা।

৩. সৃষ্টিকর্তার গোপন রাখা ও প্রকাশ করার হিকমত

এপস্টাইনই প্রথম নয়, আর নিশ্চিতভাবেই সে শেষও নয়; তার মতো লম্পট ও চরিত্রহীন ব্যক্তির অভাব নেই। যুগে যুগে তার মতো প্রকাশ্য ও গোপন বহু চরিত্র এবং তাদের কুকর্মকে সহায়তা করার জন্য বিশাল নেটওয়ার্কের অস্তিত্ব ছিল। কখনো কখনো তাদের অপরাধের বিশালতা প্রকাশ পায়, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তা অজানাই থেকে যায়। বর্তমানে যেমন বিশ্বজুড়ে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত অপরাধগুলো ঘটে অন্ধকারের আড়ালে।নিউজ কভারেজ বা পডকাস্টের আলোচনার অনেক বাইরে। এমনকি অনেকে মনে করেন, মূলধারার গণমাধ্যমগুলো এখন এপস্টাইনকে কেবল একটি 'বলির পাঁঠা' বা জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে, যাতে পর্দার আড়ালের আসল অপরাধীদের আড়াল করা যায়।

বাস্তবতা যাই হোক, এটি স্পষ্ট যে কিছু অপরাধ এবং অপরাধী কখনোই জনসমক্ষে না এসেই বিদায় নেবে, বিচার হওয়া তো দূরের কথা। কেউ হয়তো খুব দ্রুত ধরা পড়বে এবং শাস্তি পাবে, আবার কেউ কেউ রাডারের নিচ দিয়ে কৌশলে পার পেয়ে যাবে। তবে এই সবকিছুর ঊর্ধ্বে রয়েছে আল্লাহর কুদরত; তিনিই নির্ধারণ করেন কার অপরাধ কতটুকু এবং কার সামনে প্রকাশ পাবে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই দুনিয়ায় কোনো বিচারই হবে না। যখন আমরা জনসমক্ষে অন্যদের এমন বিচার হতে দেখি, তখন আমাদের ভাবা উচিত কীভাবে মহান আল্লাহ আমাদেরও ঢেকে রেখেছেন। মানুষ আমাদের যে প্রশংসা করে, তা কেবল আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের প্রমাণ-কারণ তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের গুনাহ ও ত্রুটিগুলোকে আড়াল করে রেখেছেন। যখন আমাদের কোনো দোষ প্রকাশ পায়, তখন তা এক ভয়াবহ সতর্কবার্তা হিসেবে আসে; এটি যেমন লজ্জার, তেমনি এটি আমাদের জন্য নিজেদের সংশোধন করার একটি দুর্লভ সুযোগও বটে।

৪. এই পৃথিবীর অনিষ্টের জালগুলো পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত

রাজনীতিবিদ, ব্যাংকার, সংগীতশিল্পী, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া মোগল, আইনজীবী, সুপারস্টার এবং বিশ্বখ্যাত করপোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রধান-এপস্টাইনের এই প্রভাবের জালে কমবেশি সবাই জড়িয়ে আছেন। এই বিকৃত বলয়ে যারা আটকা পড়েছিলেন, তাদের সবার মধ্যে একটি সাধারণ মিল ছিল: তারা সবাই নিজেদের ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারা একে অপরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, তাদের জবাবদিহি করার কেউ নেই। এই নেটওয়ার্কগুলো একে অপরের ব্যবসার পথ সুগম করা, যুদ্ধ বাধানো, শোষণ থেকে মুনাফা অর্জন করা, একে অপরকে ব্যক্তিগত জেট পাঠানো, আদালতে একে অন্যকে সুরক্ষা দেওয়া, রাজনীতিবিদদের কিনে নেওয়া, এমনকি জনসমক্ষেই গোটা একটি জাতিকে দখল বা চুরি করার মতো কাজগুলো নির্বিঘ্নে করে যেত।

এপস্টাইন যখন রথচাইল্ড গ্রুপের সাথে ২৫ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তখন এটি কেবল কোনো সাধারণ ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ছিল না; বরং রথচাইল্ড পরিবারের সাথে তার দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ সম্পর্কেরই একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল। নামটি কি পরিচিত মনে হচ্ছে? হওয়াটাই স্বাভাবিক। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর সেই কুখ্যাত চিঠিতে ফিলিস্তিনে 'ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাসস্থল' প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন-যা আমাদের অনেকেরই জানা। সেই চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল ব্রিটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের অনানুষ্ঠানিক নেতা দ্বিতীয় লর্ড রথচাইল্ডের (১৮৬৮-১৯৩৭) কাছে। এই সম্পর্কগুলো সবসময়ই বড় কোনো স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যেই গড়ে ওঠে। এছাড়া ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এর সাথে এপস্টাইনের সংযোগের বিষয়টিও কোনো নিছক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। বরং ধারণা করা হয়, সেই দ্বীপে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল তাদের গোপন ও আপত্তিকর তথ্য সংগ্রহ করা, যাতে বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নিজের পকেটে রাখা যায়। বর্তমানে কোন দেশ জগতের সব আইন অমান্য করে বুক ফুলিয়ে চলছে এবং বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী ও পুরুষরা কেন অন্ধভাবে তাদের পক্ষ নিচ্ছে? উত্তরটা আমাদের সবারই জানা।

৫. খোদায়ী সীমারেখা কেবল আমাদের নিরাপত্তার

জন্য নয়, বরং আমাদের টিকে থাকার প্রধান শর্ত

সত্যি বলতে, আমরা যখন এপস্টাইন মামলার দিকে তাকাই এবং নতুন নতুন ফাইল উন্মোচিত হতে দেখি, তখন এই চরম অনৈতিকতা বা পাপাচারকে আমাদের থেকে অনেক দূরের কিছু মনে হতে পারে। আমরা হয়তো বিষয়টিকে অবজ্ঞা করি, বিদ্রূপ করি কিংবা এক প্রকার 'মার্জিত কৌতূহল' নিয়ে একে অন্যের সাথে আলোচনা করি। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, মানুষের আচরণের চরমতম অধঃপতন আমাদের কারো থেকেই খুব বেশি দূরে নয়। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম মানুষগুলোও নিষ্পাপ শিশু হয়েই জন্মেছিল। তাদের বেড়ে ওঠা এবং ভুল সিদ্ধান্তগুলোই তাদের জনমানসে 'দানব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং কুপ্রবৃত্তির শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকি। মাঝে মাঝেই আমরা এমন কিছু মানুষের দেখা পাই যারা মানুষের বিকৃত রূপের চূড়ান্ত উদাহরণ। নেটফ্লিক্স এমন সব সত্য অপরাধের প্রামাণ্যচিত্রে ঠাসা, যা দেখে আমরা সিরিয়াল কিলারদের সমাজবিরোধী মানসিকতা, নিজ সন্তানকে হত্যাকারী মা কিংবা প্রকাশ্যে 'ভদ্রলোক' সেজে অনলাইনে নির্যাতন চালানো ব্যক্তিদের দেখে অবাক হই। আমাদের নিজেদের ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে; শয়তান আমাদের কোন কোন দুর্বলতাকে পুঁজি করে আক্রমণ করতে পারে, তা চিনে নিয়ে সেই নাজুক জায়গাগুলোকে রক্ষা করতে হবে। আমাদের মধ্যে কেউ পতনের ঊর্ধ্বে নয়-এই সত্যটি আমাদের বিনয়ী করবে এবং সবসময় সতর্ক থাকতে সাহায্য করবে।

ইসলাম যখন ক্ষমতা লাভ, সামাজিক পদমর্যাদা, অর্থলিপ্সা, অহংকার দমন, জনসমক্ষে শালীনতা বজায় রাখা এবং নিয়মিত আত্ম-হিসাব (মুহাসাবা) করার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করে, তখন বুঝতে হবে এগুলো কেবল কিছু আধ্যাত্মিক পরামর্শ নয়; বরং আমাদের আত্মার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য শর্ত। ইসলামের এই সীমারেখাগুলো কেবল ব্যক্তিগত গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বা নিছক শাসনের জন্য নয়-বরং এই সীমারেখাগুলো এজন্যই দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা চেনা, সম্মান করা এবং এর মধ্যে থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে প্রকৃত কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

৬. এই পৃথিবীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রতারণা

কখনো কখনো এই দুনিয়াকে বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এটা মেনে নেওয়া যে-এখানে সবকিছুই উল্টো। এখানে পাপকে সাজানো হয় পুণ্য হিসেবে, আর পুণ্যকে উপহাস করা হয় সেকেলে বা মন্দ হিসেবে। দুনিয়ার প্রতিটি আনন্দ বা ভোগের একটি চড়া মূল্য আছে-তা দুনিয়াতে জবাবদিহি হোক বা আখেরাতে কঠোর শাস্তি। বর্তমানে যে যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ আমাদের হৃদয় এবং খবরের কাগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আখেরাতে সেটিই হবে পরম স্বস্তির কারণ। এখানে মিথ্যাকে উপস্থাপন করা হয় মূলধারার সংবাদ হিসেবে, আর সত্যকে উড়িয়ে দেওয়া হয় ভিত্তিহীন 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' বলে। যাদের আমরা জনসমক্ষে মহিমান্বিত করি, তাদের অনেকেই আসলে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম; তারা খ্যাতির এক ফাঁপা মরীচিকার মাঝে বাস করে এমন সব রঙিন স্বপ্ন ফেরি করে, যা শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্ন হয়েই ধরা দেয়।

আপনি যদি অনুভব করেন যে এই দুনিয়াকে আপনি মেলাতে পারছেন না বা বুঝতে পারছেন না, তবে সম্ভবত আপনি সঠিক পথেই আছেন। আপনার যদি মনে হয় যে আপনি এই 'প্রহসনের নাট্যশালায়' একজন আগন্তুক বা এলিয়েন, তবে তার কারণ হতে পারে-এই পৃথিবী আমাদের আসল ঠিকানা নয়।

এই দুনিয়ার চাকচিক্য হলো এমন এক পাটি ঝকঝকে সাদা দাঁত, যার মাড়ি পচে গেছে। এপস্টাইন এবং তার পৃষ্ঠপোষকরা দুনিয়ার সেই পচনশীল উচ্ছিষ্ট দিয়েই ভোজ সারুক; আমরা বরং আমাদের ঈমানের ভিত্তিকে মজবুত করার দিকে মনোযোগ দিই, যা আমাদের দেবে প্রকৃত ও স্থায়ী স্থিরতা।

বিপ্লবী অধ্যাপক মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর কথা

আমিনুল ইসলাম

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকেই ভারতীয় এবং বিশেষ করে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। যুদ্ধের চাপে ব্রিটিশ সরকার বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়বে, এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য বিপ্লবীরা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহকে সফল করে তুলতে হলে অস্ত্রের প্রয়োজন। অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ জার্মান সরকার ও তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল। তাদের মধ্যে এই সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হল যে, জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য সরবরাহ করে যাবে। এই সন্ধিচুক্তিকে কার্যকর ও সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত ভারতীয় বৈপ্লবিক কমিটি তথা বার্লিন কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ। আফগানিস্তানের সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে এবং সাহায্যের জন্য মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতউল্লাহ সহ বেশকিছু প্রতিনিধি নিয়ে কাবুলে একটি ইন্দো-জার্মানি মিশন পাঠায় কমিটি। সেখানে আফগান সরকারের সাহায্য নিয়েই গড়ে ওঠে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার। শুধু যে বরকতউল্লাহ কাবুলের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাই নয়, বরং তাঁর অবদান আরও বিস্তৃত। গোটা সময়টা জুড়ে তিনি একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকায় ছিলেন, বিশেষ করে বিদেশে পরিচালিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে। স্থির সংকল্প নিয়ে যাত্রা করেছেন নানা দেশে। সেই সূত্রে আমেরিকায় গদর দলের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। তাই কোন ভাবনার জায়গা থেকে এই ধরনের পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছিল তার অনেকটাই চিত্র পাওয়া যাবে বরকতউল্লাহর বক্তব্যে, লেখাপত্রে ও ভাবনার গতিপ্রকৃতি থেকে।

বার্লিন কমিটির সেক্রেটারি বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক বরকতউল্লাহকে 'প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।' বরকতউল্লাহ উচ্চশিক্ষার পাঠ নিয়েছেন বিলেতে। দেশপ্রেমে পাগল বরকতউল্লাহ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভূপালে ফিরে আসেন। ভূপাল ছিল করদ রাজ্য। সেখানে কাজ শুরু করলেন মানুষকে বোঝালেন স্বাধীনতার কথা, স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা। বরকতউল্লাহ এক আবেদনে বলেন: "হিন্দু-মুসলমান এক জাতি ও এক প্রাণ, বিভেদ যারা আনতে চায়, তারা হিন্দু-মুসলমানের দুশমন, ইংরেজের বন্ধু; এক প্রাণ হয়ে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান ভারতবাসীকে 'জাতীয়তাবাদ' প্রচার করতে হবে ভারতবর্ষ জুড়ে। কাজ করতে হবে সেই পথ ধরে যে পথে দেশপ্রেম আদর্শবাদ নিষ্ঠা বিপ্লবের রঙে রঙিন, যেখান থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হবে জিহাদ, যার ফলে ভারতবর্ষ হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী।"

বরকতউল্লাহ বিলেতে থাকাকালে বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারকনাথ দাশ, মার্কিন ভারতবন্ধু মাইরন ফেল্পস, আইরিশ আমেরিকান জাতীয়তাবাদীদের পত্রিকা 'গেলিক আমেরিকান'-এর সহকারী সম্পাদক জর্জ ফ্রিম্যান প্রমুখের বিপ্লবাত্মক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ সালে বরকতউল্লাহ জাপানে যান এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় অধ্যাপনা শুরু করেন। টোকিওতে তিনি 'ইসলামিক ফ্রেটারনিটি' ('ইসলামীয় সৌভ্রাতৃত্ব') নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন। কিছুদিন পর জাপানী সরকার ব্রিটিশ সরকারের চাপে ওই পত্রিকা বন্ধ করে দেয় এবং অধ্যাপকের পদ থেকে বরকতুল্লাকে অপসারিত করে। বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন: "তারপর অতি সংগোপনে একদিন তাঁকে চলে যেতে হয় জাপানে। জাপান তখন এশিয়ার আলো। আলোক-শিখা বিকিরণ করছে ঐটুকু দ্বীপের মুষ্টিমেয় মানুষ, সমগ্র এশিয়াবাসীকে তাদের বন্ধুর পথের অন্ধকারে। জাপানে বরকততউল্লাহর অবকাশ নেই। শিক্ষাব্রতীরূপে বাহ্যত তাঁর দিন কাটে।

কিন্তু অন্তরে তাঁর বিপ্লবের ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি। বের করলেন 'ইসলামিক ফ্রেটারনিটি' নাম দিয়ে একখানা কাগজ। কিন্তু পুলিশ তাঁর পেছনে লাগল। কাজেই জাপান তাঁকে ছাড়তে হবে।"

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার চাকরি হতে বরখাস্ত হবার পর মোহাম্মদ বরকতউল্লাহকে লালা হরদয়াল গদরের সঙ্গে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানালে ১৯১৪ সালের ২২ মে তিনি আবার আমেরিকায় ফিরে আসেন। মাস পাঁচেক আগে কানাডা থেকে বিপ্লবী ভগবান সিংকে বহিষ্কার করা হলে পলাতক অবস্থায় ভগবান তখন বরকতউল্লাহর সঙ্গে বসবাস করছিলেন। কাজেই তিনিও সহযাত্রী হিসেবে আমেরিকায় উপনীত হন এবং উভয়ে গদর পার্টির বিশিষ্ট নেতা হয়ে দাঁড়ান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বরকতউল্লাহ জার্মানীতে এসে বার্লিন কমিটিতে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভারতীয় অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও আগামী দিনে তাকে সফল করে তোলার চেষ্টায় পিছিয়ে পড়লেন না। তিনি জাত-বিপ্লবী, তিনি অশান্ত থাকবেনই যতদিন পর্যন্ত কার্যোদ্ধার না হয়। যুদ্ধ ক্ষান্ত হলে বরকতউল্লাহ ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে ভারতীয় স্বাধীনতার কথা প্রচার করেন। সে প্রচারের বিরাম্ ছিল না। ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। বরকতউল্লাহর ওই সময়কার নানা বৃত্তান্ত জানা যায় 'পেট্রোগ্রাড প্রাভদা'য় (১৯১৯, ১০০ তম সংখ্যা) প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার থেকে। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ হল: "আমি কমিউমিনস্ট নই, সোশ্যালিস্টও নই। বর্তমানে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি হচ্ছে এশিয়া থেকে ইংরেজ বিতাড়ন। এশিয়ায় ইউরোপীয় ধনতন্ত্র যার প্রধান প্রতিনিধি হল ইংরেজ-আমি তার ঘোরতর শত্রু। এইখানেই আমার মিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবং এই দিক থেকে আমরা আন্তরিক বন্ধু।... ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হাবিবুল্লাহর হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ-বিরোধী আমানুল্লাহ যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন নতুন আমীরের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আমাকে দূতরূপে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এর ফলে নতুন আমীর ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধিপত্র নাকচ করে দিলেন-যার শর্ত ছিল এই যে আফগানিস্তান ইংল্যান্ড ছাড়া আর কারো সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।" এরই সূত্রে অধ্যাপক বরকতউল্লাহ সে সময় লেনিনের কাছে আফগানিস্তানকে সাহায্য দানের প্রস্তাব উত্থাপিত করেছিলেন। সেই সময়ই লেনিনের অনুরোধে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্তানে নবনিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত সুরিৎসকে সোভিয়েত-আফগান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন।

পেট্রোগ্রাড প্রাভদায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক বরকতউল্লাহ আরও বলেছিলেন, "ভবিষ্যতে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে এখনই তা বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি জানি সমস্ত জাতির দৃষ্টিতে সোভিয়েত রাশিয়ার পুঁজিপতি-বিরোধী (আর আমাদের কাছে 'পুঁজিপতি' কথাটি বিদেশী, আরো নিখুঁতভাবে বলতে হলে বলা যায় ইংরেজের সমার্থক) সংগ্রাম চালাবার আবেদন আমাদের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। তার চেয়েও বড় ছাপ ফেলেছে রাশিয়া কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সমস্ত গোপন চুক্তির অস্বীকৃতি এবং যত ছোটই হোক না কেন জাতিমাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা। এই কাজের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া তার চারদিকে এশিয়ার সমস্ত শোষিত জাতি ও পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এমনকি এদের মধ্যে সেই সমস্ত পার্টিও রয়েছে যারা সমাজতন্ত্র থেকে বহুদূরে। তার এই কাজের ফলে সুনির্ধারিত ও নিকটতম হয়েছে এশিয়ার বিপ্লব। বলশেভিকদের চিন্তাধারা যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'ইশতিরাকিয়াত' তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ভারতীয় জনসাধারণের ভিতরে। ইতিমধ্যেই বছরখানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও প্রকাশ্য অভ্যুত্থান চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। বাংলাদেশ হল বিপ্লবী চিন্তায় সবচেয়ে অগ্রণী, এক কথায় বলতে গেলে বাংলা হল বিপ্লবের মনন কেন্দ্র। আর সবথেকে কর্মচঞ্চল ভারতীয় প্রবেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের সীমানায়।" বরকতউল্লাহর এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার রুশ বিপ্লবের প্রভাব তাঁর উপর কিভাবে পড়েছিল। তিনি কোথাও নিজেকে কমিউনিস্ট বলে দাবি করেননি সেকথা ঠিক, তবে বিভিন্ন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার নীতিগুলির দেদার প্রশংসা তো করেছেনই, সেখান থেকে অন্যদের শিক্ষা নিতে বলেছেন বারবারই। 'জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণে'র অধিকার নিয়ে সোভিয়েতের নীতি তাঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর তাসখন্দ থেকে ১৯১৯ সালে আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি তাঁর পুস্তিকা 'বলশেভিকবাদ ও ইসলামিক রাজনীতিক্ষেত্র'-এর অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজিতে অনুদিত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে দেবেন্দ্র কৌশিক ও লিওনিদ মিত্রখিন সম্পাদিত 'লেনিন-হিজ ইমেজ ইন ইন্ডিয়া' সংকলনে। প্রবন্ধটির নাম 'লেনিন ভাইয়ের ডাকে সাড়া দাও'। এই প্রবন্ধে বরকতউল্লাহ লিখেছেন,

"সারা পৃথিবীর ও এশীয় জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের রুশ সমাজবাদের মহৎ নীতি হৃদয়ঙ্গম করার এবং গভীরভাবে ও সোৎসাহে তা গ্রহণের আজ সময় এসেছে। এই নতুন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গুণগুলিকে অনুধাবন ও ফলপ্রসু করে তুলতে হবে আর প্রকৃত স্বাধীনতারক্ষাকল্পে পররাজ্যগ্রাসী ও অত্যাচারী ব্রিটিশদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যোগ দিতে হবে বলশেভিক বাহিনীতে। মুসলমান ভাইসব। বিধাতার এই আহ্বান কান পেতে শোনো, লেনিন ভাই ও রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে বাণী তোমাদের কাছে এনেছেন তাতে সাড়া দাও।" এহেন বক্তব্যে সেদিন প্যান-ইসলামবাদ প্রশ্রয় পেয়েছিল কিনা কিছুটা, তা বলা কঠিন। তবে এখানে বরকতউল্লাহর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত ব্যক্ত হয়েছে। কাবুল স্বাধীন সরকারের রাষ্ট্রপতি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং যে বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'মির্জা আলি হায়দার' ছদ্মনামে এক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে ওই স্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বরকতউল্লাহর একান্ত সচিব হিসেবে কাজ করেছিলেন-তাঁরা দু'জনেই বরকতউল্লাহর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি কমরেড লেনিনের অভিমতও তাই ছিল। লেনিন কমরেড চিচেরিনকে লিখিত এক পত্রে বরকতউল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-"(বরকতউল্লাহ) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা লিখেছিলেন আর চেয়েছিলেন যে, বলশেভিকবাদ বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হোক যাতে বলশেভিকবাদের অনুকূলে মুসলমানদের অন্তর জয় করা যায়।"

১৯১৫ সালে ইন্দো-জার্মান-তুর্কি মিশন যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী সমঝোতা করতে। বরকতউল্লাহকে বিপ্লবীরা পাঠিয়ে দিলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরূপে উক্ত মিশনের শরিক হতে। বরকতউল্লাহ ১৯১৫ সালেই ইস্তাম্বুলে এসে উক্ত মিশনে যোগ দেন। সেখান থেকে মিশনের অপর সভ্যদের সঙ্গে তিনি চলে যান কাবুল শহরে। কাবুলে ওই মিশনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল 'স্বাধীন সরকার'। কিন্তু ব্রিটিশের প্ররোচনায় ব্রিটিশ মদতপুষ্ট আফগান-আমির হাবিবুল্লাহ বিপ্লবীদের দ্বারা গঠিত এই স্বাধীন সরকারের চালচলন পছন্দ করলেন না। আফগান সরকার বিরূপ হল। বরকতউল্লাহ কাবুল থেকে জার্মানিতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বার্লিনস্থ 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি'র (১৯২২) সভ্যপদে সাদরে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর কাজ শুরু হল যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে-বন্দী-সৈনিকগণ যাতে ব্রিটিশের পক্ষ ত্যাগ করে স্বদেশ ভারতের পক্ষে চলে আসে তার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা।

রাশিয়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের জন্য তারই উদ্যোগে বার্লিনে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান কমিটি ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ' প্রতিষ্ঠানটিও। বরকতউল্লাহ ছিলেন ওই সংস্থার সভাপতি এবং সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ওই সংস্থার ছাপানো কাগজে ওই দুজনের স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে ১৯২২ সালে শেষের দিকে গোপনে ভারতে আসেন অবনী মুখার্জি। ১৯২৭ সালের ১০-১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রাসেলসে যে 'ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বরকতউল্লাহ যোগ দেন সানফ্রান্সিসকোর হিন্দুস্থান গদর পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে। এখানে প্রদত্ত তাঁর ভাষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে। যুক্তিতে অকাটা এবং হৃহৃদয়ের আবেদনে প্রাণবন্ত ছিল সেই ভাষণ। সেখানে বিশ্বের পরাধীন দেশগুলোর রাষ্ট্রিক-মুক্তি দাবি করে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানোর আহ্বান তিনি জানিয়েছেন। ব্রাসেলসে এবং তার আগে বার্লিনেও নেহেরুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। নেহেরুও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে বরকতউল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন, "...চমৎকার এক বৃদ্ধ মানুষ তিনি। কিছুটা সরল প্রকৃতির লোক, মননশক্তির দিক থেকে হয়তো খুব বড়ো মাপের নন, তবু নতুন চিন্তা গ্রহণের ও বর্তমান দুনিয়াকে বোঝার চেষ্টায় তখনো নিরলস। আমরা যখন সুইজারল্যান্ডে ছিলাম তখন ১৯২৭ সালে তিনি মারা যান সানফ্রান্সিসকোয়। আমি দুঃখিত হলাম তাঁর মৃত্যু সংবাদে।"

১৯২৭ সাল অবধি বরকতউল্লাহ পূর্ণ উদ্যমে বিদেশে বাস করে দেশসেবা করে গেলেন। চিন্মোহন সেহানবীশ বরকতউল্লাহ সম্পর্কে লিখেছেন, "মধ্যপ্রাচ্যের দেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের সেই অসমসাহসিক সংগ্রাম প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রনাথ প্রথমেই নাম করেন মৌলানা বরকতউল্লাহ,

যদিও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গী হিসাবে পাড়ি দেন কাবুলের পথে। বীরেন্দ্রনাথের মতে, বরকতউল্লাহ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী। প্যালেস্টাইনে তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন মহীশূরের প্রতিবাদী আচার্য, মজঃফরপুরের আবদুল ওয়াহেদ, লখনউ-এর জনৈক ভার্মা ও ডাঃ মনসুরের নাম। তিনি নিজে এক সময়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসাবে তত্ত্বাবধান করতেন বিপ্লবী কর্মকেন্দ্রের ও হিসেব রাখতেন সংশ্লিষ্ট তহবিলের।

বরকতউল্লাহর ব্যক্তিগত সচিব বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিন কমিটির নির্দেশে ভারতীয় তরুণ বিপ্লবীরা যে অসমসাহসিক কাজ করেছিলেন তার বিবরণ প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন: "কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছে। আর মৃত্যুর ভয়? সত্যই 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' তাঁহাদের ছিল। সুয়েজ খাল রাত্রে সন্তরণ করিয়া মিশরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববর্তী প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ এক বাঙালী ও এক মাদ্রাজী দুই তরুণ যুবক জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল। মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে। তৎক্ষনাৎ এক হিন্দু বাঙালি তরুণ যুবক যাইতে প্রস্তুত হইল।" সেদিনকার সেই বাঙালি তরুণই ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগ্রামে। পিতা ঈষাণচন্দ্র ওকালতি করতেন জলপাইগুড়ি শহরে এবং বাড়িও করেন সেখানেই। ওই জলপাইগুড়িতে ১৮৮৮ সালের ১২ মে জন্ম হয় বীরেন্দ্রনাথের। শৈশব ও বাল্যকাল কাটে সেখানেই।

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালের স্বদেশি আন্দোলনে বেশ উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। বিলেতি কাপড় পোড়ানোর জন্য এক ছাত্রকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেত্রাঘাত করেন। তারই প্রতিবাদে বীরেন্দ্রনাথ ওই স্কুল ছেড়ে ১৯০৬ সালে কলকাতায় আসেন এবং ওই বছরেই যোগ দেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীন শিক্ষালয়ে। সেখানে তিনি অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া আর যাঁদের শিক্ষক হিসেবে পান তাঁদের মধ্যে ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের মতো মনস্বী ব্যক্তি। এর মধ্যে পরবর্তীকালে অধ্যাপক বিনয় সরকারই ছিলেন তাঁর ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড। পরে ১৯১১ সালে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহায়তায় ও আর্থিক আনুকূল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে। প্রথমে উইনকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ার পর যোগ দেন ইন্ডিয়ানা রাজ্যের পার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই তিনি ১৯১৪ সালে লাভ করেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। ইতিমধ্যে ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বার্লিন কমিটির পক্ষ থেকে জার্মান সাহায্যের খবর নিয়ে গদর দলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আমেরিকায় আসেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ছোটো ভাই ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও মারাঠে নামে আর এক বিপ্লবী। ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠী। তাঁর সাহায্যে বীরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে আমেরিকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং মির্জা আলি হায়দার নামে এক ইরানী তরুণের পাশপোর্ট নিয়ে রটারডাম হয়ে বার্লিনে পৌঁছান ১৯১৪ সালের শেষে।জার্মানিতে কিছুদিন সামরিক ট্রেনিং নেওয়ার পর তিনি কনস্ট্যানটিনোপল যান অধ্যাপক বরকতউল্লাহর সেক্রেটারি হিসেবে।

তথ্যসূত্র:

১ শিবাদিত্য দাশগুপ্ত সম্পাদিত, অগ্রন্থিত চিন্মোহন সেহানবীশ, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৯৬।

২. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, পৃ. ১২৭।

৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, পৃ. ১২৭। আরও দেখুন-হরিশ কে পুরী, গদর আন্দোলন, পৃ. ৮৫।

৪. চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ-বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃ. ৯৫-১৬।

৫. চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ-বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃ. ৯৭।

৬. দেখুন- কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ লেনিন, খণ্ড-৪৪, পৃ. ২৪৪।

৭. নেহেরু, অ্যান অটোবায়োগ্রাফি, দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ. ১৫১।

৮. চিন্মোহন সেহানবীশ, রুশ-বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃ. ৩২০।

রামপুরের শাহি রান্না ও নবাবি দস্তরখওয়ান

ফারুক আব্দুল্লাহ

রামপুর বর্তমানে দিল্লি থেকে প্রায় ১৫০ কিমি এবং লখনৌ থেকে প্রায় ৩৫০ কিমি দূরে অবস্থিত একটি শহর। রামপুর ব্রিটিশ ভারতের ১৫ তোপ-সেলামিওয়ালা দেশীয় রাজ্য ছিল। অওধের সঙ্গে একটি চুক্তির ফলে, বিশেষ করে কর্নেল চ্যাম্পিয়নের সুরক্ষায়, ১৭৭৪ সালে ফয়জুল্লাহ খান রামপুর রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। রামপুরের শাসকরা অওধের শাসকদের মতোই তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রামপুরের শাসকরা তাঁদের বাবুর্চিদের নানা রকম খাবার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উৎসাহিত করতেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। যার ফলে দেশ-বিদেশের বহু বাবুর্চি কাজের খোঁজে এসে নবাবের দরবারে ভিড় জমাতেন।

রামপুরি রন্ধনপ্রণালী বলতে মূলত "দরবারি রন্ধনপ্রণালী"-কেই বোঝায়। রামপুরি রন্ধনপ্রণালীতে মুঘলাই, অওধি, আফগানি, কাশ্মিরি, রাজপুত, এমনকি ব্রিটিশদের রন্ধনসংস্কৃতির প্রভাবও রয়েছে।

রামপুরের নবাবি বাবুর্চিখানায় বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে রান্না করা হতো। গরমের সময় এক রকম, আবার শীতের সময় অন্য রকম। রামপুরের শাসকরা প্রচুর মাংস খেতে ভালোবাসতেন, সঙ্গে মাছও খেতেন, তবে পরিমাণে কম। রামপুর কাবাবের জন্য বিখ্যাত। রামপুরের শাহি বাবুর্চিরা বিভিন্ন রকমের কাবাব তৈরিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাবুর্চিদের হাতের ছোঁয়ায় কাবাবগুলো খাস্তা, নরম এবং মশলাদার হতো, যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু ছিল। রামপুরের শাহি বাবুর্চিরা বিভিন্ন ধরনের কাবাব তৈরি করতেন, যেমন মাছের কাবাব, খাসি বা মুরগির মাংসের কাবাব, এমনকি

সবজি দিয়ে নিরামিষ কাবাবও তৈরি করতেন। তবে এই সব কাবাবের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য কাবাব হলো - 'মুর্গ চাপলি কাবাব', নিরামিষ 'কামাল কাকরি কাবাব', 'কাঠালের শিক কাবাব'। আজও রামপুর শহরের মানুষ তাঁদের এই বিভিন্ন ধরনের কাবাব নিয়ে গর্ব করেন।

কাবাবের পরেই আসবে রামপুরের বিখ্যাত 'তার কোর্মা'-র কথা। খাসির মাংসের এই পদটি অত্যন্ত সুস্বাদু হয় এবং এটি সাধারণত তন্দুরি রুটি দিয়ে খাওয়ার নিয়ম। রামপুরের এই বিশেষ কোর্মার ঝোলের রং হয় লাল। মাটির হাঁড়িতে কাঠের আঁচে ধীরে ধীরে রান্না হওয়া এই তার কোর্মার স্বাদই হতো আলাদা। মশলাদার তার কোর্মার ঝোলও অনেকে পান করতেন। কথিত রয়েছে, রামপুরের এই বিশেষ পদ তার কোর্মা তৈরির জন্য প্রয়োজন হতো রামপুরের জল। রামপুরের জল ছাড়া অন্য জল ব্যবহার করলে নাকি তার কোর্মার আসল স্বাদ আসত না। ফলে শুধু এই তার কোর্মা রান্নার জন্যই নাকি এক সময় রামপুর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জল সরবরাহ করা হতো। কোর্মা ছাড়াও হতো মাংসের টিকিয়া, টিক্কা, কালিয়া সহ আরও অনেক পদ।

রামপুরের নবাবরা আমিষ খাবার বেশি খেতেন ঠিকই, তবে নবাবদের বহু রেসিপি নিরামিষ ভোজিদের জন্যও ছিল। পরবর্তী সময়ে রামপুরের নবাবদের দৈনন্দিন খাবারেও বহু নতুন নিরামিষ খাবার যুক্ত হয়। এর মধ্যে ছিল বিভিন্ন রকমের কাবাব এবং কোর্মাও। যেমন- মটর এবং কলা ও আলুর কাবাব, বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি কাবাব ইত্যাদি। এছাড়াও টমেটো কা শোর্বা (টমেটোর ঘন গ্রেভি), সবজ মাখনা, মটর বিরিয়ানি (মটর এবং সবজি দিয়ে রান্না করা হতো), ডাল-এ-মমতাজ, ঘিয়া চানে কি ডাল, খুস উরুত কি ডাল, আচারি বেগুন, আলু কটলিয়া-এর মতো বিভিন্ন নিরামিষ পদও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

অওধের অধিকাংশ খাবার ঘি ও মাখনের স্বাদযুক্ত। সেই জায়গায় রামপুরি খাবার অনেক সহজ ও সুন্দর এবং এর একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বাদও রয়েছে। অওধি রন্ধনপ্রণালীতে অতিরিক্ত চিনি এবং দইয়ের ব্যবহার করা হয়, তবে রামপুরি শাহি রান্নায় তাজা ধনে পাতা, হলুদ ও লঙ্কার ব্যবহার বেশি হয়।

যে বিষয়টি রামপুরি রন্ধনপ্রণালীকে অন্যান্য রান্নার থেকে আলাদা করে তা হলো রান্নায় কিছু স্থানীয় মশলার ব্যবহার, যেমন- মৌরি, ধনে, তেজপাতা, জায়ফল, জৈয়িত্রি, দারুচিনি, বদন খাতায়, সাদা এলাচ এবং হলুদ লঙ্কা, যা শুধুমাত্র রামপুরেই পাওয়া যায়। এসবের ব্যবহার ছাড়াও বিভিন্ন রান্নায় স্থানীয় সবজি এবং প্রচুর আলু ব্যবহার করা হয়।

রামপুরের রন্ধনপ্রণালীর আরেকটি স্বতন্ত্র দিক হলো প্রতিটি খাবারের জন্য মশলার একটি বিশেষ মিশ্রণ ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, রামপুরের বিরিয়ানিতে আদা, পেঁয়াজ, জৈয়িত্রি, জায়ফল এবং খস শিকড়ের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। মাংসকে নরম করার জন্য করলা এবং পেঁপের ব্যবহার প্রথম রামপুরের শাহি বাবুর্চিখানাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। রামপুরের নবাবি বাবুর্চিরা তাঁদের তৈরি বিভিন্ন খাবারে অনন্য স্বাদ আনার জন্য পদ্মের বীজ, কলার ফুল, খসখসের শিকড় এবং চন্দন কাঠ ব্যবহার করতেন।

রামপুরের বিরিয়ানির মধ্যে দুধিয়া বিরিয়ানি খুব জনপ্রিয় ও সুস্বাদু ছিল। এই বিরিয়ানি দেখতে সাদা রঙের হতো। এছাড়াও ছিল ডেগ বিরিয়ানি, যা বড় ডেগ বা পাত্রে দমে বসিয়ে রান্না করা হতো। বিরিয়ানি ছাড়াও ছিল অজস্র রকমের পোলাও, যেমন- পবিত্র পোলাও, পোলাও শাহজাহানি, ইয়াখনি পোলাও, মুতানজান পোলাও, পোলাও শীর সক্কর, আনানাস পোলাও, ইমলি পোলাও ইত্যাদি। এছাড়াও ছিল রামপুরি শিরমল, রুমালি রুটি, তন্দুরি রুটি, পুরি, পরাঠা, রামপুরি নান, খামির রুটি এবং বাদামের রুটি।

রামপুরের শাসকদের মিষ্টিজাতীয় খাবার খুব প্রিয় ছিল। তাঁদের বাবুর্চিরাও মিষ্টি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। রামপুরের বিভিন্ন রকম মিষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নানান ধরনের হালওয়া। হালওয়া রামপুরের বিখ্যাত মিষ্টি খাবারগুলির অন্যতম। নবাবরা প্রায় প্রতি বেলাতেই হালওয়া খেতে পছন্দ করতেন। বিভিন্ন ধরনের হালওয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল - মির্চি কা হালওয়া বা লঙ্কার হালওয়া, অ্যালোভেরা কা হালওয়া বা ঘৃতকুমারী দিয়ে তৈরি হালওয়া, আদরক কা হালওয়া (আদা দিয়ে তৈরি হালওয়া)।

আদার হালওয়া উদ্ভবের একটি গল্প আছে। জনশ্রুতি রয়েছে, রামপুরের কোনো এক নবাবের একবার অসুখ হলে হাকিম তাঁকে আদা খাওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু নবাব আদার স্বাদ একেবারেই পছন্দ করতেন না। অবশেষে শাহি বাবুর্চিখানার বাবুর্চিরা আদার হালওয়া তৈরি করে নবাবের সামনে পরিবেশন করলে সেই হালওয়া খেয়ে নবাব তৃপ্ত হয়েছিলেন। তখন

থেকেই আদার হালওয়া রামপুরে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। আদা ছাড়াও ছিল নিম কা হালওয়া, আন্ডা কা হালওয়া, ঘাস কা হালওয়া, মাছলি কা হালওয়া, গোশত কা হালওয়া ইত্যাদি। হালওয়া ছাড়াও রামপুরের আরও একটি বিখ্যাত মিষ্টিজাতীয় খাবার ছিল গুলাঠি (রামপুরি রাবড়ি)। এছাড়াও ছিল শাহি টুকরা, চুকান্দার-এ-আফরোজ, গুড় কি ইয়াকুতি, শীর খুরমা ইত্যাদি।

রামপুরের নবাব হামিদ আলি খান ছিলেন একজন খাদ্যরসিক মানুষ। তিনি তাঁর বাবুর্চিখানায় দেশের বিখ্যাত সব বাবুর্চিদের নিয়ে এসেছিলেন। কথিত রয়েছে, নবাবের বাবুর্চিখানায় প্রায় ১৫০ জন বাবুর্চি থাকতেন। একেক জনকে একেক ধরনের খাবার তৈরির জন্য রাখা হয়েছিল। জনশ্রুতি রয়েছে যে, একদা নবাব হামিদ আলি খান তাঁর দরবারে আগত এক অতিথিকে দাওয়াত দিয়ে তাঁর দস্তরখওয়ান সাজিয়েছিলেন প্রায় দুশোটি পদ দিয়ে। সেখানে ডালই ছিল প্রায় পঞ্চাশ রকমের, পোলাও দশ রকমের, মুরগির মাংসের পদ ছিল তিরিশ রকমের, খাসির মাংসের পদ ছিল পঁচিশ রকমের। এছাড়াও নবাবের শিকার করা পশুর মাংস দিয়ে তৈরি চল্লিশ রকমের পদ ছিল। এসব বাদেও সেখানে ছিল আরও অনেক সুখাদ্যের সম্ভার।

রামপুরের খাবারের ঐতিহ্য আজও বজায় আছে। রামপুর শহরের অলিতে-গলিতে আজও বহু দোকানে রামপুরের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলো পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, নবাবি বাবুর্চিখানার বহু বাবুর্চি পরিবার আজও বংশপরম্পরায় তাঁদের পেশা আঁকড়ে বেঁচে আছেন। তাই কেউ ইচ্ছা করলে আজও রামপুরের শাহি খানার স্বাদ খুব সহজেই আস্বাদন করতে পারবেন।

তথ্যসূত্র:

১) রামপুরের খাবার (রামপুর অনলাইন.ইন)

২) রামপুরের রাজকীয় রন্ধনশৈলী সম্পর্কে প্রত্যেক খাদ্যরসিকের যা জানা উচিত; লাইফস্টাইল, হিন্দুস্তান টাইমস (মার্চ ২৪, ২০১৮)

৩) প্রাচীন রামপুরি রন্ধনশৈলীর উত্থান ও পুনর্জাগরণ; মূল লেখা: মধুলিকা দাশ, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৪)

৪) রামপুরের শাহী খাবারের স্বাদ নিতে যোগ দিন এই খাদ্য উৎসবে; আদিলা মাত্রা, ইন্ডিয়া টুডে (মে ১৪, ২০১৭)

৫) ইতিহাসের স্বাদ: যেভাবে রামপুরের নবাবরা ভোজনবিলাসে মত্ত হতেন; মাণিক এস. কোহলি (মার্চ ২৬, ২০১৮)

৬) দ্য রয়্যাল প্যালেট | পর্ব ৪ | রামপুরের হালুয়া (শেফ কুনাল কাপুর এবং কুনওয়ার অমর); দ্য টাইমলাইনার্স, ইউটিউব

৭) দিল্লি আর রামপুরের খানা (খাবার); রে অফ লাইট, ইউটিউব

ঈদ স্মৃতিকথা

খুশির দিন স্মৃতিগুলো অমলিন

সানাউল খান

আজ পবিত্র ঈদ। ভোরের আলো ফুটতেই শিশুদের আনন্দ কোলাহলে গ্রাম-পাড়া, শহর-মহল্লা ম ম করছে এক অনাবিল খুশিতে। প্রতিটি ঘরে ঘরে আজ আনন্দের পূর্ণতা। ফজরের নামাজের পর থেকেই বাতাসের ভাঁজে ভাঁজে ভেসে আসছে সেই চিরচেনা তাসবিহ ধ্বনি, 'আল্লাহু আকবার কাবিরা, আলহামদুলিল্লাহি কাশিরা...'। মিষ্টি খাবারের গন্ধে যখন চারপাশ মাতোয়ারা, তখন কারও কাছে এই দিনটি হয়ে ওঠে অফুরান ভালোবাসা আর সালামি আদান-প্রদানের উৎসব, আবার কারও কাছে এটি কেবলই এক বিষাদময় স্মৃতির সরণি। চোখমুখের উৎসবী উজ্জ্বলতাকে ছাপিয়ে সেখানে স্থান পায় এক ফ্যাকাশে আর মেদুর একাকীত্ব।

অভিভাবকহীন শৈশবের শূন্যতা:

যাদের মাথার ওপর আজ বাবা-মায়ের ছায়া আছে, তাদের কাছে ঈদ মানে এক নিশ্চিন্ত সুখের আশ্রয়। কিন্তু যারা আজ অভিভাবকহীন, তাদের কাছে এই আনন্দের আলো বড় বেশি ম্লান। যখন দেখি কোনো

বন্ধু তার বাবার হাত ধরে সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহের পথে হাঁটছে, কিংবা কোনো শিশু তার মায়ের আঁচল ধরে বায়না করছে, তখন অবুড় মনে ভেসে ওঠে নিজের জীবনের সেই সোনালি সকালগুলো। স্মৃতির সেই ধূসর পাতাগুলো আজ বড্ড বেশি কাঁদায়।

স্মৃতির আয়নায় সেই বটবৃক্ষ ও মায়াময় ছায়া:

একসময় ঈদের সকাল মানেই ছিল মায়ের হাতের রান্না করা সেই বিশেষ খাবারের সুবাস। ঘুম ভাঙার আগেই কপালে মায়ের আলতো পরশ আর পরম মমতায় সাজিয়ে দেওয়া নতুন পোশাক। প্রস্তুত হওয়ার পর বাবার সেই শক্ত হাতটি ধরে ঈদগাহের মেঠোপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া। নামাজের পর বাবার সেই গভীর আলিঙ্গন আর পকেট থেকে বের করে দেওয়া সামান্য কিছু সালামি - সেটাই ছিল যেন সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আজ সেই ঈদগাহ আছে, সেই পরিচিত পথগুলোও আছে, নেই শুধু সেই মায়াময় মুখ দুটি। আজ তারা ওপারের অচেনা ঠিকানায়। এই উৎসবের দিনটিতে তাদের সেই ধুলোমলিন স্মৃতিগুলো বুকের ভেতরটা বারবার দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে যায়।।

দায়িত্বের ভার বনাম হারানো শৈশব:

বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন ঈদের দিন মানেই ছিল একরাশ আবদার আর হাজারো অভিমান। আজ সময় বদলেছে; বাবার সেই শূন্য জায়গায় আজ আমি দাঁড়িয়ে। আজ আমাকেই সন্তানদের অজস্র আবদার মেটাতে হয়, আয়োজনের সব দায়িত্ব একা হাতে সামলাতে হয়। কিন্তু এই উৎসবের ব্যস্ততার মাঝে নিজের ব্যক্তিগত আনন্দটুকু কোথাও যেন অতল গভীরে চাপা পড়ে যায়। আমি যখন সবার মুখে হাসি ফোটাতে ব্যস্ত থাকি, তখনই নিজের অবচেতন মনে উঁকি দেয় সেই দিনগুলো, যখন আমার সব আবদার আর অভিমানের শেষ আশ্রয় ছিলেন বাবা। আজ আমি অনেকের অভিভাবক ঠিকই, কিন্তু নিজের মনে আজও সেই বাবা-মায়ের প্রতি অভিমানী সন্তানটি হয়েই আছি। মেটানোর মতো সেই বটবৃক্ষ কিংবা আঁচল আজ আর নেই।

শূন্য ঘর ও চোখের নোনা জল:

ঈদের দুপুরে যখন আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ভরে ওঠে, হাসির হুল্লোড় ওঠে চারদিকে, ঠিক তখনই সেই চিরচেনা মানুষ দুটির অনুপস্থিতি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। সবার ভিড়েও তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় আর নিঃস্ব মানুষ বলে মনে হয়। মাথার ওপর থেকে অদৃশ্য সেই আশীর্বাদের হাত দুটি হারিয়ে যাওয়ার শোক উৎসবের আবহেও চোখের কোণ বেয়ে ঝরে পড়ে নোনা জল হয়ে।

রবের কাছে শেষ মিনতি:

ঈদ উৎসব একদিকে যেমন আনন্দের বার্তা আনে, অন্যদিকে অভিভাবকহীনদের জন্য এটি এক নিভৃত যন্ত্রণার নাম। তবুও জীবনের এই কঠিন বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। আজ আমরা সিজদায় অবনত হয়ে কেবল একটিই প্রার্থনা করতে পারি: 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা'। হে আল্লাহ, তুমি আমার মা-বাবাকে ওপারের জান্নাতে সেইভাবেই শান্তিতে রাখো, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে আগলে রেখেছিলেন। ওপারের জান্নাতে ভালো থাকুক পৃথিবীর সকল অভিভাবক।

ঈদ স্মৃতিকথা

স্মৃতির মণিকোঠায় শৈশবের ঈদ

খুররাম মুরাদ

শৈশবের আনন্দঘন সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে আজও এক অনন্য প্রশান্তি মনে ভিড় করে। শিশুমনের সারল্য, অকৃত্রিম আনন্দ, ভ্রাতৃত্ব আর অদম্য উৎসাহের সেই এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ছিল আমাদের ঈদের স্মৃতি। আজ যখন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যান্ত্রিক যুগে সহজলভ্য বিনোদনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তখন শৈশবের সেই ঈদের অকৃত্রিমতা আর প্রাণচাঞ্চল্য আমাদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। অবচেতন মনেই আমরা ফিরে যাই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, যখন ঈদের আনন্দ দানা বাঁধতে শুরু করত মূল উৎসবের অনেক আগে থেকেই। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের শুরুটা হতো শবেবরাতেরও বেশ কিছু দিন আগে, যখন মহল্লার মসজিদের মাইকে ইমাম সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা দিতেন পুণ্যময় রজনীর। সেই থেকেই প্রতি বাড়িতে শুরু হয়ে যেত এক উৎসবের তোড়জোড়। বড়রা তখন রোজা রাখতেন, আর আমাদের মতো ছোটদের আনন্দের কোনো অন্ত ছিল না। মনে পড়ে, তখনকার দিনে শবেবরাতে স্কুল ছুটি থাকত না; তাই স্কুল থেকে ফিরেই সব বন্ধুরা নির্দিষ্ট এক জায়গায় জড়ো হতাম। সেখানেই হতো ঈদের পরিকল্পনার প্রথম পাঠ। তার কিছুদিন পরেই যখন আকাশের ঈশান কোণে রমজানের সেই বাঁকা চাঁদ দেখা দিত, শুরু হতো পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্ব। আমাদের মধ্যে চলত রোজা রাখার মিষ্টি প্রতিযোগিতা। ভোরের সেহরিতে আধো ঘুমে উঠে দলবেঁধে মসজিদে যাওয়া, আর সন্ধ্যায় একইসঙ্গে ইফতার করার সেই আনন্দ ছিল অবর্ণনীয়। সেই সঙ্গে সারাক্ষণ চলত ঈদের নতুন পোশাক, কোথায় ঘুরতে যাওয়া হবে কিংবা কার কাছে কত সেলামি পাওয়া যেতে পারে - এসব নিয়ে অন্তহীন আলোচনা। গোটা রমজান মাসজুড়ে আমাদের শিশু-কিশোর মন সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটির জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত।

এক মাসের দীর্ঘ সংযমের মাঝেও ঈদের সেই অমোঘ টান যেন আমাদের এক মায়াবী জগতে বন্দি করে রাখত। আলোচনার সবচেয়ে বড় অংশ জুড়ে থাকত পোশাকের সংখ্যা আর ধরন। যদি কারো দুটি বা তার বেশি পোশাক হতো, তবে তার আনন্দের সীমা থাকত না। আবার কারো পোশাক কিনতে দেরি হলে

আমরা বন্ধুরা মিলে তাকে আশ্বস্ত করতাম; এমনকি কখনও কখনও তার বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে সবাই মিলে জোরালো দাবি জানাতাম যেন দ্রুত তাকেও নতুন জামা কিনে দেওয়া হয়। সেই সময়ে শহরতলী বা মফস্বলের পাড়াগুলোতে আমাদের অবাধ যাতায়াত ছিল, যা আজকের ডিজিটাল যুগে ভাবাই যায় না। তখন আসলে 'আমার' বলে কিছু ছিল না, যা ছিল তা ছিল 'আমাদের'। হোক সে আনন্দ কিংবা সম্বল।রমজানের শেষে যখন পশ্চিম আকাশে শাওয়ালের সেই কাঙ্ক্ষিত সরু একফালি চাঁদ দেখা দিত, তখন বাঁধভাঙা খুশির জোয়ার বয়ে যেত গোটা মহল্লায়। দীর্ঘ ত্যাগের পর মুমিন জীবনে এই দিনটি ছিল পুরস্কারের মতো, আর আমাদের কাছে তা ছিল প্রিয় 'চাঁদরাত'। পাড়ার যুবকদের উদ্যোগে আলোকসজ্জায় সেজে উঠত মসজিদ ও ঈদগাহ। মাইকে মাইকে ভেসে আসত ঈদের আনন্দগান। বাড়ির মেয়েদের মধ্যেও চলত প্রস্তুতির ধুম; হাতে মেহেদি লাগানোর জন্য ছোটরা ভিড় করত বড় আপাদের কাছে। সেই উত্তেজনায় আধো ঘুমে কাটত রাত। এরপর ফজরের আজান হতেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে যেত মসজিদের পানে। নামাজ শেষে ফিরে এসে শুরু হতো ঈদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। নতুন পোশাকে আতর আর সুরমা মেখে কেউ স্থানীয় ঈদগাহে যেত, আবার কেউ কেউ কাকভোরে কলকাতার রেড রোডের বড় জামাতে অংশ নিতে পাড়ি দিত।

আমরা কিশোররা দলবেঁধে সেমাই-লাচ্ছা খেয়ে যখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে যেতাম, তখন সব ভেদাভেদ আর ঝগড়া যেন বাতাসে মিলিয়ে যেত। ঈদের জামাতের সেই মহামিলনের দৃশ্যে বুক জড়িয়ে যেত। ধনী-দরিদ্রের কোনো প্রাচীর ছিল না সেদিন, ছিল শুধু ভ্রাতৃত্ব আর ঐক্যের মহোৎসব। ইমাম সাহেব যখন মিম্বর থেকে খুতবার মাধ্যমে আত্মত্যাগের মহিমা বর্ণনা করতেন, তখন মনে হতো এই শক্তিই সারাবছর আমাদের সঠিক পথ দেখাবে। নামাজের পর চলত সেই চিরাচরিত কোলাকুলির ধুম। চিরশত্রুরাও সেদিন একে অপরকে বুকে জড়িয়ে নিতে দ্বিধা করত না। আর শিশু-কিশোররা তো অবাধ মুক্ত পাখির মতো অদৃশ্য ডানায় ভর করে সমস্ত আত্মীয়-অনাত্মীয় পড়শী-প্রতিবেশীর কাছে ছুটে যেত, সকলের দোয়া ও সালাম নিত। প্রতিটি বাড়ির লাচ্ছা-পায়েস-সিমাই গোস্ত-রুটি সহ রকমারি আয়োজনের সুবাসে ম-ম- করত গোটা এলাকা। জান্নাতি আনন্দের এক চিলতে সুবাতাস বয়ে যেত গোটা দিনটিজুড়ে। শিশু কিশোর-কিশোরীরা বড়দের কাছে তাদের ঈদ-সালামীর দেনাপাওনা মিটিয়ে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। দেনাপাওনা মিটিয়ে ছুটে যেত মেলাতে। গোটা ঈদের দিনজুড়ে মলিনতার লেশ ছিল না।

তবে আজ যখন দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ড্রোন আর গ্রেনেডের শব্দে শিশুদের শৈশব পিষ্ট হচ্ছে, লাচ্ছা-সেমাইয়ের বদলে যেখানে রক্তের স্তূপ, তখন মনটা হুহু করে ওঠে। পৃথিবীর কোনো কোনো কোণায় আজও ঈদ আর জানাজা যেন একাকার হয়ে আছে। স্বার্থ আর দম্ভে কচি শিশুদের আনন্দ কেড়ে নেওয়া হলেও, তারা আজও তাদের দৃঢ় বিশ্বাসে ঈদের রূহকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেই সহায়-সম্বলহীন মানুষগুলোর অটুট ঈমানকে কুর্নিশ জানাই। আমাদের শৈশবের সেই অম্লান স্মৃতি আর বর্তমানের বাস্তবতা মিলেমিশে ঈদের এই চিরন্তন মহিমা প্রতিটি মুমিন হৃদয়ে চিরকাল অমলিন হয়ে থাকুক।

একজন মহিলার ঈদ-কথন

সামিমা সুলতানা

বাঙালির যাপনে উৎসব মানেই কেবল পঞ্জিকার লাল হরফে ঘেরা কোনো তারিখ নয়, বরং তা এক পশলা সতেজ বাতাসের মতো। দৈনন্দিন একঘেয়েমিকে ধুয়ে মুছে দিয়ে যায়। তবে একজন মহিলার কাছে ঈদের সংজ্ঞাটি কেবল উদযাপনের তিলকেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা, তিল তিল করে জমানো শ্রম এবং ভালোবাসার এক নিপুণ বুনন। চাঁদ দেখার ঘোষণার অনেক আগে থেকেই তার মনের গহিনে শুরু হয় এক উৎসবের প্রস্তুতি। বাড়ির পুরুষেরা যখন আকাশের দিগন্তে এক ফালি রুপোলি রেখার খোঁজ করেন, তখন একজন মহিলার চোখ থাকে অন্দরমহলের সূক্ষ্মতম খুঁটিনাটিতে। এই উৎসবের প্রকৃত প্রাণভোমরা আসলে লুকিয়ে থাকে অন্দরের সেই ব্যস্ততায়, যা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে একটি সাধারণ দিনকে 'ঈদ' করে তোলে।

প্রস্তুতির প্রথম ধাপ:

ঈদের অন্তত দিন দশেক আগে থেকেই শুরু হয় এক মহাযজ্ঞ। একজন মহিলার কাছে ঈদ মানে কেবল নিজেকে সাজানো নয়, বরং নিজের ঘরটিকেও নতুনের মতো সাজিয়ে তোলা। আলমারির ওপরের ধুলো ঝাড়া থেকে শুরু করে জানলার পর্দা ধোয়া কোনো কিছুই তার নজর এড়ায় না। ঘরের প্রতিটি কোণ পরিষ্কার করা, অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেলা এবং বিছানার চাদরে নতুনত্বের ছোঁয়া দেওয়া সবকিছুর মূলে থাকে এক গভীর তৃপ্তি। অন্দরমহল পরিপাটি না হলে যেন ঈদের পূর্ণতা আসে না। এই পরিচ্ছন্নতা আসলে মনেরই এক প্রতিফলন, যেখানে পুরনো গ্লানি মুছে নতুন আনন্দকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি চলে। ডাইনিং টেবিলের টেবিল ক্লথ থেকে শুরু করে সোফার কুশন কভার সবখানেই লাগে আভিজাত্যের স্পর্শ।

চাঁদ রাত:

ঈদের আগের রাত, যাকে আমরা 'চাঁদ রাত' বলি, সেটি একজন মহিলার জীবনে এক মহোৎসবের নাম। আকাশে এক ফালি চাঁদের দেখা মিললেই অন্দরে শুরু হয় আনন্দের গুঞ্জন। এই রাতের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো মেহেদি। এক সময় শিল-পাটায় মেহেদি পাতা বাটার সেই সুবাস এখন হয়তো টিউব মেহেদির ভিড়ে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার আবেদন কমেনি এতটুকু। বাড়ির ছোট-বড় সব মেয়েরা মিলে গোল হয়ে বসে

আপনার ঐতিহ্যের বর্ণনায় যা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল, তা হলো সন্ধ্যার পরের সেই বিশেষ আয়োজন। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে এলাচ-দারুচিনি আর ভাজা তেলের সুঘ্রাণ। ঈদের সন্ধ্যার পর 'ডাল পিঠে' আর 'আনরসা' তৈরির প্রস্তুতি চলে মাঝরাত অবধি। 'আনরসা'-এর সেই মিষ্টি সুবাস যখন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বোঝা যায় ঈদ দরজায় কড়া নাড়ছে। ডাল পিঠের নিখুঁত গড়ন আর স্বাদের আড়ালে থাকে একজন নারীর ধৈর্যের পরীক্ষা। রাত জেগে পিঠা তৈরি, ভাজা আর সেই সাথে পরিবারের সবার সাথে খুনসুটি দুইয়ে মিলে তৈরি হয় এক জাদুকরী পরিবেশ।

হাতে মেহেদির নকশা তোলা। এ এক অদ্ভুত আনন্দ। অন্যের হাতে সুন্দর আলপনা এঁকে দেওয়া আর নিজের হাতের রঙের গাঢ়ত্ব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা। চাঁদ রাতের এই নস্টালজিয়া টুকু ছাড়া ঈদ অপূর্ণ। হাতের তালুতে ফুটে ওঠা সেই গাঢ় লাল রঙটি যেন পরের দিনের উৎসবের সার্থকতার আগাম বার্তা দিয়ে যায়।

পাকশালার ব্যস্ততা:

চাঁদ রাতের মেহেদি উৎসবের সমান্তরালে রান্নাঘরে চলে এক নীরব বিপ্লব। আপনার ঐতিহ্যের বর্ণনায় যা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল, তা হলো সন্ধ্যার পরের সেই বিশেষ আয়োজন। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে এলাচ-দারুচিনি আর ভাজা তেলের সুঘ্রাণ। ঈদের সন্ধ্যার পর 'ডাল পিঠে' আর 'আনরসা' তৈরির প্রস্তুতি চলে মাঝরাত অবধি। 'আনরসা'-এর সেই মিষ্টি সুবাস যখন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বোঝা যায় ঈদ দরজায় কড়া নাড়ছে। ডাল পিঠের নিখুঁত গড়ন আর স্বাদের আড়ালে থাকে একজন নারীর ধৈর্যের পরীক্ষা। রাত জেগে পিঠা তৈরি, ভাজা আর সেই সাথে পরিবারের সবার সাথে খুনসুটি দুইয়ে মিলে তৈরি হয় এক জাদুকরী পরিবেশ। এই পিঠাগুলো কেবল খাবার নয়, বরং বংশপরম্পরায় চলে আসা এক সংস্কৃতির স্মারক।

ঈদের সকাল:

ঈদের দিন ভোরে যখন বাড়ির পুরুষেরা ও শিশুরা ঈদের নামাজের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে, একজন মহিলার দিন শুরু হয় তারও অনেক আগে। সবাই যখন নতুন পাঞ্জাবি পরে খুশবু মাখছে, তখন তিনি রান্নাঘরের চুলার তাপে ঘামছেন। সকালের নাস্তায় কী কী থাকবে, তা আগে থেকেই ছক কাটা থাকে।

সেমাই, লুচির পাশাপাশি লোনা খাবারের আয়োজন টেবিলে সাজিয়ে রাখা চাই। সকালে খাবার রেডি করে রাখাটা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। পুরুষেরা ঈদের নামাজে যাওয়ার আগেই টেবিলে মিষ্টিমুখের আয়োজন সম্পন্ন করা এবং তারা নামাজ থেকে ফেরার পর যেন গরম গরম খাবার পায়, তা নিশ্চিত করা তার প্রধান লক্ষ্য। নিজের সাজগোজের সময়টি তিনি বের করেন সবার শেষে, অনেকটা অবহেলায়। কিন্তু যখন বাড়ির পুরুষেরা নামাজ পড়ে ফিরে কোলাকুলি করেন এবং খাবার টেবিলে বসেন, তখন তাদের তৃপ্তিমুখ দেখেই যেন মহিলার অর্ধেক ঈদ উদযাপন হয়ে যায়।

ঈদের নামাজ ও অন্দরের প্রার্থনা:

বাড়ির পুরুষেরা যখন ঈদগাহে যান, তখন বাড়িতে এক ধরনের স্তব্ধতা নামে। এই সময়টুকু একজন মহিলার জন্য নিজের সাথে এবং স্রষ্টার সাথে কথা বলার একান্তে পাওয়া মুহূর্ত। তিনি জায়নামাজে বসেন, নিজের পরিবারের মঙ্গলের জন্য দোয়া করেন। এই প্রার্থনায় কেবল নিজের ঘর নয়, থাকে সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি ও সুস্থতার কামনা। নামাজ শেষে যখন পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে কুশল বিনিময় শুরু হয়, তখন থেকেই উৎসবের সামাজিক রূপটি প্রকাশ পায়।

আপ্যায়ন ও আতিথিয়েতা:

বাঙালি মহিলার ঈদ মানেই রান্নাবান্নার এক বিশাল ক্যানভাস। দুপুরের পোলাও, বিরিয়ানি বা কোরমা থেকে শুরু করে বিকালের ফাস্টফুড সবকিছুতেই থাকে নিপুণ ছোঁয়া। শুধু রান্না নয়, তা সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করাটাও এক অনন্য শিল্প। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যখন ঘরে আসেন, তাদের প্লেটে যত্নে খাবার তুলে দেওয়া আর রান্নার প্রশংসা শোনার মধ্যে যে অনাবিল আনন্দ থাকে, তার কোনো তুলনা হয় না। এই সময়টাতে তিনি যেন ঘরের লক্ষ্মী। প্রতিটি

অতিথির পছন্দ-অপছন্দের খেয়াল রাখা, কার চায়ে চিনি কম লাগবে আর কার ডায়েটের জন্য মিষ্টি বারণ।ছোট ছোট খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তিনি মাথায় রাখেন নিখুঁতভাবে।

বাপের বাড়ির টান:

ঈদের দুপুরে বা বিকেলে যখন একটু অবসরের সুযোগ মেলে, তখন মনে পড়ে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। নিজের বাপের বাড়ির ঈদ। যেখানে তিনি ছিলেন আদরের মেয়ে, যার কোনো কাজের চাপ ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে সবার মন জুগিয়ে চলার মাঝেও বাপের বাড়িতে যাওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা বা ফোনের ওপাশে মায়ের গলার স্বর শোনাটাই তার কাছে পরম পাওয়া। সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে মা যেভাবে তাকে আগলে রাখতেন, আজ তিনি নিজেই সেই 'মা' বা 'গৃহিণী' হয়ে অন্যদের আগলে রাখছেন।

উৎসবের মূল সুর:

একজন মহিলার ঈদ মানেই হলো 'আগলে রাখা'। পরিবারকে ভালোবাসার সুতোয় বেঁধে রাখা, আগত অতিথিদের হাসিমুখে বিদায় জানানো আর নিজের পরিশ্রম দিয়ে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলা। ঘর পরিষ্কার থেকে শুরু করে সকালের নাস্তা তৈরি, মেহেদির আলপনা আর সন্ধ্যার পিঠাপুলির তৈরির মতো প্রতিটি কাজের পেছনে থাকে এক নিঃস্বার্থ মমতা। দিনশেষে যখন সবাই শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মেকআপ মুছতে মুছতে তিনি যখন নিজের প্রতিচ্ছবি দেখেন, তখন সেই ক্লান্ত চোখের কোণেও এক আকাশ সার্থকতা চিকচিক করে ওঠে। কারণ তিনি জানেন, তার হাতের ছোঁয়াতেই এ বছরের ঈদটি পূর্ণতা পেয়েছে।

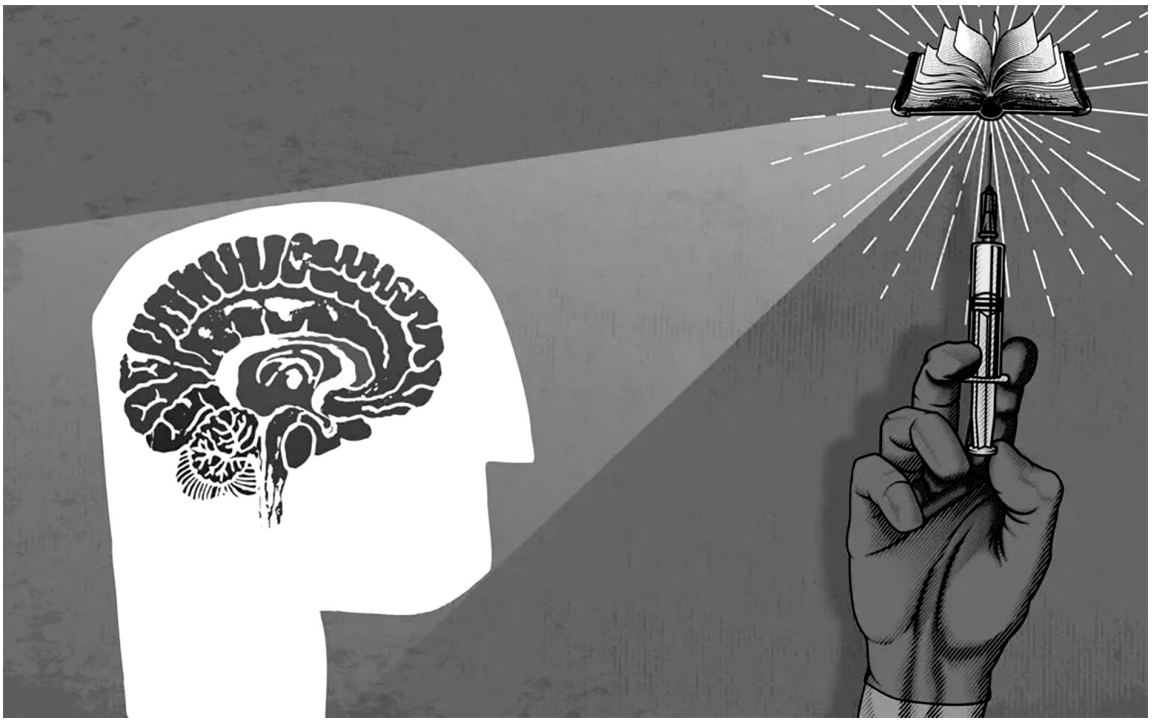

মিডিয়া ও ইসলামোফোবিয়ার সমাজতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ

এস.আলম

পর্দায় যখন দাড়িওয়ালা, চোখে সুরমা দেওয়া আর মাথায় ফেজ টুপি পরা কোনো চরিত্র ঢোকে, খেয়াল করে দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা হঠাৎ কেমন সিরিয়াস আর থমথমে হয়ে যায়। আমাদের অবচেতন মন মুহূর্তের মধ্যে হিসেব কষে ফেলে, এই তো ভিলেন! আবার টিভি খুললে ব্রেকিং নিউজের স্ক্রলে কোনো বিস্ফোরণ বা হামলার খবরে যখন নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নাম জড়িয়ে যায়, তখন মূলধারার নিউজ অ্যাংকরদের গলার স্বর আর শরীরী ভাষাই যেন একতরফা রায় শুনিয়ে দেয়। শুধু সিনেমার পর্দা বা টিভির ব্রেকিং নিউজ নয়, আমাদের প্রাত্যহিক সমাজজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অত্যন্ত সন্তর্পণে ঢুকে গেছে এই অদ্ভুত আতঙ্ক আর সন্দেহের বাতাবরণ। এই যে একটি গোটা সম্প্রদায়ের প্রতি কাঠামোগত ভয় বা অস্বস্তি, আধুনিক বিশ্বে এর পোশাকি নাম 'ইসলামোফোবিয়া'। কিন্তু এই ভয় কি আমাদের জন্মগত বা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি? সমাজবিজ্ঞান বলছে, একেবারেই নয়। বরং এটি সামাজিকভাবে নির্মিত (Socially constructed) এক জটিল মনস্তত্ত্ব। সমাজতত্ত্বের ভাষায়, এটি হলো এমন এক সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া, যেখানে রাজনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং সমাজব্যবস্থা মিলে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে 'অপর' (The Other) বা খলনায়ক হিসেবে দাঁড় করায়। আসুন, কোনো আবেগ বা বিতর্কের জায়গা থেকে নয়, বরং আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের নিরেট লেন্স দিয়ে সমাজদেহে বাসা বাঁধা এই ইসলামোফোবিয়া এবং তার নেপথ্যের কারখানার আজ একটু বিস্তারিত ব্যবচ্ছেদ করা যাক।

১. জঁ বদ্রিয়ার 'হাইপার-রিয়েলিটি' এবং 'সিমুলাক্রা' (আসল বাস্তবের মৃত্যু)

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিক জঁ বদ্রিয়া (Jean Baudrillard) এক অদ্ভুত অথচ ভয়ংকর সত্যি কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, আধুনিক বিশ্ব এবং প্রচারযন্ত্র আমাদের সামনে এমন কিছু নকল ছবি, প্রতীক বা ইমেজ তৈরি করে, যার বাস্তবের মাটিতে কোনো অস্তিত্বই নেই। বদ্রিয়া এই কাল্পনিক বা নকল ছবিগুলোর নাম দিয়েছেন 'সিমুলাক্রা' (Simulacra)। কিন্তু মুশকিল হলো, চারপাশের পর্দা আর প্রচারের আলোয় এই নকল ছবিগুলো এত নিখুঁতভাবে এবং এত বারবার আমাদের সামনে আসতে থাকে যে, একটা সময় ওই কাল্পনিক জগতটাই আমাদের মগজে আসলের চেয়েও বেশি সত্যি বলে মনে হতে শুরু করে। বদ্রিয়া সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম দিয়েছেন 'হাইপার-রিয়েলিটি' (Hyperreality) বা পরাবাস্তবতা। সহজ কথায়, যখন 'নকল' এসে 'আসল'-কে খুন করে তার জায়গাটা পুরোপুরি দখল করে নেয়, সেটাই হাইপার-রিয়েলিটি।

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে এটি কীভাবে কাজ করে?

ইসলামোফোবিয়ার মনস্তত্ত্ব বুঝতে গেলে বদ্রিয়ার এই তত্ত্বটি একেবারে অব্যর্থ। বিশ্বজুড়ে ইসলাম এবং মুসলিমদের নিয়ে ঠিক এই ধরনেরই একটা 'হাইপার-রিয়েলিটি' তৈরি করা হয়েছে। একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন, সমাজের সাধারণ একজন মানুষ হয়তো তাঁর পুরো জীবনে কোনোদিন বাস্তবের মাটিতে কোনো উগ্রবাদীর মুখোমুখি হননি। কিন্তু দিনের পর দিন নিউজ চ্যানেলের প্যানেল বিতর্ক, হলিউডের সিনেমা, আর থ্রিলার ওয়েব সিরিজের বদৌলতে তাঁর মগজে ওই বিশেষ পোশাক পরা 'সন্ত্রাসী', 'ধর্মান্ধ' কিংবা 'অসহায় নারী' চরিত্রগুলোর অসংখ্য 'সিমুলাক্রা' বা ইমেজ গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

এর ফলটা হয় মারাত্মক এবং সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত গভীর। ওই সাধারণ মানুষটির পাশের ফ্ল্যাটেই হয়তো একজন অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, সাদামাটা মুসলিম পরিবার বাস করে। কিন্তু বদ্রিয়ার তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষটি তাঁর রক্তমাংসের মুসলিম প্রতিবেশীকে দেখেও স্বস্তি পান না; বরং অবচেতন মনে সেই প্রতিবেশীর মধ্যে টিভির পর্দার ওই কাল্পনিক চরিত্রটাকেই খুঁজতে থাকেন। অর্থাৎ, বাস্তবের একজন জলজ্যান্ত মানুষের চেয়ে প্রচারযন্ত্রের তৈরি করা ওই কাল্পনিক 'ভিলেন' বা ভয়ের ইমেজটাই সমাজের কাছে অনেক বেশি 'বাস্তব' এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এভাবেই একটি গোটা সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় এবং আসল পরিচয়টা হাইপার-রিয়েলিটির ওই নকল আতঙ্কের গহ্বরে চিরতরে হারিয়ে যায়।

২. এডওয়ার্ড সাঈদের 'ওরিয়েন্টালিজম' ('আমরা' বনাম 'ওরা'-র সুকৌশলী রাজনীতি)

ফিলিস্তিনি-মার্কিন তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড সাঈদ (Edward Said) ১৯৭৮ সালে তাঁর যুগান্তকারী বই 'ওরিয়েন্টালিজম' (Orientalism)-এ দেখিয়েছেন, পশ্চিমা বিশ্ব (Occident) কীভাবে সুকৌশলে প্রাচ্য বা এশীয় সমাজকে (Orient) একটা নির্দিষ্ট নেতিবাচক ফ্রেমে বন্দি করেছে। পশ্চিমা সাহিত্য, শিল্প ও মিডিয়া সবসময় প্রাচ্যকে (বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে) রহস্যময়, অসভ্য, অযৌক্তিক এবং পশ্চাৎপদ হিসেবে দেখিয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের 'আধুনিক' ও 'সভ্য' বলে দাবি করা এবং প্রাচ্যের ওপর নিজেদের ঔপনিবেশিক শাসনকে বৈধতা দেওয়া। অর্থাৎ, পশ্চিমা বিশ্ব বোঝাতে চাইল তোমরা অসভ্য, নিজেদের ভালো বোঝো না, তাই আমরা 'সভ্য' মানুষেরা তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি!

কীভাবে মুসলিমদের 'অপর' (The Other) বানানো হয়?

আজকের পৃথিবীতে সরাসরি উপনিবেশ হয়তো নেই, কিন্তু সাঈদের বলা সেই 'ওরিয়েন্টালিস্ট' চশমাটা বিশ্ব রাজনীতি আর মিডিয়ার চোখ থেকে আজও খোলেনি। বরং আজকের দিনে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিক হাতিয়ার হলো এটি। সমাজতত্ত্বের ভাষায় একে বলে 'আদারিং' (Othering) বা কাউকে সচেতনভাবে 'অপর' হিসেবে নির্মাণ করা। আজকের মূলধারার নিউজ চ্যানেল বা বিশ্ব-রাজনীতির বয়ানগুলো একটু খেয়াল করলেই দেখবেন, সেখানে প্রতিনিয়ত মুসলিম সম্প্রদায়কে 'আমরা'-র বাইরের কেউ, অর্থাৎ 'ওরা' বা 'অপর' হিসেবে তুলে ধরা হয়। সুকৌশলে এমন একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়, যেন ইসলাম এবং আধুনিক সভ্যতা একে অপরের জন্মশত্রু। সমীকরণটা মিডিয়া খুব সহজ করে দিয়েছে। পশ্চিম বা আধুনিক বিশ্ব মানেই হলো বিজ্ঞান, প্রগতি, মানবাধিকার আর গণতন্ত্র; আর ইসলাম মানেই হলো কেবল ধর্মান্ধতা, পশ্চাৎপদতা আর সহিংসতা। এই

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) ১৯২২ সালে তাঁর কালজয়ী বই 'পাবলিক ওপিনিয়ন' (Public Opinion)-এ মানুষের মনস্তত্ত্বের এক অমোঘ সত্য তুলে ধরেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে উপহার দেন একটি যুগান্তকারী শব্দ- 'স্টেরিওটাইপ' (Stereotype)। লিপম্যান বললেন, এই পৃথিবীটা বড্ড বড়, জটিল আর বৈচিত্র্যময়। আমাদের মস্তিষ্কের পক্ষে সমাজের প্রতিটি মানুষকে আলাদাভাবে চেনা, বোঝা বা বিচার করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের মস্তিষ্ক একটা শর্টকাট বা সহজ রাস্তা খোঁজে।

'আমরা বনাম ওরা'-র বিভাজন রেখাটি এতটাই নিখুঁতভাবে টানা হয়েছে যে, সমাজের সাধারণ মানুষের মনে অবচেতনভাবেই এই ধারণা জন্মায়- একজন মানুষ বোধহয় একইসঙ্গে আধুনিক এবং ধর্মপ্রাণ মুসলিম হতে পারে না। সাঈদের এই তত্ত্ব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ইসলামোফোবিয়া আসলে কোনো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ভয় নয়, বরং এটি শত শত বছর ধরে চলে আসা পশ্চিমা মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্যেরই একটি আধুনিক রূপ।

৩. ওয়াল্টার লিপম্যানের 'স্টেরিওটাইপিং থিওরি' (মগজের শর্টকাট ও ছাঁচে ফেলার কারসাজি)

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক এবং সমাজতাত্ত্বিক ওয়াল্টার লিপম্যান (Walter Lippmann) ১৯২২ সালে তাঁর কালজয়ী বই 'পাবলিক ওপিনিয়ন' (Public Opinion)-এ মানুষের মনস্তত্ত্বের এক অমোঘ সত্য তুলে ধরেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে উপহার দেন একটি যুগান্তকারী শব্দ- 'স্টেরিওটাইপ' (Stereotype)। লিপম্যান বললেন, এই পৃথিবীটা বড্ড বড়, জটিল আর বৈচিত্র্যময়। আমাদের মস্তিষ্কের পক্ষে সমাজের প্রতিটি মানুষকে আলাদাভাবে চেনা, বোঝা বা বিচার করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের মস্তিষ্ক একটা শর্টকাট বা সহজ রাস্তা খোঁজে। আমরা অবচেতনভাবেই আমাদের মাথার ভেতরে কিছু তৈরি-করা ছবি বা 'Pictures in our heads' জমিয়ে রাখি এবং যখনই কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাউকে দেখি, আমরা আর ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে বিচার করি না; বরং ওই জমিয়ে রাখা ছবির ফ্রেম বা ছাঁচেই তাঁকে ফেলে দিই। সমাজতত্ত্বের ভাষায় একেই বলে স্টেরিওটাইপিং।

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে মিডিয়া কীভাবে এই 'শর্টকাট'-এর অপব্যবহার করে?

একটু ভেবে দেখুন, সারা পৃথিবীতে প্রায় ২০০ কোটি মুসলিমের বাস। ইন্দোনেশিয়ার একজন মুসলিমের ভাষা, সংস্কৃতি বা পোশাকের সাথে মরক্কো বা মধ্যপ্রাচ্যের একজন মুসলিমের বিস্তর ফারাক। কিন্তু আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং বিনোদন জগত এই বিশাল বৈচিত্র্যকে বেমালুম মুছে দিয়ে, অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে মানুষের মস্তিষ্কের ওই 'শর্টকাট' নেওয়ার প্রবণতাকেই হাতিয়ার বানিয়েছে। মিডিয়া এই ২০০ কোটি মানুষকে মূলত দু'টি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নেতিবাচক ছাঁচে বা ফ্রেমে আটকে ফেলেছে:

'রাগী ও সহিংস' পুরুষের মিথ: পশ্চিমা বিশ্বে বা মূলধারার মিডিয়ায় একটা অদ্ভুত দ্বিচারিতা বা ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড কাজ করে। কোনো শ্বেতাঙ্গ বা অন্য ধর্মের কেউ যদি বন্দুক হাতে স্কুলে বা শপিং মলে হামলা চালায়, মিডিয়া খুব যত্ন করে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে এবং তাকে 'লোন উলফ' (Lone Wolf) বা মানসিকভাবে অসুস্থ একজন বিচ্ছিন্ন অপরাধী হিসেবে লেবেল দেয়। কিন্তু অপরাধীর নাম যদি কোনো মুসলিম হয়, তবে মুহূর্তের মধ্যে সেটা ব্যক্তি-অপরাধ থেকে বদলে হয়ে যায় 'গ্লোবাল টেররিজম' বা বৈশ্বিক সন্ত্রাস। লিপম্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী, মিডিয়া অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলিম পুরুষ মানেই রাগী, আগ্রাসী এবং সম্ভাব্য সন্ত্রাসী। এই স্টেরিওটাইপটি সমাজের মগজে গেঁথে দিয়েছে।

'উদ্ধার পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা' অসহায় নারী: ইসলামোফোবিয়ার আরেকটি বড় শিকার হলেন মুসলিম নারীরা। পশ্চিমা মিডিয়া তাঁদের সবসময় অবলা, অসহায় এবং পুরুষতান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট হিসেবে স্টেরিওটাইপ করে। হিজাব বা বোরকাকে

ক্রমাগত 'নিপীড়নের প্রতীক' হিসেবেই প্রচার করা হয়। অথচ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, বহু মুসলিম নারীর কাছে হিজাব তাঁদের আত্মপরিচয়, শালীনতা, ক্ষমতায়ন এবং নিজস্ব চয়েস বা পছন্দের প্রতীক হতে পারে। কিন্তু একজন মুসলিম নারী যে একইসাথে ধর্মপ্রাণ এবং সমাজ-রাষ্ট্রের সফল নীতিনির্ধারক হতে পারেন। এই ন্যারেটিভ বা গল্পটা মিডিয়া সচেতনভাবেই ব্ল্যাকআউট করে দেয় বা চেপে যায়। কারণ, এই সফলতার গল্পটা তাদের তৈরি করা ওই 'অসহায় নারী'-র স্টেরিওটাইপের ছাঁচে ঠিক ফিট করে না!

ফলে, লিপম্যানের তত্ত্ব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইসলামোফোবিয়া আসলে কোনো আচমকা গজিয়ে ওঠা ভয় নয়; এটি হলো মানুষের মস্তিষ্কের শর্টকাট নেওয়ার প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে, মিডিয়ার তৈরি করা এক নিখুঁত এবং কাঠামোগত মগজধোলাই।

৪. স্ট্যানলি কোহেনের 'মরাল প্যানিক' (কাল্পনিক জুজু বুড়ির ভয়)

স্ট্যানলি কোহেন (Stanley Cohen) তাঁর বিখ্যাত তত্ত্বে দেখিয়েছেন, মিডিয়া কীভাবে সমাজের মধ্যে একটা অহেতুক আতঙ্ক বা 'মরাল প্যানিক' (Moral Panic) তৈরি করে। মিডিয়া সমাজের কোনো একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে 'ফোক ডেভিল' (Folk Devil) বা কাল্পনিক খলনায়ক হিসেবে দাঁড় করায় এবং প্রচার করে যে, এই গোষ্ঠীর জন্যই সমাজের সব নিয়মকানুন এবং মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে কাজ করে এই ভয়ের রাজনীতি?

পশ্চিমা বিশ্ব এবং আধুনিক ইসলামোফোবিয়ার চালচিত্র বুঝতে গেলে কোহেনের এই তত্ত্বটি একেবারে অব্যর্থ। ৯/১১-এর পর থেকে বিশ্ব রাজনীতি এবং মূলধারার মিডিয়া অত্যন্ত সচেতনভাবে ইসলাম এবং মুসলিমদের সেই 'ফোক ডেভিল' বা কাল্পনিক জুজু হিসেবে বেছে নিয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলেই এর পেছনের রাজনীতিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেকোনো সমাজ বা রাষ্ট্রেই বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি, বাসস্থান সংকট বা ত্রুটিপূর্ণ অভিবাসন নীতি (Immigration policy) হলো সরকারের কাঠামোগত ব্যর্থতা। সরকার যখন এই আসল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হিমশিম খায়, তখন সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে বাঁচতে তাদের একটা 'বলির পাঁঠা' বা ডাইভারশন দরকার হয়। ঠিক এই জায়গাতেই মিডিয়া এবং রাজনীতিকরা হাত মেলায়। তারা সুকৌশলে এমন একটা 'মরাল প্যানিক' বা নৈতিক আতঙ্ক তৈরি করে, যেন দেশের ভগ্ন অর্থনীতি বা কর্মসংস্থান কোনো সমস্যাই নয়, বরং আধুনিক সভ্যতা ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো মুসলিম সম্প্রদায়! টিভির প্রাইম টাইম ডিবেট আর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় দিনের পর দিন এই আতঙ্কের চাষাবাদ হতে থাকে। বোঝানো হয়, "ওরা এসে আমাদের দেশ দখল করে নিচ্ছে, আমাদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছে, আমাদের সংস্কৃতি নষ্ট করে দিচ্ছে।" এর ফলটা হয় জাদুকরী এবং ভয়ংকর! সাধারণ মানুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনের আসল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো বেমালুম ভুলে গিয়ে, পাশের পাড়ার ওই কাল্পনিক জুজুকে ভয় পেতে শুরু করে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কাঠামোগত ব্যর্থতাগুলোকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ধর্ম ও সংস্কৃতির মোড়কে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। কোহেনের তত্ত্ব অনুযায়ী, ইসলামোফোবিয়া তাই কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ভয় নয়, বরং এটি রাষ্ট্র ও মিডিয়ার তৈরি করা এক নিখুঁত 'মরাল প্যানিক' বা আতঙ্কের কারবার।

৫. হাওয়ার্ড বেকার এবং এভারেট হিউজ (লেবেলিং থিওরি ও তকমার রাজনীতি)

ষাটের দশকে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী হাওয়ার্ড বেকার (Howard Becker) তাঁর যুগান্তকারী বই 'আউটসাইডারস' (Outsiders)-এ অপরাধবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণার ভিত একেবারে নাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'লেবেলিং থিওরি' (Labeling Theory) বা তকমা-তত্ত্বে তিনি এক চমকপ্রদ দাবি করলেন। বেকার বললেন, কোনো কাজ বা আচরণ নিজে থেকে অপরাধ বা বিচ্যুতি (Deviance) নয়। একটা কাজ তখনই অপরাধ হয়ে ওঠে, যখন ক্ষমতাবান সমাজ সেই কাজটির গায়ে 'অপরাধ' বা 'বিচ্যুতি'-র তকমা সেঁটে দেয়। অর্থাৎ, অপরাধীর জন্ম হয় সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং লেবেল দেওয়ার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে।

এই তত্ত্বের পরিপূরক হিসেবে আসে সমাজবিজ্ঞানী এভারেট হিউজ (Everett Hughes)-এর দেওয়া অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ধারণা, যার নাম 'মাস্টার স্ট্যাটাস' (Master Status), যা বেকার তাঁর তত্ত্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। হিউজ এবং বেকারের

মতে, সমাজ যখন কাউকে একবার 'চোর', 'পাগল' বা 'জঙ্গি' বলে লেবেল দিয়ে দেয়, তখন ওই একটামাত্র তকমাই ওই মানুষটির প্রধান বা মাস্টার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষটার ভেতরে যে আরও অনেকগুলো পরিচয় ছিল- হয়তো সে একজন খুব ভালো বাবা, চমৎকার গান গায়, বা খুব সৎ একজন কর্মী। সমাজের চোখে ওই গুণগুলো এক লহমায় মুছে যায়। সমাজের কাছে তার একটাই পরিচয় টিকে থাকে, আর তা হলো ওই নেতিবাচক লেবেলটি।

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে এই 'তকমার রাজনীতি' কীভাবে কাজ করে?

আধুনিক বিশ্বে ইসলামোফোবিয়া বুঝতে হলে এই 'লেবেলিং থিওরি' এবং 'মাস্টার স্ট্যাটাস'-এর প্রয়োগটা বোঝা সবচেয়ে জরুরি। বিশ্বজুড়ে মিডিয়া এবং রাষ্ট্রযন্ত্র অত্যন্ত সুকৌশলে ক্ষমতা প্রয়োগ করে মুসলিমদের ধর্মীয় পোশাক ও রীতিনীতির গায়ে 'সন্দেহজনক' বা 'বিপজ্জনক'-এর লেবেল সেঁটে দিয়েছে। একজন মানুষের দাড়ি, মাথায় টুপি, নারীদের হিজাব বা বোরকা, এমনকি 'আল্লাহু আকবার' বা 'ইনশাআল্লাহ'-এর মতো প্রাত্যহিক শব্দগুলোর গায়েও মিডিয়া জঙ্গিবাদের অদৃশ্য তকমা লাগিয়ে রেখেছে।

এর বাস্তব পরিণতিটা হয় মর্মান্তিক। একটু ভেবে দেখুন, অফিসফেরতা মেট্রো বা লোকাল ট্রেনে যখন দাড়ি-টুপি পরা বা হিজাব পরিহিতা কোনো মানুষ ওঠেন, তখন সহযাত্রীদের একটা বড় অংশ অবচেতনভাবেই একটু গুটিয়ে যান বা সন্দেহের চোখে তাকান। কেন? কারণ মিডিয়ার পরিয়ে দেওয়া ওই লেবেলটা তখন কাজ করতে শুরু করেছে। এভারেট হিউজের তত্ত্ব অনুযায়ী, ওই মুহূর্তে ওই মুসলিম মানুষটির ধর্ম বা পোশাকই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর 'মাস্টার স্ট্যাটাস'। তিনি যে হয়তো একজন নামকরা হার্টের ডাক্তার, একজন মেধাবী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, একজন ট্যাক্স-দেওয়া ছাপোষা সৎ নাগরিক, কিংবা শুধুই একজন ক্লান্ত বাবা যিনি সন্তানের জন্য খেলনা কিনে বাড়ি ফিরছেন, তাঁর এই আসল পরিচয়গুলো ওই 'সন্দেহজনক'-এর লেবেলের নিচে চিরতরে চাপা পড়ে যায়।

সহযাত্রীরা তাঁর ভেতরে আর ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারকে দেখতে পান না, তাঁরা কেবল মিডিয়ার তৈরি করে দেওয়া ওই 'লেবেল' বা তকমাটাকেই দেখেন। হাওয়ার্ড বেকারের তত্ত্ব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ইসলামোফোবিয়া আসলে কেবল একটা ভয় নয়; এটি হলো সুপরিকল্পিতভাবে একটি গোটা সম্প্রদায়ের বহুমুখী মানবিক পরিচয়গুলোকে মুছে দিয়ে, তাদের কপালে একটা ভয়ের তকমা সেঁটে দেওয়ার কাঠামোগত রাজনীতি।

৬. জর্জ গার্বনারের 'কাল্টিভেশন থিওরি' (মগজে আতঙ্কের চাষবাস এবং 'মিন ওয়ার্ল্ড সিনড্রোম')

যোগাযোগ এবং গণমাধ্যম অধ্যয়নের জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রামাণ্য তত্ত্বগুলোর একটি হলো হাঙ্গেরিয়ান-আমেরিকান অধ্যাপক জর্জ গার্বনার (George Gerbner)-এর 'কাল্টিভেশন থিওরি' (Cultivation Theory)। ষাটের দশকে গার্বনার এক অদ্ভুত গবেষণা শুরু করেন, টেলিভিশনের পর্দা কীভাবে মানুষের বাস্তব পৃথিবী দেখার চোখ পাল্টে দেয়? তাঁর তত্ত্বটি খুবই সহজ, কিন্তু এর প্রভাব মারাত্মক। গার্বনার বললেন, যারা নিয়মিত এবং প্রচুর পরিমাণে টিভি দেখে (যাদের তিনি 'Heavy Viewers' বলেছেন), তারা বাস্তবের দুনিয়াটাকে টিভির কাল্পনিক দুনিয়ার মতোই ভাবতে শুরু করে। গার্বনার এই তত্ত্বের সাথে একটা অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক অসুখের কথা বললেন, যার নাম 'মিন ওয়ার্ল্ড সিনড্রোম' (Mean World Syndrome)। অর্থাৎ, টিভিতে সারাদিন খুন, জখম, মারামারি আর ষড়যন্ত্র দেখতে দেখতে ওই 'হেভি ভিউয়ার'-দের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে, পৃথিবীটা খুব ভয়ংকর, স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর একটা জায়গা।

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে এই আতঙ্কের চাষাবাদ হয়?

আধুনিক নিউজ চ্যানেল এবং অ্যালগরিদম-চালিত সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে গার্বনারের এই 'মিন ওয়ার্ল্ড সিনড্রোম' ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারখানায় পরিণত হয়েছে। একটু ভেবে দেখুন, আমাদের চারপাশে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁদের দিনের শুরু এবং শেষ হয় খবরের চ্যানেলের ওই চিৎকার-চেঁচামেচি করা ডিবেট শো বা উত্তেজক প্রাইম টাইম নিউজ দেখে। দিনের পর দিন ওই চ্যানেলগুলোতে মুসলিমদের নিয়ে কেবলই নেতিবাচক, সন্দেহজনক এবং উসকানিমূলক খবর সম্প্রচারিত হতে থাকে।

গার্বনারের তত্ত্ব অনুযায়ী, এই মানুষগুলোর মগজে মিডিয়া প্রতিনিয়ত একটা কাল্পনিক আতঙ্কের বীজ 'কাল্টিভেট' বা চাষ করতে থাকে। এর ফলে, বাস্তবের

পৃথিবীতে হয়তো তাঁরা অত্যন্ত নিরাপদ একটা পাড়ায় বাস করেন, কিন্তু ওই 'মিন ওয়ার্ল্ড সিনড্রোম'-এ ভোগার কারণে তাঁদের মনে হতে থাকে, চারপাশে কেবলই ষড়যন্ত্র চলছে! তাঁরা ভাবতে শুরু করেন যে, তাঁদের পাশের ফ্ল্যাটের ওই হাসিখুশি মুসলিম প্রতিবেশীটি হয়তো ভেতরে ভেতরে কোনো দেশবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত। গার্বনার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, মিডিয়া কেবল খবরই বিক্রি করে না; বরং তারা অত্যন্ত সুকৌশলে আমাদের মগজে একটা গোটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং অবিশ্বাসের চাষাবাদ করে।

৭. রবার্ট মার্টনের 'সেল্ফ-ফুলফিলিং প্রোফেসি' (মিথ্যা যখন সত্যি হয়ে ফিরে আসে)

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট কে. মার্টন (Robert K. Merton) ১৯৪৮ সালে সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে যুগান্তকারী এবং কিছুটা গা-ছমছমে একটা তত্ত্ব দিলেন। এর নাম 'সেল্ফ-ফুলফিলিং প্রোফেসি' (Self-fulfilling Prophecy) বা স্ব-পূরণকারী ভবিষ্যদ্বাণী। তত্ত্বটার মূল কথা হলো, একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বা ভুল ধারণাকে সমাজ যদি সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে, তবে মানুষের আচরণ সেই মিথ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। আর সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, এই ক্রমাগত নেতিবাচক আচরণ এবং চাপের ফলে শেষ পর্যন্ত ওই মিথ্যাটাই বাস্তবে পরিণত হয়!

ইসলামোফোবিয়া এবং সেই মিথ্যার ফাঁদ:

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে মার্টনের এই তত্ত্বটা যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। মিডিয়া যখন সুপরিকল্পিতভাবে একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে (এখানে মুসলিমদের) ক্রমাগত 'সন্ত্রাসী', 'বিপজ্জনক' বা 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি' বলে দাগিয়ে দেয়, তখন সমাজ সেই মিথ্যেটাকেই সত্যি বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এর বাস্তব পরিণতিটা হয় ভয়ানক। ওই মিথ্যা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সমাজ ওই সম্প্রদায়টিকে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন (Marginalized) করতে থাকে। তাদের চাকরি দেওয়া হয় না, ভালো জায়গায় ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হয় না, রাস্তায় বা কর্মক্ষেত্রে পদে পদে তাদের অপদস্থ করা হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের শিকার বানানো হয়। এই ক্রমাগত বঞ্চনা, অপমান আর সামাজিক বয়কটের ফলে একটা গোটা প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের মনে গভীর ক্ষোভ, হতাশা আর এলিয়েনেশনের (Alienation) জন্ম হয়।

সেই তীব্র ক্ষোভ এবং অস্তিত্বের সংকট থেকে ওই সম্প্রদায়ের গুটিকয়েক তরুণ যখন সত্যিই বিপথে পা বাড়ায় তখন সমাজ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলে, "দেখলে তো! আমরা আগেই বলেছিলাম এরা এমনই উগ্র আর বিপজ্জনক।" রবার্ট মার্টনের তত্ত্ব আমাদের বোঝায়, সমাজ আসলে তার নিজের তৈরি করা মিথ্যা তকমা দিয়ে একটা সম্প্রদায়কে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দেয়; আর তারপর সেই মিথ্যেটা যখন সত্যি হয়ে ফিরে আসে, তখন পুরো দায়টা নির্লজ্জভাবে ওই প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ঘাড়েই চাপিয়ে দেওয়া হয়।

৮. কিম্বার্লি ক্রেনশর 'ইন্টারসেকশনালিটি' (পরিচয়ের গোলকধাঁধা এবং মুসলিম নারীদের ত্রিমুখী লড়াই)

মার্কিন আইনজ্ঞ এবং সমাজতাত্ত্বিক কিম্বার্লি ক্রেনশ (Kimberl Crenshaw) ১৯৮৯ সালে নারীবাদের ইতিহাসে এবং সমাজবিজ্ঞানে একটি যুগান্তকারী ধারণা নিয়ে আসেন, যার নাম 'ইন্টারসেকশনালিটি' (Intersectionality) বা আন্তঃছেদীয়তা। ক্রেনশ অত্যন্ত চমৎকার একটি যুক্তি দিলেন। তিনি বললেন, একটি সমাজে একজন মানুষ কেবল তাঁর একটিমাত্র পরিচয়ের কারণে শোষিত বা বৈষম্যের শিকার হন না। বরং তাঁর লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, এবং অর্থনৈতিক শ্রেণি- এই সবকটি পরিচয় যখন একবিন্দুতে এসে মেশে (Intersect করে), তখন শোষণের ধরনটা পাল্টে যায় এবং বৈষম্যের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ, একজন শ্বেতাঙ্গ নারী যে ধরনের বৈষম্যের শিকার হন, একজন কৃষ্ণাঙ্গ বা সংখ্যালঘু নারী তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং অনেক বেশি জটিল বৈষম্যের মুখে পড়েন।

ইসলামোফোবিয়ার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কীভাবে কাজ করে?

বিশ্বজুড়ে ছড়ানো এই আধুনিক ইসলামোফোবিয়ার সবচেয়ে নীরব অথচ সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার হলেন মুসলিম নারীরা। ক্রেনশর তত্ত্ব অনুযায়ী, মুসলিম নারীদের লড়াইটা কোনো একমুখী লড়াই নয়; তাঁরা প্রতিনিয়ত এক বহুমাত্রিক বা ত্রিমুখী বৈষম্যের শিকার হন। প্রথমত, নারী হিসেবে তাঁরা সমাজের চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিকতার (Sexism) শিকার। দ্বিতীয়ত, মুসলিম হওয়ার কারণে তাঁরা ইসলামোফোবিয়া বা বর্ণবাদের (Racism) শিকার।

মিডিয়া এবং পশ্চিমা সমাজের দ্বিচারিতা বা ভণ্ডামিটা

এখানে সবচেয়ে বেশি নগ্ন হয়ে ধরা পড়ে। একদিকে পশ্চিমা মিডিয়া ক্রমাগত প্রচার করে যে, "মুসলিম নারীরা চরম শোষিত, অবলা এবং পশ্চাৎপদ। আমরা সভ্য সমাজ তাদের উদ্ধার করতে চাই!" কিন্তু অন্যদিকে, সেই নারীরাই যখন নিজেদের যোগ্যতায় পড়াশোনা করে, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে হিজাব মাথায় দিয়ে কর্মক্ষেত্রে বা রাস্তাঘাটে বের হন, তখন সেই তথাকথিত 'সভ্য' সমাজই তাঁদের পদে পদে হেনস্থা করে। তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এবং কেবল পোশাকের কারণে তাঁদের চাকরি বা প্রমোশন আটকে দেওয়া হয়। ক্রেনশর তত্ত্ব আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, মিডিয়া আসলে মুসলিম নারীদের অধিকার নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়; বরং তারা মুসলিম নারীদের এই 'অসহায়'-এর স্টেরিওটাইপটাকে ব্যবহার করে ইসলামকে একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করতে চায়।

৯. ডিউ বয়েসের 'ডাবল কনশাসনেস' (নিজের আয়নায় অন্যের চোখ এবং এক প্রজন্মের পরিচয় সংকট)

বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ডব্লিউ. ই. বি. ডিউ বয়েস (W.E.B. Du Bois) ১৯০৩ সালে তাঁর কালজয়ী বই 'দ্য সোলস অফ ব্ল্যাক ফোক' (The Souls of Black Folk)-এ এক চরম মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। তিনি একটি তত্ত্ব দেন, যার নাম 'ডাবল কনশাসনেস' (Double Consciousness) বা দ্বৈত চেতনা। ডিউ বয়েস বলেছিলেন, একটি বর্ণবাদী বা বৈষম্যমূলক সমাজে অবহেলিত গোষ্ঠীর মানুষ নিজের চোখে নিজেকে দেখার বা বিচার করার সুযোগ পায় না। তাকে বাধ্য হয়ে নিজেকে মাপতে হয় সেই সমাজের চোখে, যে সমাজ তাকে প্রতিনিয়ত ঘৃণা করে বা নিচু নজরে দেখে। এর ফলে ওই মানুষটির ভেতরে দুটো সত্তার জন্ম হয় এবং সে সারাজীবন এক চরম আত্মপরিচয় সংকটে (Identity Crisis) ভুগতে থাকে।

আজকের মুসলিম প্রজন্মের সংকট এবং ডাবল কনশাসনেস:

আজকের পশ্চিমা বিশ্বে বা তীব্র ইসলামোফোবিক সমাজে বেড়ে ওঠা তরুণ মুসলিম প্রজন্ম বিশেষ করে জেন-জি (Gen-Z) এবং মিলেনিয়ালরা অবিকল এই 'ডাবল কনশাসনেস'-এর শিকার। এটি এক ভয়াবহ মানসিক ট্রমা। একটা ছেলে বা মেয়ে যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ওঠে এবং প্রতিনিয়ত টিভি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া বা সিনেমাতে দেখে যে তার ধর্ম, তার নাম, বা তার সংস্কৃতিকে বারবার কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে, তখন সে মানসিকভাবে মারাত্মক কনফিউজড হয়ে যায়।

তার মনের ভেতর সারাক্ষণ এক অদৃশ্য যুদ্ধ চলতে থাকে। সে বুঝতে পারে না- নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে সে কি গর্ব করবে, নাকি সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার জন্য, বন্ধুদের কাছে 'কুল' সাজার জন্য নিজের মুসলিম পরিচয়টাকে লুকিয়ে ফেলবে? এই মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই নিজের নাম ছোট করে ফেলে (যেমন মোহাম্মদের বদলে 'মো' বা মুস্তাফার বদলে 'মুস' বলা), জনসমক্ষে নিজের ভাষায় কথা বলা বা ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা থেকে বিরত থাকে। ডিউ বয়েসের তত্ত্ব আমাদের এই নিষ্ঠুর সত্যটা বুঝিয়ে দেয় যে, ইসলামোফোবিয়া কেবল বাইরে থেকে একটি সম্প্রদায়ের অধিকারই কাড়ছে না, বরং এটি একটি গোটা প্রজন্মের ভেতর থেকে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপরিচয়কেও কুরে কুরে খাচ্ছে।

১০. আরভিং গফম্যানের 'ড্রামাটার্জিক্যাল থিওরি' (বেঁচে থাকার ক্লান্তিকর অভিনয়)

কানাডিয়ান-আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী আরভিং গফম্যান (Erving Goffman) তাঁর বিখ্যাত বই 'The Presentation of Self in Everyday Life'-এ সমাজের মানুষের মেলামেশাকে একটি থিয়েটার বা নাটকের মঞ্চের সাথে তুলনা করেছেন। একেই বলা হয় 'ড্রামাটার্জিক্যাল থিওরি'। গফম্যানের মতে, আমরা সবাই এক একজন অভিনেতা এবং সমাজের সামনে আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদের একটি কাঙ্ক্ষিত ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করি, যাকে তিনি বলেছেন 'ইম্প্রেশন ম্যানেজমেন্ট' (Impression Management)। তাঁর তত্ত্বে দুটি মূল জায়গা রয়েছে- 'ফ্রন্ট স্টেজ' (মঞ্চের সামনের অংশ, যেখানে আমরা সমাজের নিয়ম মেনে নিখুঁত অভিনয় করি) এবং 'ব্যাক স্টেজ' (নেপথ্য বা নিজেদের বাড়ি, যেখানে আমরা মুখোশ খুলে নিজেদের আসল সত্তায় ফিরতে পারি)।

ইসলামোফোবিয়ার মঞ্চে মুসলিমদের 'ইম্প্রেশন ম্যানেজমেন্ট':

মিডিয়ার লাগাতার স্টেরিওটাইপিংয়ের কারণে পশ্চিমা বিশ্ব বা ইসলামোফোবিক সমাজগুলো

মুসলিমদের জন্য একটি অত্যন্ত বৈরী 'ফ্রন্ট স্টেজ' বা মঞ্চ তৈরি করেছে। যখন একজন মুসলিম পাবলিক স্পেসে (যেমন: বিমানবন্দর, অফিস, বা মেট্রো ট্রেন) পা রাখেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে মিডিয়া তাঁকে আগেই 'সন্দেহজনক' বা 'বিপজ্জনক' হিসেবে দর্শকদের (সাধারণ সমাজ) কাছে পরিচয় করিয়ে রেখেছে। ফলে, ওই মুসলিম মানুষটিকে প্রতিনিয়ত এক ক্লান্তিকর 'ইম্প্রেশন ম্যানেজমেন্ট'-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাঁকে সমাজের চোখে এটা প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হয়ে অভিনয় করতে হয় যে, "আমি টিভিতে দেখা ওই সন্ত্রাসী নই, আমি একজন ভালো এবং নিরীহ মানুষ।" এই প্রমাণ করার চাপে পড়ে অনেকেই নিজের নাম ছোট করে বলেন (যেমন: মোহাম্মদের বদলে 'মো'), জনসমক্ষে নিজের ভাষায় কথা বলা বা ধর্মীয় বই পড়া থেকে বিরত থাকেন, এমনকি অকারণে অতিরিক্ত হাসিমুখে থাকার চেষ্টা করেন কেবল চারপাশের মানুষকে 'কমফোর্টেবল' বা স্বস্তিতে রাখার জন্য। এই প্রতিনিয়ত 'গুড মুসলিম' হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার অভিনয়টা মানসিকভাবে প্রচণ্ড যন্ত্রণাদায়ক। গফম্যানের ভাষায়, তাঁদের 'ব্যাক স্টেজ' বা নিজের মতো করে বাঁচার জায়গাটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। মিডিয়ার তৈরি করা ভীতির কারণে একজন মানুষের স্বাভাবিকভাবে, নিজের পরিচয়ে বাঁচার অধিকারটুকুই কেড়ে নেওয়া হয়।

উত্তরণের পথ কোন দিকে?

অসুখটা যখন সমাজের এত গভীরে, কাঠামোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিকড় গেড়েছে, তখন শুধু ওপর থেকে মলম লাগিয়ে আর কাজ হবে না। মিডিয়ার তৈরি করা এই নিখুঁত 'হাইপার-রিয়েলিটি' এবং লেবেলিংয়ের রাজনীতিকে ভাঙতে হলে আমাদের দরকার সমাজতাত্ত্বিক প্রতিরোধ এবং সচেতনতার এক নতুন লড়াই।

প্রথম এবং সবচেয়ে জরুরি পদক্ষেপ হলো- 'কাউন্টার-ন্যারেটিভ' বা পাল্টা বয়ান তৈরি করা। অন্যের তৈরি করা ফ্রেমে দাঁড়িয়ে, অন্যের দেওয়া সংলাপে নিজেদের জাস্টিফাই করার বা নির্দোষ প্রমাণ করার দিন শেষ। শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, সাংবাদিকতা এবং মূলধারার মিডিয়ার সব স্তরে মুসলিমদের নিজেদের গল্প নিজেদেরই বলতে হবে। ক্যামেরার পেছনে, খবরের ডেস্কে এবং নীতিনির্ধারণের জায়গায় মুসলিম তরুণ-তরুণীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, যাতে সমাজ তাঁদের কেবল মিডিয়ার চোখে না দেখে, বরং তাঁদের নিজেদের ফ্রেমেই দেখতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বৃহত্তর সমাজের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন 'মিডিয়া লিটারেসি' বা গণমাধ্যম সাক্ষরতা। টিভির পর্দায় ব্রেকিং নিউজের লাল রং বা কোনো ব্লকবাস্টার সিনেমা দেখে সেটাকে বেদবাক্য বলে মেনে নেওয়ার আগে, তার পেছনের অর্থনীতি এবং রাজনীতিটা বোঝার চোখ তৈরি করতে হবে সাধারণ মানুষকে। অ্যালগরিদম আর ইকো-চেম্বারের এই যুগে আমরা কেবল সেটাই দেখছি, যেটা আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাসকে আরও পোক্ত করছে। এই অদৃশ্য দেওয়াল ভেঙে ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে সরাসরি সংলাপ, আড্ডা বা বন্ধুত্বের জানালাগুলো খুলে দিতে হবে।

মিডিয়া হলো আধুনিক সমাজের আয়নার মতো। কিন্তু আয়নাটাই যদি নকল বাস্তবতার হয়, তবে তাতে প্রতিবিম্ব তো বিকৃত দেখাবেই! ইসলামোফোবিয়া কেবল মুসলিমদের সমস্যা নয়; এটি একটি বহুত্ববাদী, গণতান্ত্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের কফিনে পোঁতা পেরেক। এই কাঠামোগত অবিচার ভাঙতে হলে, মিডিয়ার পরিয়ে দেওয়া স্টেরিওটাইপ এবং আতঙ্কের চশমাটা সবার আগে খুলে ফেলতে হবে। লেবেলের বাইরে বেরিয়ে মানুষ হিসেবে মানুষকে দেখার, এবং মগজের শর্টকাট ছেড়ে একটু গভীরে গিয়ে ভাবার বোধহয় এটাই সেরা সময়।

সাক্ষাৎকার

আদর্শ ও নৈতিকতা বজায় রেখেই মানুষের জন্য লড়তে হবে: ড. আবুল হোসেন বিশ্বাস

প্রশ্ন. মুর্শিদাবাদের ডোমকলের চাঁদপুর গ্রামে আপনার বেড়ে ওঠা। সেই দিনগুলোর কথা যদি একটু বলেন। তৎকালীন গ্রামীণ পরিবেশে পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা কেমন ছিল?

উত্তর: আমার বেড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার চাঁদপুর গ্রামে। এটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। রাস্তাঘাট সব কাঁচা। যেখানে স্নিগ্ধ বাতাস ছিল, মনোরম পরিবেশ ছিল।ছিল গ্রামীণ সরল মানুষের ভিড়। কিন্তু ইলেকট্রিক আলো ছিল না, ছিল না পড়াশোনার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা। কিন্তু শিক্ষকদের আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। আর প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া হিসাবে আমারও ছিল চরম নিষ্ঠা, আর পড়াশুনার প্রতি গভীর ভালোবাসা। বড় হতেই হবে, পৌঁছতেই হবে লক্ষ্যে, এটাই ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান।

প্রশ্ন: আপনার জীবনের লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে এই স্কুলের বা কোনো বিশেষ শিক্ষকের ভূমিকা কতটা ছিল?

উত্তর: আমি গ্রামের স্কুল থেকে প্রাথমিকের পাঠ শেষ করে, গ্রাম থেকে অনতি দূরে অতি মনোরম পরিবেশে জিতপুর পাল প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করি। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত আগাগোড়া ক্লাসের ফার্স্ট বয় ছিলাম। তারপর উচ্চমাধ্যমিক শেষ করি বিজ্ঞান বিভাগে আমতলা হাই স্কুল থেকে। আমার আদর্শ শিক্ষক ছিলেন বারীন্দ্র কুমার পাল, ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। উনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছিলাম। সফল হয়েছি, আজ আমি ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক হয়েছি।

প্রশ্ন: ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি আপনার এই অনুরাগের শুরুটা কীভাবে হয়েছিল জানলাম। এবার উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু বলুন।

উত্তর: বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাঠ শেষ করে আমার পছন্দের বিষয় ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি এবং অনার্সে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলাম।তারপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ সম্পূর্ণ করি এবং আমি ১৯৯৬ সালে এমএ-তে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। ফলে তৎকালীন রাজ্যপাল এ. আর. কিদোয়াইয়ের হাত থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছিলাম এবং অধ্যাপক মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য পুরস্কার পেয়েছিলাম। এটা আমার জীবনের খুব বড় প্রাপ্তি। একটি সরল কথা স্বীকার করতেই হয় যে, আমি যখন কোনও ব্যক্তিকে ইংরেজি বলতে শুনতাম, ইংরেজিতে কথা বলতে দেখতাম, আমি মোহিত হয়ে শুনতাম এবং ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হতাম ইংরেজির প্রতি। এই গভীর ভালোবাসাটা আমার ছিল প্রথম থেকেই।

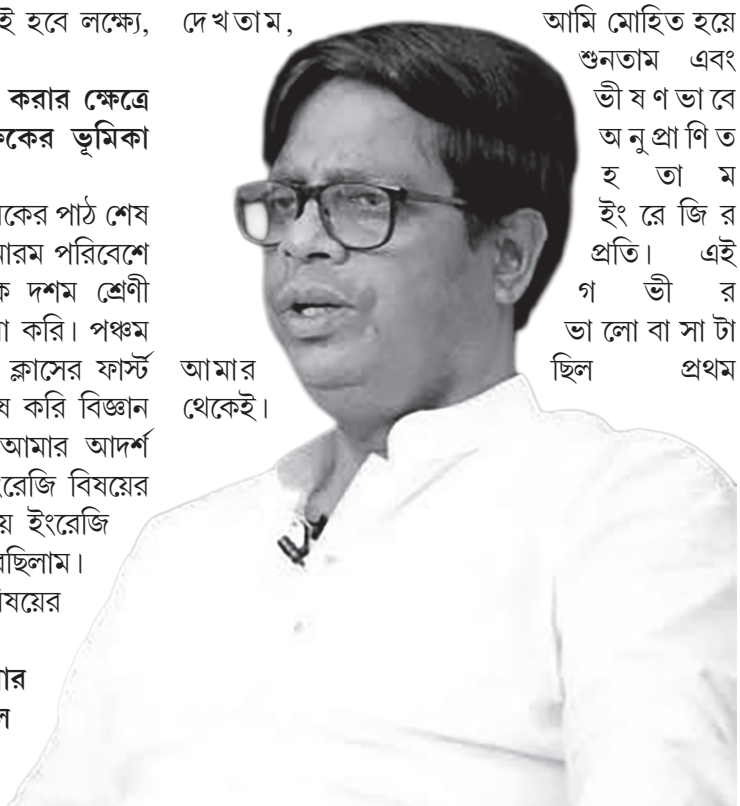

প্রশ্ন:আমরা জেনেছি, আপনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। আপনার গবেষণার বিষয় হিসেবে নজরুলকেই কেন বেছে নিলেন?

উত্তর: উগ্র সম্প্রদায়িকতার নখরের থাবা পৃথিবীটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প বিশ্ববাসীর ঘাড়ের উপরে নিঃশ্বাস ফেলছে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে। আমি ইংরেজি সাহিত্যের মানুষ হিসাবে শেকসপিয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কলেরিজ, বায়রন, কিটস, শেলী, ডানিয়েল ডিফো এদেরকে নিয়ে গবেষণা করতে পারতাম। কিন্তু আমি কাজী নজরুল ইসলামের সেকুলার ভিশন নিয়ে গবেষণাটা করলাম। কারণ কাজী নজরুল ইসলাম সেকুলার ভিশন নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন তাঁর লেখার মধ্যে, যেগুলো কেবলমাত্র আমরা বাংলা ভাষাভাষী মানুষরাই পড়তে পারি এবং জানতে পারি। কিন্তু তার এই সেকুলার ভিশন বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে ভারতবর্ষসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া উচিত এবং এটা সম্ভব একমাত্র ইংরেজিতে গবেষণা করলেই এবং আমি সেই কাজটাই করেছি।

প্রশ্ন: আপনার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলুন।

উত্তর: *আমি ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ও ডিরোজিও কলেজে ইংরেজি বিষয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপনার কাজ করেছি ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। তারপর ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বেলতলা হাই মাদ্রাসায় ইংরেজির সহশিক্ষক হিসাবে স্থায়ী পদে শিক্ষকতার কাজ শুরু করি। বর্তমানে ওই উচ্চমাধ্যমিক বেলতলা হাই মাদ্রাসায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি। বলা যায় দুটো স্তরেই শিক্ষক হিসাবে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। তফাৎ শুধু পরিধি ও পরিসরের। বিদ্যালয়ের তুলনায় মহাবিদ্যালয়ের পরিসর অনেক বেশি। যেমন নদী আর সাগর। মহাবিদ্যালয়ে পড়ালে নিজেকেও অনেক পড়াশোনা করতে হয়। জানার পরিসরটাও অনেকটা বাড়ে। নিজেকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে উন্নীত করার সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন: ২০২৫ সালে আপনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'শিক্ষারত্ন' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সেই মুহূর্তটি আপনার কাছে কেমন ছিল এবং এটি আপনার দায়িত্ব কতটা বাড়িয়ে দিল বলে মনে করেন?

উত্তর: ২০২৫ সালে শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। এটা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। একজন শিক্ষকের স্বপ্নই থাকে যদি কখনও শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত হতে পারি। শিক্ষক জীবনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে শিক্ষারত্নে ভূষিত হওয়া। সেটা পেয়ে আমি সত্যিই আপ্লুত। তবে শিক্ষরত্ন পাওয়ার পরে অনেক নৈতিক দায় ও দায়িত্ব বেড়েছে। সে স্কুল অভ্যন্তরেই হোক, পারিবারিক ক্ষেত্রেই হোক বা সামাজিক ক্ষেত্রেই হোক, সর্বত্রই। স্কুলে ঢোকার পর স্কুলের কাজই বলুন, পড়ানোই বলুন, কলিগদের সঙ্গে ব্যবহারই বলুন, গার্জেনদের সঙ্গে ব্যবহার, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার, সবেতেই যেন কেমন একটা নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন কাজ করে।পারিবারিক ক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রেও একইভাবে নীতি-নৈতিকতা কাজ করে। আমি একজন শিক্ষারত্নপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমাকে নৈতিকতার উপর দাঁড়িয়েই সব কাজ করতে হবে, এটা সব সময় মনের মধ্যে কাজ করে।

প্রশ্ন: একজন ব্যস্ত শিক্ষক ও সমাজসেবী হয়েও লেখালেখির জন্য সময় বের করেন কীভাবে?

উত্তর: আমার লেখা কয়েকটা বইয়ের মধ্যে 'স্পোকেন ইংলিশ বিগিনার্স কোর্স' ও 'দ্য সেকুলার ভিশন অফ কাজী নজরুল ইসলাম' এই দুটো বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরও লেখালেখি চলছে, খুব শীঘ্রই কয়েকটি জার্নালে আমার লেখা বেরোবে এবং দুটি বইও প্রকাশিত হবে। আমি মনে করি, আর পাঁচটা কাজের চাইতে বই লেখা কাজটি সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও লেখালেখির জন্য সময় বের করা আমার কাছে অধিক গুরুত্বের।

প্রশ্ন: সাহিত্য বা গবেষণার ক্ষেত্রে আপনার পরবর্তী কোনো কাজ বা বই কি আমরা শীঘ্রই দেখতে পাব?

উত্তর: খুব শীঘ্রই 'সম্প্রীতির দিশারী নজরুল' শীর্ষক আমার লেখা একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হতে চলেছে। এবং 'Nazrul: a pioneer of Harmony' নামক একটি ইংরেজি বইও প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া নজরুলের নানান আঙ্গিক নিয়ে লেখালেখি শুরু করেছি।

প্রশ্ন: আপনি বেশ কয়েকটি বিএড, নার্সিং ও ফার্মেসি কলেজের মুখ্য উপদেষ্টা। পিছিয়ে পড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি ও পেশাদার শিক্ষায় শিক্ষিত করার ভাবনাটি আপনার মাথায় এল কেন?

উত্তর: আমাদের যে আর্থ-সামাজিক কাঠামো তাতে

শিক্ষান্তে চাকরি, এটাই কিন্তু আমাদের লেখাপড়া শেখার মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। তবে চাকরির বাজার বড়ই মন্দা। কেবলমাত্র জেনারেল এডুকেশন শেষ করে চাকরি পাওয়া কঠিন। কারণ ডিএলএড ট্রেনিং না থাকলে প্রাইমারি বা আপার প্রাইমারিতে শিক্ষকতার চাকরির পরীক্ষায় বসা যায় না। ঠিক তেমনি বিএড ট্রেনিং না থাকলে সেকেন্ডারি বা হায়ার সেকেন্ডারিতে শিক্ষকতার চাকরির পরীক্ষায় বসা যায় না। আবার নার্সিং ট্রেনিং যেমন জিএনএম বা বিএসসি নার্সিং ট্রেনিং কোর্স করা না থাকলে সরকারিভাবে নার্সের চাকরি পাওয়া যায় না। ডি ফার্ম বা বি ফার্ম কোর্স করা না থাকলে ঔষধের দোকান করা যেমন যায় না, তেমনই সরকারি হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট-এর চাকরিও পাওয়া যায় না। তাই আমাদের মতো পিছিয়েপড়া ঘরের ছেলেমেয়েরা যাতে করে শিক্ষান্তে একটা চাকরি পেতে পারে সেই লক্ষ্যেই কারিগরি ও পেশাদার শিক্ষা প্রদান করার ব্যাপারটায় আমি অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। এবং নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানসহ কয়েকটি জেলায় তাই বিএড, ডি এল এড, নার্সিং ও ফার্মেসি কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মুখ্য উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেছি।

প্রশ্ন: বর্তমান সময়ে সাধারণ ডিগ্রির চেয়ে প্রফেশনাল কোর্সের গুরুত্ব বাড়ছে। গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীদের এই চাকরিমুখী ধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আপনি কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন?

উত্তর: আমি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বেলতলা হাই মাদ্রাসা নামক একটি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০০১ সাল থেকে ইংরেজি বিষয়ের সহশিক্ষক হিসাবে ও ২০২১ সাল থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করছি। এবং আমার জন্মও মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার চাঁদপুর নামে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। তাই গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের শিক্ষান্তে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রফেশনাল কোর্স-এর ভূমিকা নিয়ে আমি ছেলে-মেয়েদের সচেতন করেছি এবং তাদেরকে প্রফেশনাল কোর্সের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে একটা বড় ভূমিকা পালন করে চলেছি। বলা বাহুল্য, আজ গ্রামীণ ছেলেমেয়েরা জেনারেল কোর্সের চাইতে প্রফেশনাল কোর্সের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন: দুস্থ পড়ুয়াদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করা-আপনার এই পরোপকারী মানসিকতার উৎস কী?

উত্তর: আমি নিজেও অত্যন্ত গরিব ঘর থেকে, দরিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করেই নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই জুগিয়ে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। তাই দুস্থ পড়ুয়াদের পড়াশোনা চালানোর ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা সেটা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। গরিব-দুস্থ মানুষদের যে জ্বালা-যন্ত্রণা তা আমি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল। তাই দুস্থ ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানোর ফিজ দেওয়া, তাদের বই কিনে দেওয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের তাদের কন্যাদের বিয়ের সময়ে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, মারণব্যাধিতে আক্রান্ত গরিব রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা, শীতে শীতবস্ত বিতরণ, বিভিন্ন উৎসব যেমন ঈদ, পূজা ও বড়দিনের আগে শাড়ি, লুঙ্গি, জামা-কাপড় বিতরণ---এগুলো করতে আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আজও পথ দুর্ঘটনায় মৃত দশটা পরিবারের ১০ জন বাচ্চাকে নিজের খরচে পড়াশোনা করানোর দায়িত্ব পালন করছি। আমার এই পরোপকারী মানসিকতার উৎস যদি জানতে চান তাহলে প্রথমেই আমার পিতা লছিমুদ্দিন বিশ্বাসের নাম করতে হয়। উনি খুবই বড় মাপের পরোপকারী মানুষ। দেখেছি গ্রামের গরিব মেয়েদের বিয়ের সময়ে গোটা গ্রাম থেকে চাল, ডাল, অর্থ সংগ্রহ করে এবং নিজেও ঘর থেকে দিয়ে গরিব মেয়েদের বিয়ে-শাদী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন অসংখ্যবার। আর আমার মা হাদেছা বিবি, স্ত্রী ফিরোজা খাতুন বেগম, বড় মেয়ে নিলুফার পারভিন বিশ্বাস, মেজ মেয়ে রুমানা পারভীন বিশ্বাস ও ছোট মেয়ে সুমিয়া পারভিন বিশ্বাস আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে চরমভাবে গরিব দুস্থদের পাশে থাকতে। আজও আমার মেয়েদের জন্মদিন পালনের ক্ষেত্রে বাড়িতে কোনও বিশেষ ভোজনের আয়োজন করা হয় না। কখনও অনাথ বাচ্চাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা, কখনও অন্ধ বাচ্চাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করি। এভাবে গরিব, দুস্থ বাচ্চাদের খাওয়ানো বা বস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে আমার মেয়েদের জন্মদিন পালন করি।

প্রশ্ন: আপনি কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। প্রশাসনিক কাজ এবং শিক্ষকতা-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেন কীভাবে?

উত্তর: স্কুল অভ্যন্তরে আমি শিক্ষক হিসাবে আমার ১০০% উজাড় করে দিই। আধুনিক কায়দায় পড়ানো, গরিব ছেলেমেয়েদেরকে নিজের অর্থে ভর্তি করানো,

তাদের বই কিনে দেওয়া, পরিকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরে যথেষ্ট যোগাযোগ রাখা, বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও পঠন-পাঠনের মান উন্নয়নে অত্যন্ত সচেষ্ট ভূমিকা পালন করা --- এগুলো করে থাকি। এতে কেবলমাত্র স্কুলের ছেলেমেয়েদের ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে আমার পরিষেবা দেওয়ার পরিসর আবদ্ধ থাকে। আমি কৃষ্ণনগর পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও সিআইসি (ট্যাক্স ও লাইসেন্স দফতর) হিসাবে অসংখ্য মানুষের পরিষেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার একটা সুযোগ প্ল্যাটফর্ম পেয়েছি। এ কাজে আমি অত্যন্ত আনন্দ পাই। বলা যায়, এটা একটা আলাদা ধরনের মানসিক তৃপ্তি ।

প্রশ্ন: একজন শিক্ষাবিদ যখন রাজনীতিতে আসেন, তখন সাধারণ মানুষ তাঁর থেকে অনেক বেশি প্রত্যাশা করে। কৃষ্ণনগরের উন্নয়নে আপনার বিশেষ কোনো রূপরেখা আছে কি?

উত্তর: আমি মনে করি একজন শিক্ষক তার স্কুলের অভ্যন্তরে ছাত্রছাত্রীদের ১০০% নিংড়ে উজাড় করে দেবেন। এবং সে যখন রাজনীতিতে আসবে তখনও মানুষের পরিষেবায় ১০০% নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে। আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাসী। আমার ক্ষেত্রে আমি তো মনে করি সমাজসেবা করার একটা মস্ত বড় প্ল্যাটফর্ম আমি পেয়েছি। মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থেকে এক নিবেদিত প্রাণ হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারব। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদি আরও কোনও বড় জায়গা পাই, তাহলে আরও বেশি বেশি করে মানুষের পাশে থাকতে পারব।

প্রশ্ন: 'নজরুল স্মারক', 'জি ২৪ ঘণ্টা অ্যাওয়ার্ড', 'শিক্ষারত্ন'-এত সম্মান অর্জন...

উত্তর: জি ২৪ ঘন্টা অ্যাওয়ার্ড, নজরুল স্মারক পুরস্কার এবং শিক্ষারত্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। তার আগে আমি এমএ-তে গোল্ড মেডালিস্ট ছিলাম। একজন শিক্ষক হিসাবে তার স্বপ্ন থাকে শিক্ষা জগতের প্রেস্টিজিয়াস পুরস্কার পাওয়া। যেমন শিক্ষারত্ন পুরস্কার পাওয়া, জাতীয় শিক্ষকের পুরস্কার পাওয়া, সেরা শিক্ষকের শিরোপায় ভূষিত হওয়া ইত্যাদি। তাই শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেয়ে আমি সত্যিই আপ্লুত। আমার মনে হয়েছে এই সাফল্যের আসল চাবিকাঠি হল আমার শিক্ষকতায় সৃজনশীলতা, আধুনিক কায়দায় ছাত্র-ছাত্রীদের মানোপযোগী পাঠ পরিবেশন, সামাজিক কাজের সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখা ও ছাত্র-ছাত্রীদের ড্রপ আউট রোখার ক্ষেত্রে আমার যে অনন্য ভূমিকা সেগুলো।

প্রশ্ন: বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের জন্য শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে আপনার পরামর্শ কী হবে?

উত্তর: একজন শিক্ষক হিসেবে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের বলব, তারা যেন প্রকৃত মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও প্রফেশনাল শিক্ষা গ্রহণের উপরে অধিক গুরুত্ব দেয়। সর্বোপরি চরিত্রবান মানুষ হিসাবে নিজেকে যেন গড়তে পারে।

প্রশ্ন: আপনি শিক্ষা জগতের পাশাপাশি একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে সমাজে কী ভূমিকা রেখে চলেছেন যদি আমাদের জানান।

উত্তর: আমি শিক্ষক হিসাবে শিক্ষা জগতে বেশ কিছুটা ছাপ ফেলতে পেরেছি বলে মনে করি। বেলতলা হাই মাদ্রাসায় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সাথে শিক্ষকতার পাশাপাশি নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানসহ কয়েকটি জেলায় বিএড কলেজ, ডিএলএড কলেজ, নার্সিং কলেজ, ফার্মেসি কলেজ ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপনে মুখ্য উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে শিক্ষা বিস্তারের কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছি। আমি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় নদীয়ায় ডি.এল. এসি মেম্বার হিসেবে কাজ করে আসছি প্রায় ১০ বছর ধরে। এছাড়া ডি. এল.আই.টি মেম্বার (নদিয়া) হিসেবেও কাজ করে আসছি প্রায় ৫ বছর ধরে। সামাজিক ক্ষেত্রে গরিব-দুস্থ মানুষের পাশে থাকার সাথে সাথে বিশেষত ওয়াকফ প্রপার্টি রক্ষার্থে আমি প্রায় ৬ বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছি। বর্তমানে আমি সায়েদুল হক ওয়াকফ এস্টেট, আজিজুল হক ওয়াকফ এস্টেট ও গোদাডাঙ্গা কবরস্থান, এই তিনটে ওয়াকফ এস্টেটের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে।

সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন
আল আজাদ

উচ্চবিত্তের পৌষমাস, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ এবং ‘জলসাঘর’-এর ছবি বিশ্বাস

একদিকে ইলন মাস্ক, জাকারবার্গ, আম্বানি, আদানির মতো মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এত বড় যে তারা সরকার এবং বাজারের নীতি নির্ধারণে সরাসরি প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, গরিব শ্রেণি, যারা সরকারের ভর্তুকি ও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর এই দুইয়ের মাঝে পিষ্ট হচ্ছে মধ্যবিত্ত। তারা এতটাও গরিব নয় যে সরকারি সাহায্য পাবে, আবার এতটাও ধনী নয় যে এই লাগামহীন ভোগবাদের চাপ সামলাতে পারবে। জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের মতোই হয়েছে তাদের অবস্থা! লিখেছেন গোলাম রাশিদ

সত্যজিৎ রায়ের ‘জলসাঘর’ (১৯৫৮) সিনেমার ছবি বিশ্বাসের কথা মনে আছে? সিনেমায় যিনি এককালের প্রতাপশালী জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। জমিদারি চলে গিয়েছে, কিন্তু ঠাঁটবাঁট বজায় রা'তে চান। বাড়ি থেকে একে একে বিক্রি হতে থাকে জিনিসপত্র। কিন্তু সময় বড় অদ্ভুত। সময় বদলে যায়। আমরা বুঝতে পারি না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ভুলে যাই। একটা সময়ে আটকে থাকি। সেই জমিদারও যেন তাই। এই সিনেমাটির শ্যুটিং হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নিমতিতা রাজবাড়িতে। সেই বাড়িও আজ ভগ্নপ্রায়। ক্ষয়িষ্ণু। এত ভূমিকা এই জন্য যে, দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিও কি এভাবেই জলসাঘরের ছবি বিশ্বাসের মতো বিলুপ্ত হতে চলেছে? নিমতিতার চৌধুরিদের জমিদারবাড়ির মতো তাকেও আর কেউ ‘কাউন্ট’ করে না! ইলন মাস্ক, জাকারবার্গ, আদানি-আম্বানির মাঝে আর কেউ নেই মধ্যবিত্ত স্টিরিওটাইপ ধ্যানধারণা নিয়ে। জেনারেশন জেড-এ হয় তুমি গরিব,

না হলে বিলিয়োনেয়ার। মানুষের জীবনযাপন যেন বারবার সেকথাই বলতে চাইছে উচ্চ স্বরে।

ভারতের মধ্যবিত্ত আজ এক নীরব মহামারির শিকার। এই মহামারির কোনও দৃশ্যমান লক্ষণ নেই, নেই কোনও কোলাহল। এটি খুব নীরবে, খুব সন্তর্পণে গ্রাস করছে অসংখ্য পরিবারকে। যেভাবে পাখির ফেলে যাওয়া বীজ থেকে জন্ম নেওয়া অশ্বত্থের গাছ গিলে খায় পুরনো দালান কিংবা খেজুর গাছকে। এখানে আরেকজনের গল্প বলা যায়। ধরা যাক তার নাম অনিমেষ। 'মধ্যবিত্ত' ধ্যানধারণা, আদর্শে বিশ্বাসী। তার এই গল্পটি কেবল একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি সেই মহামারির এক জ্বলন্ত উদাহরণ। মাস গেলে তার আয় ৫০ হাজার টাকা, যার অর্ধেকই চলে যায় কেবল ঋণের কিস্তি মেটাতে। বাকি টাকায় স্ত্রী, সন্তানের ভরণপোষণ, বাড়িভাড়া, শিক্ষা, আর চিকিৎসার মতো মৌলিক প্রয়োজন মেটানো প্রায় অসম্ভব। এই চিত্রটি কেবল তার নয়, ভারতের লক্ষ লক্ষ পরিবারের প্রতিদিনের এক ভয়াবহ বাস্তব। সহজ ঋণের প্রলোভন আজ তাদের জীবনের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। এভাবেই উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাঝের সারি থেকে মধ্যবিত্ত বিলুপ্তির পথে। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে পারিবারিক ঋণ আকাশ ছুঁয়েছে। ২০২৫ পর্যন্ত এই ঋণের পরিমাণ দেশের মোট জিডিপির প্রায় ৪৮.৬ শতাংশে পৌঁছেছে, যা মাত্র পাঁচ বছর আগে ছিল ৩২ শতাংশ। মাথাপিছু ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪.৮ লক্ষ টাকায়, যা মাত্র দুই বছরে ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলো সং'্যামাত্র---প্রাণহীন, কিন্তু এর পিছনের গল্পগুলো রক্ত-মাংসের মানুষের। সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাসিক বেতনের প্রায় ৩৩ শতাংশ এখন কেবল ইএমআই মেটাতেই চলে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভীতিকর তথ্য হল, ৪৫ শতাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের আয়ের ৪০ শতাংশের বেশি ব্যয় করছে ঋণ পরিশোধে। এই প্রবণতা কেবল অর্থনৈতিক সংকট নয়, এটি এক গভীর সামাজিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিত।

এই সংকটের মূল কারণ হল লাগামহীন ভোগবাদ। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের শেখাচ্ছে, সুখ ও সাফল্য মানেই ভোগ। টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, আর স্মার্টফোনের পর্দা জুড়ে যে জীবনযাত্রার ছবি আঁকা হয়, তা কেবলই লোভের জন্ম দেয়। ইলন মাস্কের টেসলা থেকে শুরু করে জাকারবার্গের মেটাভার্স, কিংবা মুকেশ আম্বানির জিও-র মতো বড় বড় কোম্পানিগুলো এক নতুন জীবনযাত্রার প্রলোভন দেখাচ্ছে। এই জীবনযাত্রা অর্জন করতে গেলে প্রয়োজন হয় অঢেল অর্থের, যা অধিকাংশ মধ্যবিত্তের কাছে নেই। আর এখানেই আসে সহজ ঋণের মায়াজাল। ক্রেডিট কার্ড, ব্যক্তিগত ঋণ এবং 'এখন কিনুন, পরে পরিশোধ করুন' স্কিমগুলো এই ভোগবাদে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এই পরিষেবাগুলো মানুষকে মনে করায়, তাদের স্বপ্ন পূরণ করা কেবল একটি ক্লিক-এর দূরত্বে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, এই প্রতিটি ক্লিক তাদের আরও গভীর ঋণের জালে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নন-ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্স কোম্পানি এবং ফিনটেক সংস্থাগুলো এই ঋণের 'মেলা'র প্রধান আয়োজক। তারা ব্যাপকভাবে ঋণ দিচ্ছে, অনেক সময় ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে যাচাই না করেই। এক বরিষ্ঠ ব্যাঙ্ক আধিকারিক যেমন বলছেন, মাসিক ইএমআই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর ঋণ 'বিক্রি' করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। গ্রাহকরা বড় ঋণের দীর্ঘমেয়াদী খরচের কথা না ভেবে মাসিক ছোট কিস্তির সুবিধা দেখেন। আর এই সহজ কিস্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকে উচ্চ সুদের হার এবং ঋণের বোঝা---যা বাড়তে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে। এটি ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক, কিন্তু ঋণগ্রহীতার জন্য এক মরণফাঁদ। মার্চ ২০২৫-এ, ৯০ দিনের বেশি বকেয়া ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৩.৬ শতাংশ হয়েছে, যা এই ফাঁদের বাস্তব রূপ। বিশেষ করে তরুণ এবং গ্রামীণ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণখেলাপির হার উদ্বেগজনকভাবে বেশি। এই অর্থনৈতিক সংকটের চূড়ান্ত পরিণতি হল মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয়। সম্প্রতি কর্নাটকে মাইক্রোফিন্যান্স এজেন্টের হয়রানির কারণে মাত্র তিন মাসে কমপক্ষে ১৭ জন আত্মহত্যা করেছেন। দেশজুড়ে হওয়া সমীক্ষা বলছে, ১৯ শতাংশ আত্মহত্যার কারণ আর্থিক সংকট, আর এই মৃতদের ৯০ শতাংশের মাথায় ছিল ঋণের বোঝা। এই পরিসংখ্যানের আড়ালে লুকিয়ে আছে অসংখ্য পারিবারিক অশান্তি, ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন এবং চিরতরে হারিয়ে যাওয়া জীবন। ঋণের এই চাপ একজন মানুষকে শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে তিল তিল করে শেষ করে দেয়।

তাহলে কি আমরা এমন এক সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, যেখানে মধ্যবিত্ত বলে কিছু থাকবে না? বর্তমান পুঁজিবাদী মডেল এই ধারণাকেই সমর্থন করছে। একদিকে ইলন মাস্ক, জাকারবার্গ, আম্বানি,

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অসুরক্ষিত ঋণ নিয়ে কিছু নিয়মকানুন কঠোর করেছে। কিন্তু এটি সমস্যার মূল সমাধান নয়। যতক্ষণ না ঋণদাতা সংস্থাগুলো তাদের আগ্রাসী নীতি পরিবর্তন করছে এবং সরকার সাধারণ মানুষকে আর্থিক বিষয়ে সচেতন করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে, ততক্ষণ এই সংকট চলতে থাকবে। আজকের সমাজে পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। আর তার বলি হচ্ছে মধ্যবিত্ত। তাদের স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার হিসেবে তৈরি হওয়া সহজ ঋণ এখন আর্থিক শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে। যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, তাহলে হয়তো একদিন দেখা যাবে, সমাজ কেবল দুটি ভাগে বিভক্ত—মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি এবং অগণিত ঋণগ্রস্ত মানুষ।

আদানির মতো মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য এত বড় যে তারা সরকার এবং বাজারের নীতি নির্ধারণে সরাসরি প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে, গরিব শ্রেণি, যারা সরকারের ভর্তুকি ও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর এই দুইয়ের মাঝে পিষ্ট হচ্ছে মধ্যবিত্ত। তারা এতটাও গরিব নয় যে সরকারি সাহায্য পাবে, আবার এতটাও ধনী নয় যে এই লাগামহীন ভোগবাদের চাপ সামলাতে পারবে। তাদের একমাত্র ভরসা নিজেদের আয়, যা ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং চাকরির অনিশ্চয়তার কারণে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। ফলে এক সময়কার স্থিতিশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণি আজ দুটি পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে--- হয় তারা ঋণের ফাঁদে পড়ে গরিব শ্রেণিতে নেমে যাচ্ছে, নয়তো ঋণের মাধ্যমে ধনীদের মতো জীবনযাপনের চেষ্টা করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে।

এই দুই মেরুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়া দেশের জন্য এক চরম বিপদ সংকেত। যখন একটি দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সেই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়ে। এটি কেবল আর্থিক সংকট নয়, এটি বিশ্বাস এবং আস্থার সংকট। যখন একজন মানুষ তার আয়ের সিংহভাগ ঋণের কিস্তিতে ব্যয় করে, তখন তার কাছে সঞ্চয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বা জরুরি প্রয়োজনের জন্য কোনও আর্থিক সুরক্ষা থাকে না। ফলে যেকোনও অপ্রত্যাশিত সংকটে, যেমন চাকরি হারানো বা চিকিৎসার প্রয়োজনে তাকে আবার ঋণের দ্বারস্থ হতে হয়। আর এই দুষ্ট চক্র চলতেই থাকে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অসুরক্ষিত ঋণ নিয়ে কিছু নিয়মকানুন কঠোর করেছে। কিন্তু এটি সমস্যার মূল সমাধান নয়। যতক্ষণ না ঋণদাতা সংস্থাগুলো তাদের আগ্রাসী নীতি পরিবর্তন করছে এবং সরকার সাধারণ মানুষকে আর্থিক বিষয়ে সচেতন করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে, ততক্ষণ এই সংকট চলতে থাকবে। আজকের সমাজে পুঁজিবাদ তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। আর তার বলি হচ্ছে মধ্যবিত্ত। তাদের স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার হিসেবে তৈরি হওয়া সহজ ঋণ এখন আর্থিক শৃঙ্খলে পরিণত হয়েছে। যদি এই প্রবণতা চলতে থাকে, তাহলে হয়তো একদিন দেখা যাবে, সমাজ কেবল দুটি ভাগে বিভক্ত--- মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি এবং অগণিত ঋণগ্রস্ত মানুষ। মধ্যবিত্তের ধারণা তখন শুধু ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা কি এমন একটি সমাজের দিকেই এগিয়ে যেতে চাই, যেখানে বিলিয়োনেয়ার আর ঋণগ্রস্ত মানুষের এই ব্যবধান ক্রমশ বেড়েই চলেছে? নাকি আমরা এমন একটি সমাজ গঠন করতে পারি যেখানে অর্থনৈতিক ভারসাম্য থাকবে এবং মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ঋণের জালে নয়, বরং তাদের নিজেদের পরিশ্রম এবং সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল হবে?

ছোটগল্প

স্বীকার

আয়েশা খাতুন

"ও ভাই দেখো তো, আজ কত চাঁদ?"

ছেলেটি এক বুড়ি নানির নাতি। সে মোবাইল চালাতে চালাতে হেসে উঠল- "আজ কত চাঁদ মানে? চাঁদ আজই হোক আর কালই হোক, একটাই চাঁদ। সত্যি নানি, তোমরা কি মানুষ গো? কিছুই মনে রাখতে পারো না। আজ কত চাঁদ? ওই তো একটাই চাঁদ।"

বুড়ি খিলখিল করে হাসতে চায় নাতির কথা শুনে, কিন্তু দাঁত না থাকার জন্য 'হিস হিস' শব্দে হাসে। তার হাসির শব্দ কেবল বাতাস বয়ে আনে। এই হাসি শুনে নাতি এক আধুনিক হাসি হাসে- ঠোঁট দুটো শুয়োরের মতো উঁচু করে গোল্লা পাকায়, তারপর 'হে' শব্দে দাঁতগুলো বেরিয়ে এলে দেখা যায় দাঁতে বিশ্রী সব দাগ আর ঠোঁটের তলায় খৈনি গোঁজা। যেখানে বসে, তার চারিপাশে থুতু ছড়ায়। এখানে পোকা নেই মাকড় নেই, তবে ড্রেনের দুর্গন্ধ আছে। নানি তার নাতিকে নিয়ে আর হাঁটাচলা করেনি বা দূর গ্রামে খালাতো বোনের ঘরে বেড়াতে যায়নি। আত্মীয় চেনানো আগের নানিদের একটা দায়িত্ব ছিল। এখন নাতিদের সময় নেই- সারাদিন বই আর বইভরা ব্যাগের সঙ্গেই কাটে তাদের সময়।

কিন্তু সে তো নানি; মাটির তলায় তার বাস, কাণ্ড তার মেয়ে, সে মাঝে দাঁড়িয়ে; আর পাতা হয়ে নাতি-নাতনিরা কত উপরে, একেবারে মগডালে। বুঝি ওরাই তো দেখতে পাবে চাঁদের রকমফের। ক-দিনের চাঁদ, সে কথা চাঁদ দেখেই বলে দেবে। তাই নানি জিজ্ঞাসা করেছিল- "ভাই, আজ কত চাঁদ?" নানি তার নাতির জবাবে বুঝল- "শেখে তো নাতি আমার, কত পুরনো দিনের মুখ্যু কথা কি আর বুঝতে পারে?" নানি বোঝাবার চেষ্টা করে- "ভাই, কটা চাঁদ বলিনি রে? বলি আগকার চাঁদে তো খোদার রোজা ছিল, এই চাঁদে শবে বরাত, লফুল আছে, তাই শুধিয়েছি রে- যে আজ কত দিনের চাঁদ হলো?"

একথা শুনে হাসিতে খৈনিমাখা থুতু গলায় আটকে গিয়ে ছেলেটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল। একটু জিরিয়ে বলে উঠল- "বুড়ি মরতে যাচ্ছে তো সারে না, যত সব শেরেকি এই বুড়ির কাছে আছে। ওসব করতে নাই নানি- গুনাহ হবে," বলেই সে মোবাইল নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে হিন্দি সিনেমা নাকি বোঝা যায় না- এক উলঙ্গ নাচ দেখতে থাকল। নানি বোকার মতো নাতির মুখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে ক্ষণকাল চেয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল।

এই নানির একটাই মেয়ে। চারদিকে তেমন আত্মীয় না থাকায় গ্রামেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। নেই নেই করে মেয়ের দুটো ছেলে। একটা মেয়ে আর নেওয়া হয়নি। "দুটো ছেলেই নাকি ধ্যাঁক ছেলে! কি আতাঁন্দার (বিপদ) কথা গো! বলি হ্যা রে নিলুফা, আর একটা বিটিমাটি নিলি না? কত বলেছি যে, 'যে দিবে ছিঁড়া রুটি তার হবে কানা বিটি'- আচ্ছা গোটা গোটা রুটি দিলে তো দুটো চোখের বিটি হতো। খানিক মানুন-জুনুন করলে হতো না নিলু?"

জামাই বাবাজীবন এই অশিক্ষিত শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না। সে ভিন্ন দেশে কাজ করতে যায়। সোনার গয়না বানানোর কাজ করে। সারাবছর ঘরে থাকতে পায় না, বছরে দুবার বাড়ি আসে। ছেলেদের 'মিশন' স্কুলে পড়ায়। সরকারি স্কুলে পড়া হয় না, তাই এখন মিশন স্কুল উঠেছে। ছেলেরা পড়াশোনায় খুব ভালো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। বড়টি ডাক্তার হচ্ছে, কিন্তু ছোটটি? কে জানে সে কী হবে! বারবারই মিশন থেকে পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসে। মোবাইলে খুব নেশা তার! বাপের খুব আহ্লাদে। যা চাবে ব্যাটাতে, তাই কিনে দিবে। ওর প্রশ্রয়েই তো ছেলে আমার বশের বাইরে চলে যাচ্ছে। "বলি হ্যাঁ রে, মিশন যে আজ পাঁচ দিন খুলেছে তো কি হোস্টেলে যাবি না নাকি? রোজ একশ টাকা করে জরিমানা লাগবে! আমার একটা বিটি থাকলে কি এত চিল্লাইতে হতো?" ছেলেটির মা এবার মোবাইল চালাতে চালাতে চিৎকার করে উঠল।

"মা, ও মা, চলে গেলি নাকি? দুটো কিছু খেয়ে গেলি না!" ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে- "এত রোদ উঠেছে, বলি নানিকে দুটো খাবার দিলি না। আমার একটা বিটি থাকলে কিছু বলতে হতো না। কি খাবি খা কেন রে! না হলে ফাস্টফুড খাবি তো অর্ডার করে দে বাপ। তোর নানি কি চলে গেল ঘরে?" ছেলেটি অমনি করেই বসে থাকলো আর মোবাইল চালাতে চালাতে বলল- "বিটি তোর কপালে নাই গো মা।"

বুড়ি ততক্ষণে তার লম্বা লম্বা পা বের করে তিন-চারটে পুকুর পাড়, একটা নিম আর তেঁতুল তলা পেরিয়ে পাঁচপীরের আস্তানাকে ডান দিকে রেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে সালামদের খামারে উঠেছে। সালামদের খামারে এসে দাঁড়ালে এ বুড়ির দিক ঠিক হয়। সে মনে মনে ভাবে- কী রাত আর কী দিন, এই খামারের চারদিকে গাছপালা আর আকাশের চাঁদটা একই রকম আছে। নিমগাছের ফাঁকে আর পাকুড় গাছের ডালের আড়ালে চাঁদ ওঠা সে একই রকম দেখে। এই চাঁদ দেখেই সে নিজে ঠিক করে নিতে পারে কোনটা কত দিনের চাঁদ। তার বয়সের মেয়েরা অনেকেই আগের দিনের পাল-পার্বণ ছেড়ে দিয়েছে। শাড়ি পরা ছেড়ে সালোয়ার-কামিজ পরে। জামাতে যায়, চিল্লার পর চিল্লা করে আসে। চোখে সুরমা দিনে পাঁচবার করে লাগায় আর আতরের খুশবুতে মনে হয় বুঝি এই লাশ নিয়ে একদল লোক চলে গেল। এ বুড়ি ভয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

"কারো সঙ্গে কারো দেখা হলে সালাম দিতে হয় তা জানে না। জানিস না তো শিখবি, তা নয়তো হাঁদার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। ইয়া কি মেয়ে গো, এক্কেবারে হুমসানি ক্ষেপি!" চারবার চিল্লা করে আসা ফারিহা এই কথাগুলো বুড়িকে বুঝিয়ে বলে- "এই দেখ শোন একটা কথা বলি- তুই আর এই গ্রামের কটা ঘর কারো কথা শোনাস না। সেই পুরনো দিনের মূর্খ মানুষগুলোর মতো হিন্দুদের পারা ধূপকাঠি ধরিয়ে কবরে চাদর চাপিয়ে কবর পুজো করতিস, খোদার রোজা, লফুল করতিস, শবে বরাত করতিস, মহরম করতিস, পীর মানত, শেরেকি করতিস- তুই সেই দলে আছিস। আচ্ছা তুই কেন তাদের দলে থাকবি শুনি? তোর জামাই বিরান দেশে থাকে, গালে তার সুন্নতি দাড়ি, মাথা থেকে টুপি খোলে না, সবাইকে সালাম দেয়। আর তুই? তার শাশুড়ি হয়ে কেন শেরেকি করবি? কারোর সঙ্গে দেখা হলেই তাকে সালাম দিতে হবে, বুঝলি?"

একথাগুলো শুনে বুড়ি মাথা নড়িয়ে বলে- "হুঁ।" বুড়ি তার পরেই তার ডান হাতের আঙুল নিজের কপালে ছুঁয়ে বলে- "সালাম বুবু! যাই তাহলে- নিলুফার বাপ মাঠ থেকে আসবে, পেঁয়াজ কুড়োতে গিয়েছে তো।"

জামাতে যাওয়া মহিলা তাকে ছাড়ে না। সে বলে- "সংসারের মায়া এবার ছাড় বোন, বয়স হয়েছে একবার

শেরেকিগুলো ছেড়ে আমার সঙ্গে চিল্লাতে যাবি?" বুড়ি বলে- "হুঁ, কেন তোরা চিল্লাতে পারব না গো? গলাতে খুব বাজে আমার। নিলুফার বাপ কালা, ওনাকে সব সময় চিল্লাই চিল্লাই বলতে বলতে আমার গলায় খুব বাজুনি।" জামাতে যাওয়া পরহেজগার নারী রেগে বলে- "বেদাত মাগি, যা আমার সামনে থেকে যা।"

বুড়ি যেন মুক্তি পায়। সালামদের খামার ছেড়ে লম্বা পায়ে হেঁটে সে দক্ষিণ পাড়ার দিকে যায়। সে পাড়াতেই তার ঘরবাড়ি। তার ঘরের দরজায় বাঁশ গাছের জঙ্গল। সারাদিন বাঁশঝাড়ে বাঁশদের কতই না খেলা দেখে। বুড়ি আসলে বেশ রসিক। বাঁশদের মড়মড় আওয়াজ শুনতে পেলেই ভাবে এসব বাঁশদের সেই চিল্লানো। বাঁশদের কঞ্চি দেখে ভাবে বাঁশদের ধুয়া ধরা। বাঁশঝাড়ে কাকদের বাসা দেখলেই ভাবে- কী বোকা, কী বোকা! ঠিক আমার পারা বোকা! কিন্তু সে বাঁশদের এক পীর 'মাদার সাহেব'কে খুব মানে। বাড়িতে কারো বিয়ে হলে ক্ষীর খাওয়ানোর আয়োজনে মাদার সাহেবের থালা সাজায় ভারি যত্ন করে। পানিতে থাকে 'খাজা খিজির' নামে এক পীর, তাকে সে খুব মানে। সে পানি কম খরচ করে এই জন্য যে বেশি খরচ করলে নাকি হিসাব লাগবে। পুকুরের পানিতে প্রস্রাব করে না, শৌচ কাজ করে না। স্নানের সময় সে সাবান দিয়ে পানিকে ঘোলা করে না। কী সাবধানে থাকে! মেপে মেপে পানি নিয়ে যায়।

যাই হোক, তাকে তো বেদাত নারী বলেই মোটামুটি এ গ্রামের মানুষ মনে করে। এ বুড়ি অন্য গ্রামের মেয়ে, বিয়ে হয়ে এসেছে কবে সে বলতে পারে না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলে- "তখন এ গাঁয়ে ওলাউঠা (কলেরা)তে অনেক লোক মরে গিয়েছিল। তারপর পানির পীরকে মানুন-জুনুন করে রক্ষা।" দেখলে শেরেকি কাকে বলে! ওলাউঠা হয়েছিল তো পানির পীরকে মানত! সেই হিন্দুদের মতো। ছিঃ, এই গ্রামে এই কটা ঘর আছে বড়ই শেরেকি গো! কিছুতেই শেরেকি করা ছাড়ে না। অন্য নারীর কণ্ঠে প্রতিবাদ শোনা যায়।

এই গ্রামের মানুষ যেমন ভাগ হয়ে গেছে- শেরেকি, বেদাত, অধার্মিক আর বিশুদ্ধ ধার্মিকে; ঠিক যেন তেমনি রাত আর দিন তারাও ভাগ হয়ে গেছে দুটি ঘরে। দিন শেষ হলেই রাত ঘনিয়ে আসে দুটি ঘরে একই ভাবে, কিন্তু এক ঘরে কাকদের ডাক নেই বললেই চলে। শালিকদের ঝগড়া শোনা যায় না। আকাশে পরিযায়ী পাখিদের বিজোড়ে উড়ে যাওয়া নেই। পাশের হিন্দু গ্রাম থেকে ভেসে আসে না নামকীর্তনের খঞ্জনির মিঠে শব্দ। একেবারে মৌলিক আত্মার চলাচল। অন্য ঘরের আঙিনায় বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে পরিযায়ী পাখিদের সারি সারি ওড়া দেখে চিৎকার করে- "কুলো হও, চালুন হও।" এই ডাকে না কি কোনো কারণে সন্ধ্যার আকাশে এই পরিযায়ী পাখিরা কখনো গোল কখনো লম্বা আকারে ওড়ে আর তারাও দেশে ফেরার এক কলতান করে ডাকে একে অন্যকে। বাঁশ জঙ্গলে কাক-পাখিদের ঘরে ফেরার উল্লাসিত চিৎকারে সকলেই আশ্বস্ত হয়- যেন সকলেই দিনের শেষে বাসায় ফিরেছে ঠোঁটভরা খাবার নিয়ে।

এইভাবে চলতে ফিরতে দেখা যায় একটি রাত সেজে উঠেছে। সন্ধ্যা কিছুটা কালো মেখে এসেছিল বটে, কিন্তু কিছুটা সময় পেরোতেই পাড়াটার মানুষেরা তাদের বিদ্যুতের বাতি নিভিয়ে দেয়। যেন তারা রাতকে প্রগাঢ় তৃষ্ণায় ভরে দিতে চায়। বলা হয়নি- দিন শুরু হওয়ার আগে সুবেহ সাদিকেই মেয়েরা উঠেছে। স্নান সেরে আতপ চালের গুঁড়ো আটা দিয়ে খুমির (পিঠে) বানিয়েছে। সাদা গোল কাগজের মতো আটার রুটি বানিয়েছে। আটা ভেজেছে গাওয়া ঘি দিয়ে, হালুয়া বানিয়েছে। বাড়ির পোষা দেশি মুরগি জবেহ করে ঝোল বানিয়ে রান্না করেছে। ক্ষেতের সরু চালের পোলাও রান্না করেছে। জি হ্যাঁ, এই সব খাবার মৃতদের নামে সকল গরিব-দুঃখী আর সবার সঙ্গে ভাগ করে খাবে। সারাবছর সেই বুড়ি 'হুমসানি ক্ষেপি' থাকলেও এই পরবে, বিশেষ করে শবে বরাতের রাতে সে যেন এক ধীর স্থির ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়; আবেজমজমের পানির স্রোতস্বিনী হয়ে বইতে থাকে। পাগল-ক্ষেপিরা বেশিক্ষণ ধীর থাকতে পারে না বুঝি।

দেখা যায় খুমিরের চেরাগ তৈরি করে সাদা নরম কাপড়ের সলতে পাকায় ঘরে ঘরে নারীরা। সরষের তেলে ভিজিয়ে সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয় আপন আপন ঘরে। রাত কিছুটা বাড়তেই একদল কচিকাঁচা তাদের বাঁশের বোনা চালনিতে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে গলা মোম দিয়ে আটকে নেয় চালুনির সঙ্গে। কারো হাতে লম্বা টিফিন বাটি, কারো হাতে টিনের কাটোরা। উঠোন থেকে উঠোনে এই দল সুর করে গাইতে থাকে-

"দিল দিল মুহাম্মদ, তক্তে আলী,
যে দিবে হালুয়া তার হবে কালুয়া (পুত্র),

যে দিবে ছিঁড়া রুটি তার হবে কানা বিটি।"

হঠাৎ সুর পাল্টে এক সঙ্গে চিৎকার করে- "এ কোণ ও কোণ করছে গোসের হাঁড়ি, লুকোচ্ছে গোস দেবার ডরে খিল লাগিয়েছে ঘরে।"

এই ছড়া শুনে বাড়ির মেয়েরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে আর তাদের চালুনিতে রাখে সেই সাদা সাদা গোল গোল কাগজের মতো নরম রুটি। ঢেলে দেয় টিফিন বাটিতে দেশি মুরগির মাংস আর জাফরানি পোলাও। সেই বুড়ি যেন গোটা রাতকে কিনেছে। তার খুশির অন্ত নেই। আজ যে মৃত আত্মারা আসবে এই মাটির ঘরে! জানো নাকি সারাবছর তাদের ছাড় নাই, শুধু এই শবে বরাতে তাদের ঘরে আসার ছাড় দেয় মালিক খোদা। তারা যেন নিজেদের ঘরকে চিনতে পারে। রাতের বেলায় আকাশে চাঁদ উঠবে। গোল ঢলো ঢলো চাঁদ। আমার আঙিনায় নিমপাতারা চাঁদনি নিয়ে কতো নকশা আঁকবে। চেরাগের আলো-আঁধারিতে আমার মৃত শ্বশুর আর কচি ফেরেশতারা হাত ধরাধরি করে আসবে আর দেখাবে- "ওই দেখো আমার কালা ব্যাটার ক্ষেপি বউ কোরআন পড়ছে। ওই দেখো আমার কালা ব্যাটা সারারাত খোদার ইবাদত করছে ঠিক যেন একটা বহতা নদীর পানির চলন গো! ওই দেখো আমাদের বাঁশগাছেরা আজও অমনি করে দুলে দুলে খোদার জিকির করছে। ওই দেখো আমাদের পেঁয়াজের মাঠে কত ফুল! ওই দেখো ক্ষেতে পানি দেওয়া দুনী। জানো তো ফেরেশতা, খোদা খুব খুশি হলে আসমান থেকে পানি টপকায়, সেই সময় আমরাও খুব উল্লাস করতাম। ওই দেখো আমার নিজের হাতে বোনা খলসে মাছ ধরার ঘুণি, ওই ঘুণি পেতে দিতাম জোয়ারের পানির উল্টো বাগে। আর জালমাছগুলো টুপটাপ টুপটাপ করে ঢুকে পড়ত।"

হুমসানি ক্ষেপি নিজেই নিজেকে গল্পোনায় শোনায় যেন- "আমি সব আড়চোখে দেখতে পাই। ফেরেশতাগুলো কী সোজা, সব দেখে দেখে সব শুনে কথা কয়। বলে- আমাদের আসমানের চেয়ে তোমাদের ঘর বড় সুন্দর! আর বলে খোদা খুব খুশি থাকলে তোমাদের ঘরে ঘরে কন্যাদের জন্ম দেয়।" আমি তখন আমার শাশুড়ির শিখিয়ে দেওয়া সূরা ইয়াসিন পড়তে থাকি- "ইয়া সীন, ওয়াল কুরআনিল হাকিম, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন..." না না, আমি তখন পড়ি আমার নানির শিখিয়ে দেওয়া সেই সূরা নিসা- না না, তখন আমি পড়ি- "ফাজকুরুনী আজকুরুকুম ওয়াশ কুরু লী অলা তাকফুরুন"- আমাকে পাওয়ার জন্য যদি দু পা ফেলো, আমি তোমাকে গ্রহণ করার জন্য দশ পা এগিয়ে যাব।

হুমসানি ক্ষেপি আর চাঁদ তখন সারা আকাশ পেরিয়ে ভোরের শুকতারাকে ছুঁতে চায়- ওই দেখো গো কে রে? নাতি ছোকরা এসে বলে- "যে দিবে ছিঁড়া রুটি তার হবে কানা বিটি।"

গুচ্ছ কবিতা

মুহা.আকমাল হোসেন

বুকে পুষি এক কাঠা ওয়াকফ সম্পত্তি

দেশ প্রেমের এক কাঠা ওয়াকপ সম্পত্তি পুষছি
- বুক পালসের বাঁ কিনারে ; হে রাষ্ট্র, নিতে পা
রো!

আমি কবেই দিয়েছি - না দেখাই ঈশ্বর
শতাব্দী শতাব্দী লালন করা প্রার্থনা লয়ের বীমা ।

এখানেই ঘুমিয়ে আমার পূর্বপুরুষের মৃত্যু ক্রোম
লেখা হাজার হাজার বিঘা কবর খানা

হে রাষ্ট্র আর তো কিছু নেই
কেবলই আছে -জন্ম মৃত্যু আর পুনর্জন্ম আর
কিছু বিশ্বাস -যেন তেন নাগরিক বাড়িঘর
সেন্সাস আর ক্ষুধার সূচক

আর আছে -
আরো আছে -রাস্তা
পায়ে পায়ে মাখা রাস্তার মিহি ধুলো
রাজপথ! খোলা দুটো হাতর উপরে আকাশ
ছুরির ধারের মতো গান গাওয়া কণ্ঠ আছে

আরো আছে
আরো আছে
চোখের ভূগোল ভর্তি ঘৃণার অধিকার।

বিপ্লবের ঘোড়া

রাষ্ট্র যখন আমাদের কণ্ঠ গুলো কিমা করে খায়
সংবিধানের রাস্তাগুলো যখন সরু গলি হয়ে যায়
সমাধির মতো পোষা বিষন্ন অন্ধকার!
শেষ সূর্যের আলো তখন লোহা দন্ডের মতো নেমে
আসে।

মানুষ তখন ভাতের ভুবন আর পরকাল টপকে
মৃত সময় আর সন্তানের লাশটাকে
কিনতে যায় বিপ্লবের ঘোড়া !

মানুষ নেমেছে রাস্তায়

এইযে দেখছেন- মানুষ নেমেছে রাস্তায়
অনুগত রাস্তাও শুয়ে পড়েছে মানুষের পায়ের নিচে
কোন প্রাচীন সেতু স্বভাবের মত

যে রাস্তা দিয়ে লঙ্কা যেতেও আমাদের রামচন্দ্র
যে রাস্তা দিয়ে কৃষকেরা হেঁটে গেছে সংসদের দিকে

আগুন জ্বালিয়ে দিল আমার দেশ -

মানুষ অরুণ্যেও শুকনো কাঠ পাতার দাবানল জ্বলে -

কটা মানুষের মৃত্যু দেখবে রাস্তায়
কিছু অনাহারেকৃষ্ট মানুষ পিঠে তলপেটে হয়তো
থাকবে রাইফেল কিংবা ভারী বুটের কালসিটে।

কিছু মানুষের ইজ্জত মুঠোয় নিয়েই শাসক ছড়াবে খই

দেখুন- আকাশে নীল মেদ জমছে
লাল লাল হয়ে জ্বলছে এ নক্ষত্র আগুন
আকাশ এখন আমার চোখের সামনে বিপ্লবের গম্বুজ ।

কবিতা

তুমুল অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে দেশ

উদ্দেশ্য আর তুমুল আয়োজন যখন নিবিড় অন্ধকার ডেকে আনে
আমাদের শাসকের চোখ তখন দেখি বন বিড়ালের মত জ্বলে।
দেশ নয়
নাগরিক নয়
অনিশ্চয়তাকে ডোবের ভিতর কেটে গেছে প্রহর!
স্নিগ্ধ ভোরের অপেক্ষায় ডাক দিয়ে উঠুক কটা লাল ঝুটি মোরগ
পিঠ দেওয়ালে লেগে গেলে
বাংলা কবিতাও নেমে পড়ে রাস্তায়।

আমার বাংলা কবিতা

যারা কল্যানকে ভালোবেসে রাস্তায় নেমেছে
যারা মানুষকে ভালোবেসে রাস্তায় নেমেছে
যারা দেশকে ভালবেসে রাস্তায় নেমেছে
তাদের কাতারে দাঁড়ায় আমার বাংলা কবিতা।
যারা ইতিহাস ঐতিহ্যের দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রে জেগে ওঠে
যে রাতে চাঁদ জ্যোৎস্না মরে যায় আলকাতরার মতো কোন নদীর জলে
সেই রাত্রেও জেগে থাকে আমার বাংলা কবিতা।

মানুষের অরণ্য থেকে

মানুষের অরণ্যেও মাঝে মাঝে ওঠে ঝড়
ডাল ভাঙা পাতা ওড়া বজ্রপাত কোনটাই অস্বাভাবিক নয়।
দুই একটা পাখিও ডানা ভেঙে পড়ে
দুই একটা হরিণ পালাতে গিয়ে সিং আটকে ফেলে বেনামি লতার জালে
একশো ভাগ সাধু মানুষের যে আখড়া ছিল
যার কাছে থাকতো ছত্রিশ কোটি দেবতা
সেও কেঁপেয়ে ওঠে কয়েকবার
এখনো আকাশে পাকা জাম মেঘ
এখন আকাশ সিংহের গর্জন।

এখন রাজারা নাকি কুকুর পোষে

ইতিহাস থেকে জেনেছি রাজারা নাকি চিরকাল
হাতি পুষতো ঘোড়া পুষতো
আর পুষতো হোমারের চেয়েও অন্ধ- অন্ধ কয়েকটা ঐতিহাসিক
তারা নাকি লিখতো ইট পাথরের গায়ে রাজার নাম।

রাজা চলে গেল শিকারে
রাজা চলে গেল বনবাসে
রানী চুরি হয়ে গেল

এই গল্পগুলো পড়তে পড়তেই আমরা ভারত বর্ষ বানিয়ে ফেলেছি

আমরা এখন হাতি বেচেছি
আমরা এখন ঘোড়া বেচেছি
আমরা এখন ব্যালট বেচেছি জনমজুরি দামে

আমাদের রাজা এখন ফিরে আসে বনবাস থেকে
আমাদের রাজা এখন নেমে আসে দুর্গম হিমালয় থেকে
আমাদের রাজা হাতি নয়, ঘোড়া নয় যথেষ্ট কুকুর পোষে

আমি এক নাগরিক

সামিমা মল্লিক

আমি এক নাগরিক ....
আমার মাটি এখন বালির চর,
প্রতিদিন যা ভেঙ্গে যায়
পরিচয়ের ঢেউয়ে থরথর।
আমার পরিচিতির কাগজ
উড়ে যায় সরকারি অফিসে -
কখনও তা ছিঁড়ে যায়,সিল মারে ,
কখনও তা ওড়ে দলীয় বাতাস
আমি হেঁটে যাই
আমার ঘামে শহরের ইঁট শুকায়-
তবু বুকে আমার ভয় ....
আমি কি শহুরে নাগরিক?

ভোটার তালিকায় আমি
অশরীরীর মত দাঁড়াই,
বর্ণ মাত্রার ভুলে উনিশ বিশ!
আমার ছায়াকে প্রশ্ন করে পুলিশ
আছে নাকি জন্ম সনদ পুরোটাই!
নেই কোন শক্ত ঠিকানা ,
অস্তিত্ব অথবা কোন সিহ্র দিক
এক অসম্পূর্ণ ফাঁকা ঘর ফর্মে
যেখানে রাষ্ট্রের কলম থেমে গেছে ধর্মে
অসহায় নীরবতার দিয়ে সেই
আমি সেই দেশেরই নাগরিক হই।।

আমি ফিরবো বলে

সেখ আনিসুর

কি যেন এক বিষাক্ত ধোঁয়া!
ঘিরে রাখে চারপাশ, হৃদয়ের চৌকাঠ!
মুক্তির পথ গোনে বদ্ধ পৃথিবী তব,
বন্ধ জানালা খুলি, মুক্ত দুয়ার।

অশৌচ পৃথিবী ঘেরা ধৌত নগরে,
বিষবাষ্পে ঘেরা প্রাচীর এপাশ ওপাশ।
আমারে দেয় না ওরা প্রকৃতির হতে,
রব, আমি চেয়ে রই তব তোমারই পথে।

রং তার জমছে কেবল অবচেতন মনে,
চেতনা জানে তবু ওই রং আবছায়া।
ছড়িয়ে দিয়েছে বিষ হৃদয়ের গায়ে,
শ্বাস তবু জীবিত ওই শিক্ত নামাজে।

মউত

উমর ফারুক

চলো ভাই সালাতে আজ নয় কাল?
মৃত্যুর চিঠি পেলে হবে কি সকাল?
ঘুম যাও রাত্তিরে ভোর হবে বলে
কোন ভোর হবে জানো মৌতের ছোবলে ?
প্রিয়জন কাঁদবে জানি বিলাপে বারেবার
আমলের কে দায় নেবে কে হবে কার?
ভাগ্যের ঘুরে চাকা ইহকালে এসে
পরকাল ঘটলে রবে ভিখিরির বেশে ।
মৌওত ডাকে সাড়া দিতে যদি কর কাল
জেনে নিও সময়টা বিছিয়ে নেবে জাল
মৃত্যুর দূত এসে ছিঁড়ে নেবে জান
আমলের নেক নদে করে নাও স্নান।

অন্ধকার দ্বীপে গোপন প্রভাত

আজমীর রহমান

চকচকে ইতিহাসের বুক, তবু চলে না বাজারে,
বুকে লালন করি আদর্শ-তবু দর মেলে না বাজারে।
তখনই প্রভাত চিৎকার করে বলেছিল-
"ওহে রাত্রি, তোমার কাজ ঢেকে রাখা,
আমার কাজ প্রকাশ করা।"

সমুদ্রের ঢেউ তীর ছুঁয়ে বারবার বলে-
সত্য দেরি করে, কিন্তু হারায় না কোনোদিন।
সমুদ্রের বুকে ছিল এক নিঃসঙ্গ দ্বীপ,
ঢেউ এসে তীরে আঘাত করত প্রতিক্ষণ,
কিন্তু ঢেউ জানত না-
তীরের বালির নিচে
কত আর্তনাদ চাপা পড়ে আছে নীরবে।

সমুদ্র, জলরাশি, ঢেউ আর ফেনা-
সব দেখে, সব জানে, তবু কিছু বলে না;
কারণ তারা জানে,
সত্য নিজেই একদিন কথা বলতে শেখে।

কিন্তু আজ ঢেউ কথা বলে,
কাঁদতে কাঁদতে বলে-
যেখানে নিষ্পাপ শৈশব কেঁদেছিল,
মানবতা লজ্জায় মাথা নত করেছিল গোপনে;
আর ক্ষমতার অন্ধ প্রাসাদে
পাপের উৎসব জ্বলেছে নির্লজ্জ আগুনে।

অন্ধকার ভেদ করে যখন আলো প্রকাশিত হয়,
তখন দেখা যায়-
নামের তালিকা লম্বা,
কিন্তু বিচারের পথ অদ্ভুত ছোট।
ন্যায়ের আদালতে তখন প্রশ্ন জাগে-
এখন সবাই এত ধীর, এত নীরব কেন?

এ যেন এক ব্যবস্থার কলঙ্ক,
যেখানে সত্য দাঁড়িয়ে থাকে একা,
আর নীরবতা হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় প্রহরী।

মানবতার মুখোশ

খালিদা খাতুন

চারিদিকে গুনাহের সয়লব,
হেফাজত করো হে রব।

চারিদিকে অবাধ্যতার আস্ফালন,
নাফরমানির জয়-
নষ্ট মানুষের রাজত্বে
সৎ জীবনের ক্ষয়।

সংসার থেকে সংসদভবন,
সবখানে শয়তানের হুক্কা হুয়া,
জালিমরা কথা বলে মানবতার
ফেরিওয়ালা হয়ে-
সবটাই মেকি, সবটাই ভুয়া।

নিপীড়ন, নির্যাতনের টাকায়
তৈরি বিলাসিতার অট্টালিকা,
বিবেকের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের,
মানুষকে অবিরাম দেয় ধোঁকা।

অনুতপ্তের অশ্রু নেই চোখে,
দেখায় বাহাদুরি, হিম্মত;
ভুলে যায় তারা চড়াই-উৎরাই,
পিচ্ছিল জীবনের গিরিপথ।

প্রাচুর্যময় দুনিয়ার মুগ্ধ তাই,
ভুলেছে তারা সব-
বেমালুম জীবনে অশালীনতা
তাঁদের বৈভব।

হে আমার রব! তুমি অনুগ্রহ করে
তাঁদের দাও হেদায়াত-
যারা মানবতার মুখোশ পরে
মানুষকে পোড়ায় দিনরাত।

নিম্নবিত্ত

রাকিন আক্তাব

আমরা নিম্নবিত্ত, আমরা নিম্নবিত্ত,
চাই না আমাদের লক্ষ্য কোটি টাকা, চাই না বিলাসবহুল জীবন,
শুধু চাই দু'মুঠো অন্ন, পেটের আগুন নিবারণের জন্য ।

তোমরা থাকো রাজপ্রাসাদে
তোমরা কী বুঝবে আমাদের জ্বালা?
আমরা হলাম পথের পথিক
পথ চেয়ে দেখি শুধু খিদে মিটানোর জ্বালা
রাত পোহালে দিন দেখি , দিন পোহালে রাত
মনে হয়, খিদে মেটানো আমাদের সর্বক্ষণের কাজ!

জন্মেছি আমরা নিম্নবিত্ত ঘরে- এটাই বুঝি দোষ,
নইলে কেন অন্নের চিন্তায় নিদ্রা হয় নিখোঁজ?
ঘুম আসে না মধ্যরাতে, দেখি নীরব তারা,
রাত পোহালেই শুরু হয় পেটের যুদ্ধ সারা।

দিন হলে যাই কাজের আশায়, জুটবে কপালে ভাত,
ভাতের বদলে জোটে কপালে বড়লোকের লাথ।
অপমান বুকে নিয়ে ঘরে ফিরি নীরব অন্ধকার রাতে,
নিম্নবিত্ত বলে- এটাই বুঝি আমাদের জীবনের সাথে ঘটে।

নিম্নবিত্ত বলে আমারা মানুষ নই- শোষণেরই যন্ত্র,
দিনের শেষে জমে থাকে বুকের ভেতর কষ্ট।
বড়লোক হলে দেখতাম আমরা কত শত স্বপ্ন,
ঘুরতাম রাজপুত্রের মতো, বুকভরা আশা নিয়ে,
ঘুম ভাঙতেই দেখি- সব স্বপ্ন গেছে হারিয়ে।

তবু বুকের ভেতর আগুন জ্বলে, স্বপ্ন এখনো বাঁচে,
একদিন বদলাবে সময়- এ বিশ্বাস হৃদয়ে আছে।

রগড়ায় আত্মা

জাহাঙ্গীর মিদ্দে

আমার পাওয়া হয়নি
অন্যকে জানিয়ে লাভের থেকে লোকসান
বেশি।
জনে জনে বলতে থাকবে। ও পায়নি!
কত কি না পাওয়ায় কেটে গেছে দিন,
স্বল্প মূল্যের কিছু, মূল্যবানও অনেক।
এতসব জনে জনে বলে চার হাত গজাবে না,
ভাবনায় আনি প্রায় সেই ত্রিশ কোটির কথা,
আহারের বিহার, প্রমোদের প্রাচুর্য, বুক ভরা
পাওয়া ছাড়া
দিন কাটে তাদের।
না পাওয়ার পরাকাষ্ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে,
স্বপ্ন ভাঙা ছোবড়ায় রগড়ায় আত্মা।

ফিলিস্তিনের শিশু

মুহাম্মদ ইব্রাহিম

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে যুদ্ধের মহড়া
ময়দানে সৈন্যদের বুটের আওয়াজ
পিষে দিচ্ছে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা।

ফিলিস্তিনের শিশুরা চাঁদ ভালোবাসে
আকাশ গোলাবারুদের ধোঁয়ায় ঢাকা
শিশুরা হাসে, ফুল ভালোবাসে
মাটি তো পোড়া কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপ।

গাজার শিশুরা কোরআনের সুর ভালোবাসে
বিনিদ্র রাতে বোমারু বিমানের রণ হুঙ্কার
শিশুরা দেশকে ভালোবাসে,স্বাধীন স্বদেশকে।

ফিলিস্তিনের শিশুদের ভালোবাসাগুলো
আকাশে গাঙচিলের ডাক, বিষন্ন সুর
সেই সুর থেকে ঝরে শুধু অশ্রু আর রক্ত।

সাদা কাফনের সওদাগর

সেখ সাহানুর রহমান

সাদা অ্যাপ্রনটা এখন যেন শুধু কফিনের কাপড়,
সেবা নয়, এখানে চলে লাশের ওপর দরাদরি আর খবর।
সরকার তো সেই জাদুকর, যে উন্নয়নের ফানুস ওড়ায়-
আর অক্সিজেনের অভাবে জ্যান্ত মানুষ হাসপাতালের মেঝেতে ধুঁকছে অবেলায়।
তোমাদের আধুনিক চকমকে দালান, ওটা তো হাসপাতাল নয়,
ওটা একটা কসাইখানা, যেখানে কেবল টাকারই জয়।
গ্রামের মায়েদের গর্ভপাত হয় ভাঙা ভ্যানের ওপর,
আর তোমাদের ভিআইপি কেবিনে চলে দামি মদের আসর।
মেশিনগুলো বিকল পড়ে থাকে সরকারি সেই ঘরে,
দামি টেস্টের কমিশন যে বাইরের প্রাইভেট ল্যাবে চড়ে।
ওষুধের সিন্ডিকেট আর দালালের ওই নোংরা হাসি,
জনগণের করের টাকায় তোমরা গলায় দিচ্ছ ফাঁসি।
রক্তের দামে কেনা সেই স্ট্রেচার, চাকা ঘোরে না তার-
যদি না পকেটে থাকে দালালের সেই চাবির ঝংকার।
ডাক্তার সে তো খোদা সেজে বসে দামী ওই চেম্বারে,
আর মুমূর্ষু পিতা প্রাণ হারায় সরকারি করিডোরে।
উন্নয়ন! উন্নয়ন! চিৎকার করে ফাটাও যে গলার রগ,
অথচ বিনা চিকিৎসায় মরছে মানুষ, যেমন মরে বুনো খগ।
রেফার কার্ডের টালবাহানা আর বেড নেই সেই অজুহাত-
তোমাদের এই রক্তচোষা রাজত্বে নেমে আসুক ঘোর অমাবস্যা-রাত।
সেবা যেখানে পণ্য কেবল, জীবন সেখানে কয়লা,
তোমাদের এই সাজানো ব্যবস্থাটা আসলে মনের ময়লা।
বিদ্রোহটা এবার শুরু হোক ওই হাসপাতালের বারান্দা থেকে,
যেখানে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে প্রতিদিন হাজারো আর্তনাদ দেখে।
তোমাদের ওই অট্টালিকা হোক আজ আমাদের গণদাবি,
যেখানে টাকার তালা নয়, থাকবে সেবার চাবিকাঠি।
মনে রেখো, যেদিন ফাটবে ওই ক্ষুধার্তের হাহাকার-
তোমাদের সাজানো ওই তাসের ঘর ভেঙে হবে চুরমার।

Diamond Art Press Pvt. Ltd.
24/7 +91 98303 44461
diamond.art.press@gmail.com
mohidul_haq007@yahoo.co.in
DIAMOND ART PRESS PVT. LTD.
Where print shines...
সকল মানুষকে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের প্রাণঢালা
শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।
ঈদ মোবারক
OFFICE : 37/A, Bentinck Street, 1st Floor # 104,
"Bentinck Chamber", Kolkata - 700 069
FACTORY : P-4 Puran Chand Nahar Avenue
"Burman Garge" Kolkata - 700 014 +91 98301 72643
FACTORY : 37/A, Bentinck Street Ground Floor,
Bentinck Chamber, Kolkata - 700 069, +91 98303 44419
+91 98301 72643 / +91 98367 91141 / +91 98311 94085

নোভা রাইজ একাডেমি
-A Unit of Novelty Social Welfare Foundation -
নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
ইসলামি আদর্শে পরিচালিত একটি উচ্চমানের আবাসিক, অনাবাসিক ও
ডে-স্কুল বাংলা মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বালক ও বালিকাদের জন্য পৃথক ক্যাম্পাস)
সাজুর মোড় * সুতি * মুর্শিদাবাদ
ESTD : 2025
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
NRA
Nova Rise Academy
-Learn. Rise. Lead-
Nova Rise Academy
www.novariseacademy.in
8653782291 // 7602240058 // 9609777456

গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুল (উঃ মাঃ) (মিশন)

একটি ইহকাল এবং পরকালের জন্য স্কুল।

ESTD.: 2023

প্রতিষ্ঠাতা ঃ- মোঃ সহিদুল ইসলাম
BA (HONS), MA.ENG, D.El.Ed.
21 Years Teaching Experience

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি চলছে।

একটি আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক হোস্টেল ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে হোস্টেলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু।

হোস্টেলে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা : 26th October Sunday, Time: 12PM

তৃতীয় শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত হোস্টেলে ভর্তির জন্য স্কুল থেকে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে।

সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোস্টেল।

গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুলের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করা যারা ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে উঠবে, একইসাথে আধুনিক দুনিয়ার প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষায় দক্ষ হবে। আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা দুনিয়াতে সফল হোক এবং আখেরাতেও কামিয়াব হোক।

উদ্দেশ্য **ইসলামী দিক থেকে ঃ-** শিক্ষার্থীদের কুরআন তিলাওয়াত, হিফজ, তাফসীর ও হাদীসে পারদর্শী করা। ইসলামী আকীদাহ, ফিকহ, সীরাত ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান। আল্লাহভীতি, তাকওয়া, আমানতদারিত্ব ও সৎ চরিত্র গঠন।

প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইসলামের মৌলিক আমল যেমন নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ ইত্যাদি পালনে অভ্যস্ত করা।

দুনিয়াবী শিক্ষা থেকে ঃ- আন্তর্জাতিক মানের ইংরেজি শিক্ষা প্রদান। গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক গবেষণায় দক্ষতা তৈরি। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, চিন্তাশক্তি ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ করে দেওয়া।

নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে ঃ- নৈতিকতা, সততা, ভদ্রতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি করা। অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। অসহায়, দরিদ্র ও অভাবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করা।

হোস্টেলের ব্যবস্থাপনা

১. ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক হোস্টেল ব্যবস্থা থাকবে।
২. হোস্টেলে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (AC) রুমে থাকার সুবিধা থাকবে।
৩. প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কোচিং ক্লাসের আয়োজন করা হবে।
৪. ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা থাকবে।
৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করা বাধ্যতামূলক।
৬. ছেলে ও মেয়ে উভয় হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের জন্য হিফযুল কুরআন কোর্সের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।
৭. আলাদা আলাদা সাবজেক্ট টিচার দ্বারা পাঠদান করানো হবে।
৮. সকল ছাত্রছাত্রী হোস্টেল সুপার ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থাকবে।
৯. নিয়ম ভঙ্গ করলে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১০. পুরো ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকবে।
১১. মহিলা হোস্টেলে মহিলা সুপার দায়িত্বে থাকবেন।
১২. কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে।
১৩. হোস্টেলে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে।
১৪. এতিম, দুঃস্থ ও অসহায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকবে।

ভর্তি চলছে

6294760421
9735686088

ইসলামপুর কলেজ রোড (TVS শোরুমের পাশে)
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪২৩০৪

পরিক্ষার সেন্টার
গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কুল

অতিথি আপনার আপ্যায়ন আমাদের

Rizwan Catarer

প্রো: হাবিবুর রহমান মন্ডল

7003353177
Rizwan Catarer
Rizwan Catarer

অন্নপ্রাশন বাড়ি, সাদীবাড়ি যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য স্বল্প খরচে অল সার্ভিস দিয়ে থাকি। আমাদের কাছে লেডিস ক্যাটারার অ্যাভেইলেবল, ডেকোরেটার ও ফুলের কাজ করে থাকি।

রিজওয়ান ক্যাটারার টোটাল ইভেন্ট প্ল্যানিং দিয়ে থাকে।

ভালো সার্ভিসের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন

হাওড়া, উলুবেড়িয়া, বাড়বেড়িয়া

AKHAN
HONEY SHOP

High Quality

Pure Honey from Sundarban

Baruipur, South 24 Parganas
Kolkata, West Bengal

For Order Call : +91 8697746104

উচ্চতায় অদ্বিতীয়, উজ্জ্বলতায় অম্লান

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

Al-Ameen Mission 40 Years in service to the society

নিট-ইউজি (মেডিকেল) ২০২৫ কৃতিদের

হার্দিক অভিনন্দন

৪৮০ নম্বর ও তার ওপর

৭২০

Marks 550 & above	Marks 530 & above	Marks 510 & above	Marks 500 & above
Within AIR 12394	Within AIR 24287	Within AIR 41676	Within AIR 52672
68	180	361	474

Syed Md Tamjeed

AIR 240 Marks 630

Arafat Hossain

Sarif Hasan

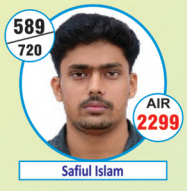

Safiul Islam

Md Moinuddin Hassan

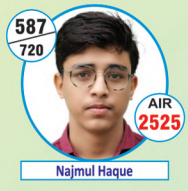

Najmul Haque

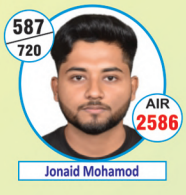

Jonaid Mohamod

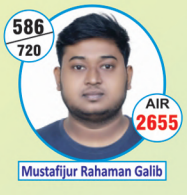

Mustafijur Rahaman Galib

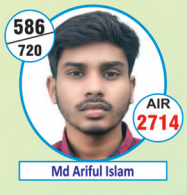

Md Ariful Islam

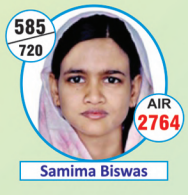

Samima Biswas

Samina Khatun

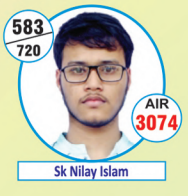

Sk Nilay Islam

Rafik Hassan

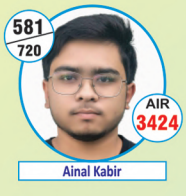

Ainal Kabir

Rasel Sk

Altamas Kabir Halder

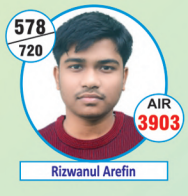

Rizwanul Arefin

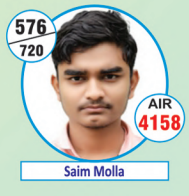

Saim Molla

Abdul Rajeb Sk

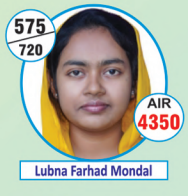

Lubna Farhad Mondal

Ahammad Hasan Ansari

উচ্চ-মাধ্যমিক ২০২৫

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১০৮৯	১৭২	৮০৯	১০৩৭
ছাত্রী	৮০৪	৮০	৫৬৪	৭৭৫
সর্বমোট	১৮৯৩	২৫২	১৩৭৩	১৮১২

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৪৭৯ জন (২৫%)
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	৬৬৬ জন (৩৫%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৭৪৮ জন (৪০%)

মাধ্যমিক ২০২৫

পরীক্ষার্থী		৯০%	৮০%	৭০%
ছাত্র	১৭১৪	৪১১	১২৬০	১৫৯১
ছাত্রী	৯০৮	১৪৯	৫৭৩	৮০৬
সর্বমোট	২৬২২	৫৬০	১৮৩৩	২৩৯৭

দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৬৭৮ জন (২৬%)
নিম্ন-মধ্যবিত্ত	৮৩৪ জন (৩২%)
মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত	১১১০ জন (৪২%)

এই সাফল্যের জন্য সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৪৩/৫৯/৬৬
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ১৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬/৭৯
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ১৫৬, ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৫১